গ্রহ-সারথি

সুশীলকুমার ঘোষ

* গ্রন্থ ভবন *
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ছয় টাকা

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ সাল

ঃ প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ

শ্যামল সেন

গ্রন্থ ভবন, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস. ৭৩ মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু
শ্রদ্ধাস্পদেষু

: লেখকের ধন্যবাদ জ্ঞাপন :

Mr. Hodyson ও Mr. Lake

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

শ্রীগোপেশ্বর সাঁই।

শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস।

শ্রীদয়ালচন্দ্র দাস।

: এই লেখকেরই লেখা :

মৌন নূপুর

গ্রহ-সারথি

তত্ত্ব ও তথ্যে সামান্য ভুল বা ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়।

—লেখক

প্রথম পর্ব

নিখিলেশ

রাত সাড়ে-নটা দশটার পর বড়ো একা একা লাগে কুন্তলার। কাজ থাকে না বিশেষ কিছু। করবার থাকে না কিছু—ভাবনা করা ছাড়া। তখন থেকে রাত সাড়ে-এগারোটা পর্যন্ত সে একান্ত একা। মনের রাজত্বে দোসর নেই।

নরেশবাবু সারারাত কাশেন। সেই কাশির শব্দ শোনা আর প্রতীক্ষা করা—এই তো কাজ। ভেতরের ঘরে নরেশবাবু আর তার নিজের বিছানা। ঘুমে তন্দ্রায় ঝিমোনোতে ডুব সাঁতার কেটে জাগরণের কূলে মাথা তোলেন নরেশবাবু সেই শেষ রাত্রে। তার আগে তিনি একটা বিছানার বাণ্ডিলের চেয়ে বেশী প্রাণবান নন।

উপেন শোয় ওপাশের ছোট ঘরটায়। তার মাংসপেশী বা বুকের পাটার চওড়াটাই যা ভরসা। ভরসা ও ভয় উভয়ই। মাংস থোড়ার চপারটা কুন্তলাদের ঘরেই থাকে, শিয়রে নিয়ে শোয়। তা হলেও—! চাকর-বাকরদের দিয়ে আজকাল কিই বা না হচ্ছে! সেই জন্যেই তো কুন্তলার ইচ্ছে একটি মেয়ে চাকর রাখার। সুবিধে মতো পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ে চাকর রাখার বিপদও কিছু কম নয়। অনেক লেঠা, অনেক ঝঞ্ঝাট।

যা যা দরকার, পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তো এই রাতজাগা প্রতীক্ষা। কেন প্রতীক্ষা? কার জন্য প্রতীক্ষা? যারা এসে পাহারা দেবে তাকে, পাহারা দেবে তার যৌবনকে, তারা কারা? কি সম্পর্ক কুন্তলার সঙ্গে তাদের? তাদের না এনেও পারে না কুন্তলা, আনলেও বিপদ। ভোরবেলা বা শেষরাত্রে চলে যাবার সময় কুন্তলার সুনামটুকু ব্যাগে ভরে নিয়ে যায় তাদের। একমাত্র সাক্ষী শুকতারা—রোজ চেয়ে চেয়ে দেখে।

সুনাম! মনে মনে হাসে কুন্তলা। সুনামকে কেয়ার করে নাকি

সে ? সুনাম কেউ করে না দুনিয়ায়। সুনাম বস্তুটা অস্তিত্বে নেই, আছে শুধু অভিধানের পাতায়। তবু তার মুখ চেয়েই, সুনামের আলেয়া খুঁজে কতো মেয়ে অকালে মারা যায়। দুর্নামের হাত থেকে বাঁচাতে আসে না কেউ। এক মুঠো অন্ন দিয়ে সাহায্য করেছে কেউ এমন দৃষ্টান্ত জানা নেই কুন্তলার। তবে মোহ কেন সুনামের !

সুনাম দুর্নামের জন্যে নয়। তার আর নিজেরই ভাল লাগছে না এই রাত জেগে বসে থাকা। বসে থাকা যায় কার জন্যে ? অনাত্মীয়ের জন্য নয়, পাহারাওয়ালার জন্য তো নয়ই ! যে এসে সুদে-আসলে উসুল দেবে আমার কষ্টর—তারি জন্যে বসে থাকে লোক, বসে থাকা যায় !

উল্কার মতো জ্বলতে জ্বলতে এতোদূর এসে পৌঁছেছে। বাকী জীবনটাও জ্বলতে জ্বলতে শেষ হবে। উল্কা নিজেই জ্বলে—কারোকে জ্বালায় না। আকাশের কক্ষ থেকে ছিটকে পড়ে তার পিণ্ডটা জ্বলতেই থাকে। মাটির বুকে যখন এসে পৌঁছয় তখন সেটা ঠাণ্ডা শীতল। তখন সে নিবে গেছে। আকাশ থেকে ছিটকে পড়ার পর হাওয়ায় হাওয়ায় তার সংঘর্ষ। পারিপার্শ্বিক হাওয়ার সঙ্গে লাগে তার সংঘাত। সেই সংঘাতই তাকে জ্বালায়। আর যে হাওয়ার ঘষা লেগে একদা সে জ্বলে, সেই হাওয়াই তাকে নেভায়।

অক্ষরে অক্ষরে সত্যি এই কথাটা। এ যে বৈজ্ঞানিক তথ্য, সত্য একে হতেই হবে। তার জীবনেও বর্ণে বর্ণে সত্য, ঐ বৈজ্ঞানিক তথ্যের মতনই। শূন্যের বুকে এতো স্পীডে সে ছোটে—হাওয়ার সংঘর্ষই তাকে জ্বালিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

আপন ছোট জগৎ বা ছোট ঘর থেকে খসে পড়াই কক্ষচ্যুতি। মানুষের কক্ষ আর গ্রহের কক্ষে তফাৎ নেই কিছু। ঘর ছেড়ে বেরোলেই জ্বালা। জ্বলে মরা। কক্ষভ্রষ্ট লক্ষ্যভ্রষ্ট একই কথা। কক্ষভ্রষ্ট হলেই তারা উল্কা হয়ে যায়।

চিন্তা বেশী দূর এগোয় নি। এক জোড়া ভারী জুতো আস্তে আস্তে

এগিয়ে আসতে আসতে থেমে যায়। উত্তর পাড়ার রাত-পথিকের পায়ের স্খলিত আওয়াজ নয়। সে পায়ের আওয়াজ অন্যরকম। অমিত্রাক্ষর ছন্দের অমিলের ধ্বনির মতন। এ আওয়াজ সংকোচের ব্রেক কষা। স্টেশন হঠাৎ খুঁজে পেয়ে স্টিম বন্ধ করার আওয়াজের মত। সাইন বোর্ডটা দূর থেকে দেখতে পেলে পায়ের আওয়াজ যেমন সুশৃঙ্খলে কমে আসে। কমে এসে থেমে যায়।

জানলার গরাদের নিরাপত্তায় নিজেকে রেখে চোখ বাইরে পাঠিয়ে দেয় কুন্তলা। দেখতে পায়—ভালুক পোষাক পরা গার্ড। টুপীর কার্নিসের ছায়ায় চোখ ঢাকা পড়েছে। চোখ ঢাকা পড়েছে, সেই সঙ্গে পরিচয়ও।

কুন্তলা বলে—কে?

চোখ দুটো সাইনবোর্ড থেকে নামায় আগন্তুক। গরাদের ওপাশে সিলুয়েটে আঁকা মেয়ে মূর্তির কনটুরে। রাস্তার আলো পড়ে নি মুখে, ঘরের আলো পড়েছে পেছন থেকে।

আগন্তুকের কাছে খাঁচার মতন মনে হয়। হরিণের খাঁচা তা হলে নয়? গলার আওয়াজের ভারিক্কেপনা শুনে মনে হয়—সিংহের! সিংহের গুহা নয় তো!

ছোট্ট করে বলে—আমি! পরেশদা পাঠিয়ে দিলেন।

বলতে বলতে টুপী খুলে ফেলে আগন্তুক। ডগ্‌লাসী গোঁফের রেখায় মুখের সৌন্দর্য কি রকম খুলেছে দেখাবার জন্যই যেন। বিরক্ত মুখে দরজা খোলে কুন্তলা। বিরক্তি ভরেই ডান হাতে হুড়কোটা সজোরে ফেলে দেয়। দেয়ালের বুকে আছড়ে গিয়ে পড়ে সেটা। চূণ-বালিও খসে পড়ে খানিক।

হুড়কোটা জানিয়ে দেয় কুন্তলার বিরক্তি।

পথ ছেড়ে দাঁড়ায় কুন্তলা—আসুন—

ঘরে ঢোকে আগন্তুক। পরিচয় দেয় নিজের—আমার নাম আলোক-বিহারী মুখোপাধ্যায়।

কথা বলে না কুন্তলা।

অপ্রস্তুত হয়ে যায় আগন্তুক। এই ব্যবহার পাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসে নি। সে শুনে এসেছিল—শ্রান্ত পথিককে অকাতরে ছায়া বিলোয় পান্থপাদপ। মরুভূমির বুকজোড়া তৃষ্ণায় বিতরণ করে ঠাণ্ডা জল। দিগন্তজোড়া ফুটি-ফাটা বালু সমুদ্রে একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র স্থল এই পান্থপাদপ।

কি করবে ভেবে পায় না আলোক। হাতে ধরা টুপীটা মাথায় পরবে। না, নামিয়ে রাখবে সামনের টেবিলটায়—অন্য পোষাক খোলার ভূমিকায়!

কুন্তলা বলে—রানিং রুমে জায়গা নেই বুঝি!

আলোক বলে—খোঁজ নিই নি। পরেশদা এই ঠিকানা বলে দিলেন। তাই এসেছি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

বলে টুপীটা পরে ফিরে যাবার উদ্যোগ করে।

কুন্তলা বলে—নতুন বুঝি এই লাইনে?

—লাইন?—কথাটার পুনরাবৃত্তি করে অল্প হাসে আলোক। মোড় ফেরা অবস্থায় বলে—না নতুন নই। লাইনের ভূগোল জানা না থাকলে কি গাড়ী নিয়ে বেরোতে দেয়? এ লাইনে পুরনো আমি। এসেছি, গেছি। পোনাহাট স্টেশনেই রাত কাটিয়ে ফিরতি গাড়ীতে ফিরে গেছি। খুব বেশী দিন থাকি নি এ লাইনে। অনেক আগে ছিলাম। তারপর সাউথে। এ লাইনে দিয়েছে লাস্ট ফ্রাইডে থেকে আবার—

কথা বলে আলোক যুক্তি দেখায়। ফিরে যাবার উদ্যমে শরীরের মোড় যেটুকু ফিরেছিল, সেটুকু প্রত্যাহার করবার জন্যেই যেন বাকি মোড়টুকু ফেরে আলোক। ভদ্রতার খাতিরেই বলে—চলি। মনে করবেন না কিছু। কষ্ট দিলাম আপনাকে। গুড নাইট।

নিজের ব্যবহারের অকারণ কাঠিন্যে কষ্ট পাচ্ছিল কুন্তলাও। মনে মনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সেও, নিজের ব্যবহার ফিরিয়ে নেবার জন্য। মানুষের মন এমনি। আঘাত হানতেও সময় লাগে না, তার তাপে দগ্ধে

মরতেও নয়। কিন্তু তারায় বাঁধা পর্দা থেকে উদারায় নামতে গেলে—মুদারা ছুঁয়ে নামতে হয়।

কুন্তলা বলে—মজা মন্দ নয় তো! এলেন নিজের খুশীতে। চলেও যাচ্ছেন নিজের খেয়ালে। পথ পড়ে থাকে বুক পেতে। আসা যাওয়া কোনটাতেই পার্‌মিশান লাগে না তার। এটা তো বাড়ী, পথ নয় এখানে মালিক বলে কথা আছে একটা।

পরেশদার কাছে আজগুবী গল্প শুনে বিশ্বাস করেছিল আলোক। মূর্খ বলেই।—রাত জেগে বসে থাকে, জাগিয়ে দেয় শেষ রাত্তিরে! রাবিশ! এ লাইনে বদলি হয়ে আসতে একটু ধরা করাও করতে হয়েছে আলোকের। উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে তার।

আলোক বলে—মাপ করবেন। আমারই অন্যায়। এতো রাত্রে ডিসটার্ব করা সত্যি উচিত হয় নি আমার। আচ্ছা, চলি—। তবে কিনা পরেশদার উপদেশেই—আচ্ছা চলি।

কুন্তলা বলে, এবার একটু হাসি মিশিয়ে—এসে ডিসটার্ব যা করে ফেলেছেন সেটা তো ফিরিয়ে নিতে পারছেন না আর। আর একটু কষ্ট দিয়ে না হয় থেকেই যান!—নিন, জুতো জামা খুলুন। জেগে তো আমায় থাকতেই হত। লাস্ট 'আপ' নিয়ে কে আসছে জানেন নাকি?

খানিক চুপ করে থাকে আলোক। মনে মনে হাসে। অবাকও হয়। যিনি আসছেন তারই বা সুকৃতি কি! তার নিজেরই বা এতো দুষ্কৃতি কেন? পরেশদা বলেছিল—পোনাহাটে যাদেরই রাত্রিবাসের প্রয়োজন হয়, তাদেরই জন্যে 'পান্থপাদপে'র দরজা হাঁ-পাট খোলা। তার নিজের অদৃষ্টে যে ব্যবহার জুটল তাতে সে এই কথা মানতে পারছে কই? অথচ লাস্ট আপ নিয়ে যিনি আসছেন, কী ভাগ্যবান তিনি।

আলোক বলে—ঠিক জানি না।

ইতস্ততঃ করতে থাকে আলোক। জামা জুতো খোলার ইচ্ছে প্রচুর। কিন্তু হোটেল মালিকটির ভাবগতিক আর মেজাজ সুবিধের নয়।

উল্টো ঠেলা মারছে তাকে। দিচ্ছে নীরব গলাধাক্কা। মনঃস্থির করতে না পেরে স্ট্যাচু বনে গিয়েছে সে।

টুপীটা আলোকের হাতে ধরাই ছিল।

কেড়ে নিল কুন্তলা। আর সেই মুহূর্তে আলোকের নিজের মনের আয়নায় ছায়া পড়ল আলোকের সুদর্শন শরীরের। দর্পণে পদার্পণ করবার সাথে সাথেই ছায়াটার বুক ফুলে উঠল। এমন সুপুরুষ চেহারা ক'টা দেখেছে কুন্তলা। এতোক্ষণ ভালো করে চেহারাটা দেখতে পায়নি —তাড়াতে চাইছিল। চেহারাটা দেখতে পেয়ে এখন টুপী কেড়ে নেবার ব্যস্ততা।

হ্যাট-র্যাকে টুপী রেখে ভেতরের ঘরে অদৃশ্য হলো কুন্তলা।

হুকুম করে গেল—গরম জল দিচ্ছি ভেতরের উঠোনে। জামা বদলে নিন।

আলোক দেখল—কালো কথাটা সুন্দরী কথাটার বিপরীতার্থ নয়। কিন্তু মানুষের মনে কেমন করে যেন এমনি একটা সহজ ধারণা জন্মে গেছে যে, কালো মানেই কুচ্ছিত। পাঁচ ফুট চারের কম নয় লম্বায়। মুখখানা রমেন চক্রবর্তীর উডকাট। নাকটি বাঁশীও নয় অসিও নয়। প্রোপোরশনে অতুলনীয়। সমস্ত মুখখানা জুড়ে সৌন্দর্যের চেয়ে সামঞ্জস্য বেশী। সুরভির চেয়ে লাবণ্যের।

আলোক ভাবতে লাগল, প্রথম ধাক্কায় ফিরে গেলে কি ভুলই হত!

খাবার প্রয়োজন ছিল না আলোকের। না থাকলেও কিছু খেতেই হলো।

জিজ্ঞাসাও করল না কুন্তলা। নিঃশব্দে কাচের ডিশে এনে সামনে ধরল। উষ্ণ কবোষ্ণ শীতল, তিন রকমের সমাবেশ। দু রকমের কাটলেট একখানা করে। মাংসের পুর দেওয়া সিঙ্গাড়া দু খানি—এগুলি কবোষ্ণ। মিষ্টিটি অনুভবে শীতল হলেও অনুরাগে উষ্ণ। আর একগ্লাস ধূমায়মান দুধ।

কুন্তলা জানত না লাস্ট আপে যিনি আসছেন বয়সে প্রবীণ তিনি। এখানে আসার জন্য মন অস্থির হলেও রানিং রুমেই স্থির হবেন তিনি।

জানলে আলোককে আরো বিব্রত হতে হত। খাবারের বহর তার ক্ষুধা সমুদ্রে দুপ্রস্থ ভিড়ত। তার পেটের বন্দরে জোর করে জায়গা করে দিত কুন্তলার হুকুম।

পরিমাণ দেখে ভয় পায় আলোক। নকল ভয় নয় আসল। এতো! বলে—সত্যি আমার খাবার প্রয়োজন একটুও নেই। ওরে বাবা, রোজই আপনি এই এতো খাবার জড়ো করেন বুঝি মিস রায় চৌধুরী! তা হলে ফতুর হতে বাকি কতো!

প্লেট থেকে ঢাকা তুলছিল কুন্তলা। এক ঝটকায় মুখ তুলে স্তব্ধ হয়ে রইল খানিক। চালু হাত বন্ধ হয়ে গেল। কোথাকার এক অদৃশ্য হাত এসে মন-সেতারের সবগুলি তারকে এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে দিয়ে গেল। রেশটা থাকতে পারত অনেকক্ষণ, কিন্তু ধরা পড়া কাজের কথা নয়। তাই চেষ্টা করে সহজ হলো কুন্তলা। বলল—এতো রাতে বসে বসে লেকচারই মারবেন! ভালোই জানেন আপনি, সবটুকু না খেলে নিস্তার নেই আপনার।

আলোক বলল—এতো শাস্তি পাবার মতন কিছু করেছি নাকি! পরেশদা বললেন তাই তো এলাম।

নকল বিরক্তিতে কুন্তলা বলে—আরে বাপু, অপরাধ আপনার হয় নি, হয়েছে আমার। কথার সুরু করেছি ঝাঁজ দিয়ে। মিষ্টি খাইয়ে ক্ষতি পুরোতে হবে না তার! তেতো মুখ নিয়ে চলে যেতে দেবো না।

শেষ রাত্রে ঘড়ির য়্যালার্ম তুলে দিল কুন্তলাকে। কুন্তলা তুলে দিল আলোককে।—উঠুন উঠুন—চারটে কুড়ি। মুখ হাত ধুতে হবে না?

অনেক হিজিবিজি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েছিল আলোক। আশালতায় ফল ধরিয়ে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলতে ফেলতে ঘুম এসেছিল তার, অনেক বিলম্বে। নতুন পরিবেশ বলে নয়, ভয়েও নয়। আশার গা ছমছমানিতে অজাগর ছিল অধিক রাত অবধি। অলৌকিক সম্ভাবনায় রাত দুটো পর্যন্ত জেগে কেটেছে কাল।

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে আলোক বলল—ঘুমোলুম আর কই? এরই মধ্যে বেজে গেল স'চারটে!

কুন্তলা বলল তরল পরিহাসে—এখন তো তিনটে রাত অন্ততঃ বাড়ীর আরামে ঘুমোতে পারবেন। পুষিয়ে নেবেন'খন আজকের অনিদ্রা।

হাসির মোড়কে দীর্ঘশ্বাসের একটা ছোট্ট পুরিয়া খুলে ধরে আলোক—হায়রে! মেয়েদের 'মেস' বাস লেখেন নি কেন বিধাতা? কষ্টে রোজগার করা রক্তের ভাগ দিতে হয় না ছারপোকাকে। আমি ঘুম পুষিয়ে নেবো কি? তার আগে ছারপোকার গুষ্ঠীই একরাত্রের লোকসান পুষিয়ে নেবে।

কুন্তলা বলে—আহা, মেসে থাকতে হয় বুঝি!

আলোক ওঠে—মুখ ধোয় হাত ধোয়। মনের পর্দার ওপর থেকে আশার একটা মলিন ছোপ ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে। ওঠে না সেটা। জল লেগে গাঢ় হয় আরো।

দুধে গাঢ় কোকো খায় একগ্রাস, খান কয় বিস্কুট। আরো ছিল। ঠেলে দেয় আলোক—খাবো কি! কাল রাত্রের খাবারই জীর্ণ হয় নি এখনও।

শেষ রাত্রের বিদায়ী আলোর মায়া আছে নিজস্ব একটা। একটা মায়া কাজল পরিয়ে দেয় শেষরাত্রি—শুকতারার জ্বল জ্বল ছল ছল চোখ থেকে নিয়ে। এই সময়ে কারোকে যদি ট্রেন বা গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে থাকেন, ভেবে দেখুন—এই মোহিনী সময়ে একটি নির্ভুল না-ভোলা মন নিয়ে ফিরেছেন। আজও তাকে ভুলতে পারেন নি।

কুন্তলা ঘাড় বাঁকিয়ে মায়া হাসি হেসে বলে—আসবেন আবার!

আলোক বলে—না।

কুন্তলা বলে—ইস্। বলেই নিজের তরলতার কাছে নিজেই লজ্জিত হয়। হয়ে পরিতাপ করে সারাদিন।

এখানে কিছু পূর্বকথা বলা দরকার। দিকের মধ্যে যেমন পূর্ব—সূর্য

ওঠার দিক, দিন শুরু হওয়ার দিক—জীবনেও তেমনি পূর্বকথা। পূর্বকথা না বললে বোঝা যায় না সব জিনিসটা। বোঝা যাবে না পান্থপাদপ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

শকুন্তলা রায়, নরেশবাবুর একমাত্র সন্তান। শকুন্তলার জন্মের বছর-কয় বাদেই নরেশবাবুর স্ত্রী বিয়োগ হয়। মেয়েটা তাই মায়ের আদর যেমন পেলে না, শাসনও পেলে না। পাড়ায় পাড়ায় বকাটেপনা করে বেড়ে উঠতে লাগল। মাচার বাঁধন না মানা বর্ষার পুঁই-ডাঁটা।

অমনি দেখতে। নধর। পল্লবিত। অমনি শ্যামল পাতায় ছাওয়া চোখ জুড়োন কান্তি। রূপ আছে দাহ নেই। মধ্যাহ্ন সূর্য নয়, ত্রয়োদশীর চাঁদ—চেয়ে থাকা যায়। চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, থাকলে ভালো লাগে। টানা টানা চোখ। ছ আনা সেরের গুলী পটোল চিরে আধখানা করলে যেমনটি হয়। মুখখানার ওপর ভেসে থাকে। নাকটি তিল ফুল জিনিও নয়, খাঁড়ার মতো বাঁশীর মতোও নয়। টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতোও নয়। শকুন্তলার ঠোঁট দুটিও বেশ। ওপরেরটি গণিতের সেকেণ্ড ব্রাকেট, নীচেরটি থার্ড। সুন্দর সাজানো দুপাটি দাঁত, মুক্তো-দানার মতো। সব মিলে মিশে একটি সমানুপাত মুখ। আহিরীটোলা পালপাড়ার নিতাই পালের তৈরী নয়। অপটু পোটোর তৈরী। রংটি মাজা। গৌরবর্ণ অপালিশে, কি শ্যামবর্ণ বেশী পালিশে যে রং জন্মায়।

শকুন্তলা ছেঁটে যে নাম জন্মায়—সেটি ওর সত্য স্বরূপ। কুন্তলা। বাঁকা বাঁকা চুল, পিঠ ছাপানো। ওর জটিল মনের গহনের মতো ঘন। দুর্জ্ঞেয় আর দুর্গম। মাথার ওপর সিঁথির দুপাশে ঢেউয়ের পর ঢেউ। ঊর্মিলা শৈবলিনী। রোদে, আলোয় ঢেউয়ের মাথায় মণি জ্বলতে থাকে। ফণিনী।

কুন্তলা। কুন্তী। রেগে গেলে ডাকা হত গরম খুন্তী।

বয়সে যখন সর্বসিদ্ধা অর্থাৎ ত্রয়োদশী, এই ফাজিল চপল মেয়ে হয়তো কাঁধে এসে ভর করলো।

একদিনের একটা নমুনা দিই—

পাড়ার শশী, শশীভূষণ সরকার গার্ড হয়েছে রেলগাড়ীর পরীক্ষা পাস দিয়ে। পাড়াটায় আরো গার্ড আছে ড্রাইভারও আছে। কুন্তীর ইচ্ছে হলো শশীর ভালমানষির ঘাড়ে চাপবার।

থার্ড ক্লাসের বই হাতে—ইস্কুলের পথে না গিয়ে আগের মোড়ে বাঁক নিল বাঁয়ে। একেবারে শশীদার বাড়ী।

শশীদার মার সঙ্গে দেখা উঠোনে। মনে মনে প্রমাদ গণলেন মা। কুন্তী বলল—শশীদা কৈ ?

বলতে বলতে মায়ের পাশ কাটিয়ে শশীদার সাথে মোলাকাত। এবং সরাসরি বক্তব্য পেশ।

—সামবাজারের সসীদা, ডিউটি কখন তোমার ?

শশীর মার চেয়ে বেশী ঘাবড়ালো শশী—কেন বলো তো ? এই বারোটা নাগাদ বেরোব।—রাত্রে এসে সাবান তো মাখতেই হয়, আচ্ছাসে গায় তেল মাখছিল শশী। দু পায়ের লুঙ্গী উরুর উর্ধ্বে ছিল। তেরো বছরের সম্মানে নেমে এলো কাফ মাসল পর্যন্ত।

ভুরু-টুরু কুঁচকে ঘাড় কাত করে বিজ্ঞের মতো তাকালো ফিরবে কখন ?

—এই পাঁচটা স-পাঁচটা হবে।

আনন্দে লাফিয়ে উঠল কুন্তী—ফাস কেলাস। ভে-রী গুড। ঠিক হায়—

বাইসেপে তেল মাখা বন্ধ হয়ে গেল শশীর—ব্যাপার কি? কি ঠিক হ্যায় ?

—তাড়াতাড়ি করো। জলদি চালাও। মাসীমা, ও মাসীমা—কি রাঁধছেন ? দিন না একটু খাই—

শশী ছেড়ে মাসীর কাঁধে ভর।

ফ্রক যাই যাই, শাড়ী ধরো ধরো কুন্তীর। বয়স্কারা দেখতে চান শাড়ীতে। মনে মনে খুশীর অভাব যথেষ্ট থাকলেও মাসী মুখে বললেন—কি রে কুন্তী ? কি ঠিক হ্যায় ?

বিন্দুমাত্র দ্বিধা নয়, ভণিতা নয়। কুন্তী বললে—ও দেখুন ঠেলে-ঠেলে চলবে না। ও তো জিভে দিলুম হয়ে গেল। গার্ড হয়েছে শশীদা। শশীদা খাওয়াতো তো। আমার তা চাই না। আমি যাবো শশীদার সাথে রেলগাড়ীতে চড়ে। থার্ড ক্লাসে পড়ি বলে থার্ড ক্লাসে চড়বো না। আমার দাদা গার্ড। চাপবো ফার্স্ট ক্লাসে। শশীদা ফিরবে পাঁচটা নাগাদ। সব দিক বজায় রইল। ফিরে গেলে টেরও পাবে না পিসিমা। হাতে কালি মুখে কালি। ভাববে—নিকে পড়ে এলো। আসলে হাতে আর মুখে যে দোয়াতের কালি নয়, ট্রেনের কালি—তাও বুঝতে পারবে না।—পিসি-বুড়ীটা ভারী ইয়ে, বুঝলে মাসিমা!

এ হেন কুন্তী যখন কুন্তলা—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নামটাও পুরে আসছে—এবার আর শশীদার বাড়ী নয়। শশীদার কর্মস্থল—পাঁচ নম্বর প্লাটফর্ম একেবারে—।

প্লাটফর্মের ওপর অনেক ঘরের একটি ঘরে। টি-টি-আই সুধীর মুখুজ্যের সঙ্গে শশী গল্প করছিল। মোজা খোলা পা টেবিলে তোলা। সুইং ডোর ঠেলে উঠতেও শশীর চেতনায় সাড়া জাগে নি। জাগল মেয়ে মূর্তি ঢুকতে দেখে। শশী বলল—বলুন—আরে ও, তুই! বোস বোস।

বলেই লজ্জা পেল শশী। তুই বলা যায় না আর। উচিত হয় নি। কি সুন্দর চেহারা হয়েছে কুন্তীর। দুকূলে ভরা ভরতি।

—উঃ—খুঁজতে খুঁজতে হাল্লাক। নর্থ সাউথের উত্তর দক্ষিণ তো ঘুঁটে ফেলেছি। তুমি না সাউথে ছিলে? তুমি কিন্তু বাপু পপুলার নও বেশী—কেউ চিনতেই পারলে না!

কথাবার্তার মধ্যে যে সুর বাজলো তার অন্তরঙ্গতা সুধীর মুখুজ্যেকে তুলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সুধীর উঠে গেল।

শশী বলল—ক-তো-দি-ন পর! তা, আছো কেমন? তারপর—! খবর কি? চললে কোথায়?

কুন্তলা হাসল অল্প—খবর? বলছি। দু আনা পয়সা ফ্যালো তো।

আগে! তোমার সাথে দেখা করতে আসব—ছাড়লে না গেটে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনিয়ে ছাড়লে!

উত্তর দেবার ছিল না শশীর। সোজাসুজি না তাকিয়ে কুন্তীর কুন্তলা রূপ দেখছিল শশী। সর্ব অঙ্গে সুন্দর মেয়েটা। রংটা যদি ফরসা হত আর এক পোঁচ। এলো খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর লুটোচ্ছে। কতো বড়ো! গোটা একটা অমাবস্যার অন্ধকার জড়ো করা ওখানে। চোখ দুটোতে—

জিব ফাসনার টেনে হাত-ব্যাগের জোড়া ঠোঁট ফাঁক করছিল কুন্তলা। প্ল্যাটফর্ম টিকিটের খোঁজে নিশ্চয়। অবনমিত মুখ, তাকিয়ে দেখছিল শশী। সিঁথিটায় চামড়ারই রং, আলগা কোন রং নেই।

কি এক টুকরো ছাপানো কাগজ। ছোট্ট, দু আড়াই বাই এক ইঞ্চি হবে। শশীর দিকে বাড়িয়ে ধরল কুন্তলা—ছ্যাখো তো—

এক নজরের বেশী দরকার হলো না। শশী বললে—বাড়ীর বিজ্ঞাপন। ও বাব্বা, এতো জায়গা থাকতে পোনাহাট কেন?

কুন্তলা হাসল। বলল—নিয়ে যাবে ট্রেনে—? একবার তো নিয়ে যাও নি! এবার যাবে? দেখতে চাই বাড়ীটা—

কেনা কাটায় সময় লেগেছিল মাস ছয়েক। প্রথমবার ছাড়া শশীদার সাহায্য দরকার হয় নি আর। একা একাই যাওয়া আসা করেছে খাণ্ডারনী মেয়ে।

এ মেয়ে ট্রেনে যাতায়াত করেছে যতোবার, শশীর মনে যাওয়া আসা করেছে ওমনি অতোবার। কতোগুলি প্রশ্ন।

কুন্তলার পদবী কি আজকাল? বিয়ে হয়েছে তো! না, হয় নি? নরেশবাবু কোথায়? ওর বাবা? আছেন কি নেই?

ভুভারতে এতো জায়গা থাকতে পোনাহাট কেন?

জিজ্ঞেস করে নি শশী। সাহস হয় নি। জড়িয়ে পড়তে হয় যদি!

শেয়ালডাকা এই আধা-শহর পছন্দ করার কারণ একাধিক। একটি

তার এই যে, এইদামে কুলীন কলকাতায় এক ছটাক জমির বেশী পাওয়া যায় না কিছু।

মন্দই বা কি? বড়ো রেল জাংশান—প্রায় টার্মিনাস। কোর্ট কাছারি। হাট বাজার দোকান পসার। সোয়া লক্ষ লোকের বাস। ছেলে-ইস্কুল, মেয়ে-ইস্কুল, মাইনর, হাই। না, কলেজ নেই।

ইলেকট্রিসিটি? কাগজে পত্তরে ইনজিনিয়ারের মগজে এসেছে। উঁকি ঝুঁকি মারছে প্ল্যানে ব্লু-প্রিন্টে। ঢোকার পার্‌মিশান চেয়ে কড়া নাড়ছে শহরের। ইলেকট্রিক নেই এইটেই যা মন বেজার করার। এঃ—রাত্তির বেলা হ্যারিকেন লণ্ঠন!

ও পাশে চূর্ণী নদী, রেল লাইন থেকে পাঁচ ফার্‌লঙ। পোনাহাটের লক্ষ্মী স্থলপথ জলপথ, দু পথেই আসেন। খারাপটা কিসে!

মনস্থির করবে করবে করছে, এমন দিনে বাড়ীটা আর একবার দেখার দরকার মনে হলো কুন্তলার। এই আর একবার শশীদার শরণ—

—আবার কবে পোনাহাটের ডিউটি পড়বে তোমার শশীদা?

—ঠিক জানি নে। কর্তাদের মর্জি।

—তবু—

—আন্দাজ করে দেখি। কারেক্ট নাও হতে পারে যদিও।

বুক পকেট থেকে টাইম টেবল বের করে কনসাল্ট করে শশী। বিড়বিড় করে নিজের মনে—থ্রি ফিফটিওয়ান নিয়ে যাবো। নিয়ে আসবো থ্রি ফর্টি ফোর। এক নম্বরে 'ইন'—টোয়েন্টি সেভেনটিন। তারপর অফ। কাল—কাল—কাল—থ্রি থার্টি সেভেন দেবে কি থ্রি ফর্টি নাইন—কে জানে?

বাদ বাকি কথা ডুবেই যায় শশীর। টাইম টেবলের আপ ডাউনের উঁচু নিচুতে মনে মনে বহুবার পাদচারণা করে শশী। শেষে বলে—নেক্সট ফ্রাইডের আগে পোনাহাট যাওয়া হবে না মনে হচ্ছে।—থ্রি ফিফটিনাইন দিলে টোয়েন্টি থ্রি ফর্টি ফাইভে পোনাহাট। টু থার্টিওয়ানে

পোনাহাট য়্যারাইভাল জিরো ফিফটিওয়ান। পোনাহাটে স-পাঁচ ঘণ্টা রাত্রিবাস।—অদৃষ্টে আছেই—

কুন্তলা বলে—আচ্ছা, রাত্তিরে কোথায় থাকো তোমরা? বাইরে থাকতে কষ্ট হয় না? খারাপ লাগে না?

—উপায়? চাকরি ইজ চাকরি। কোথায় থাকি? যেখেনে পারি। এ-এস-এম-এর ঘরের কোণ, মালখানা, স্টেশনের এঘর ওঘর—একটু অন্ধকার পাই যেখেনে। রানিং রুমেও থাকেন কেউ কেউ।—ঐ যে দেখছ কাঠের সিন্দুক, যাবে সঙ্গে। সাবান তোয়ালে টুথব্রাশ পেস্ট। জামা কাপড় মশারি। ফ্লাস্ক, ওয়াটার বটলও অনেক সময়। কি নেই ওতে? গোটা সংসার—

সিন্দুক-পানা ঢাউস কাঠের বাক্স। ব্লক ক্যাপিটালে সাদা রঙে ওপরে লেখা—এস. বি. এস.।

গৃহপ্রবেশের দিন।

সব নিজ হাতে রাঁধলে কুন্তলা। পোনাহাটের ঘাটে চূর্ণীর পোনা এবং পাকা—জল থেকে জীবন্ত উঠে, ঝোলে ঝালে কালিয়া কারি তরকারীতে নিজেদের মৃতদেহ সুস্বাদু করে রাখলে।

এই ছ মাসে বাড়ী কেনার কল্যাণে সব গার্ডের সঙ্গে চেনা হয়েছে কুন্তলার। শশীর মাধ্যমে। নেমন্তন্ন হলো তাদের।

পাত পাতা হলো দু পংক্তিতে। মাঝখানের ফাঁক ব্যবধান রচনা করে রাখল। খেতে বসে এই ব্যবস্থা দেখে কে যেন শুধোল—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আলাদা নাকি?

কুন্তলা বলল—সত্যি তাই। আমি রেঁধেছি কিনা। ব্রাহ্মণদের তো জাত মারতে পারি না। ফলারের ব্যবস্থা তাদের জন্যে।

—ও সব ফাঁক রেখে ফাঁকি মারা চলবে না। চিঁড়ে কলার ফলার—ও কাঁচকলা খাবেটা কে? নেই মাংতা—

পাত পাতার ফাঁক বুঁজে গেল। পাশাপাশি বসে খেলে সবাই। কজনই বা! জন কুড়ি বাইশ—

কুন্তলা জিভ আর খুন্তী চালনায় কতো পটু সেটা জানতে পেলে সবাই।

খেয়ে উঠে তক্তাপোশে মেঝেতে জমি নিলে সব। পেট আইঢাই। কুন্তলার রান্না এতো সরেস যে, সন্দেশ রসগোল্লার মতো সরস, দইয়ের মতো রসাল জিনিষও পড়ে রইল। ভোজনদারেরা ওজন বুঝলে নিজের —খাওয়া ফিনিশ হবার পর। আগে নয়। ওজন নিলে বোঝা যেতো— হুমুখো থলিটা আড়াই সের গিলে বসে আছে।

সন্ধ্যের মুখে দেখা গেল—পরেশ অনুকূল মাধব সত্যেন বেণী—এই কজন আছে। বৌকে ভয় করে শশী, পালিয়েছে সে আগেই।

নরেশবাবু সুকুমারকে নিয়ে লরী পৌঁছনর কথা। খুব দেরী হলেও বেলা বারোটা একটার মধ্যে। পৌঁছল না, সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। গোটা সংসারটা লরীর চার চাকায় হেঁটে জায়গা বদলাবে আজ। কি হলো তার?

সত্যেন নন্দী বলল—কি হবে তা হলে? কলকাতা যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে! রাত বিরেতে একা তো আর থাকতে পারবেন না অচেনা জায়গায়।

—তাই তো ভাবছি—

ভাবতে ভাবতে একই সঙ্গে দু তরফে দুটো কথা জন্মাল। যে কথা পরে রূপ নিল বাস্তবে, কার্যকরী হলো।

কুন্তলা বলল—আমিও রওনা হবো ট্রেনে, এদিকে ওরা এসে পড়বে। গিয়ে দেখবো বাড়ীওলার তালা ঝুলছে। তখন কলকাতায় আমার অবস্থাটা হবে কী?

পরেশ বললে—তাই তো—

কুন্তলা ভাবলে নাই যদি আসেন ওরা, এদের কেউ থেকে যেতে পারবে না।

পরেশ ভাবলে—কুন্তলার ঐ একই কথা। মুখ ফুটে বলতে পারে না।

রাত ভারী হলো। রয়ে গেল পরেশ আর সত্যেন। লরী না এলে যাবে না।

একশো গজ উত্তরে যে পাড়াটা, কি রকম জেগে উঠল যেন। কি রকম যেন প্রাণের সাড়া জাগল। ঘুমন্ত হার্টটা টিপ টিপ করে উঠল, সাওয়াজে, জানান দিয়ে। কি রকম কি রকম লাগল কুন্তলার। দিনের বেলা দেখেছে হয়তো—লোকজন যাওয়া আসা কমই। মফঃস্বলের আধা শহর এমনিই হয়। বাবুরা আপিস চলে গেছে, দিনের ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছে গিন্নীরা। মাছ হাতে কপি ঝুলিয়ে বাবুরা যখন ফিরবেন কলকাতার বাজার নিয়ে রাত তখন গভীর। তখন তো উনুন ধরাতে হবে। রান্না হবে, গরম গরম ঝোল খাবেন বাবুরা আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে ধরা টাটকা মাছের।

উত্তরপাড়া তাই নিঝুম। দিনের বেলার ঝিমোনি দেখে তাই ভেবেছিল কুন্তলা।

এখন সে-ধারণা উল্টে যাচ্ছে। কেমন কেমন যেন এই পাড়াটা। ঠিক সুবিধের নয়।

কুন্তলা আর চেপে রাখতে পারল না। বললে—বলছিলাম কি ওরা যদি নাই আসেন। আপনাদের কেউ—

লুফে নিলে পরেশ—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা নই। লাস্ট আপ নিয়ে আসছে মুকুয্যে। বারোটা দশ টশ হবে। সে থাকতে পারবে মোস্ট গ্ল্যাডলি—আশা তো করি—

—আর আপনারা?

—লাস্ট ডাউনে চলে যাবো ভাবছি। এগারোটা সাতচল্লিশ। মানে তেরো আর দশে তেইশ—ম্যাক্সিমাম হাফ য়্যান আওয়ার। পারবেন না একা থাকতে?

রহস্যময়ী হাসল —অবলা নই। থাকতে পারবো খুব। আধ ঘণ্টা কেন আধ বছর। তবে কি জানেন—

প্রয়োজন উভয়পক্ষের। একজন রানিং রুম, প্লাটফর্মের আধা

কোণে থাকার কষ্টর হাত থেকে বাঁচতে চায়। আর একজন চায় একা থাকার দুর্নামের হাত থেকে বাঁচতে।

রাতের পর রাত ট্রেনের গার্ড বদল। পাহারা বদল। কুন্তলার যৌবনের প্রহরী বদল। বাবা অবশ্যই আছেন কাশি নিয়ে। কাশির কাঁসি বাজান সারা রাত—

তারপর যে সব ভদ্রসন্তানদের রাতে থাকতে বলা, খেতেও বলতে হয় তাদের। তারা 'তোফা তোফা' করে খায়, ঢেঁকুর তোলে লম্বা লম্বা। শোয় আরাম করে, লম্বা টান টান। শেষ রাত্রে জাগিয়ে দেয় কুন্তলা, প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখা যায়। ডিউটি ফেলের ভয় নেই। চা-টা-আসটা পাওয়া যায় ঐ শেষ রাতেই।

মাসে এক একজনের যদি আট-দশটা মিল হতে থাকে—বিনি পয়সায় খাবে এমন অহৃদয় উনিশশো কুড়ি-একুশ সালে কেউ ছিল না। কুন্তলার রান্নার দাম দিতে লাগল তারা—

পান্থপাদপের জন্ম ইতিহাস এই—

জীবনের বিকিকিনির হাটে দেউলে হয়ে গিয়েছিল কুন্তলা। তার চোখের সামনেই অজস্র জুয়ো খেলা চলেছে। বারে বারেই জিততে দেখে নিজেরও সাধ গেছে একহাত খেলবার। মূলধনের দুটো অংশ—স্থাবর অস্থাবর। মূলধনের অস্থাবর অংশটার নাম যৌবন। স্থাবরটার নাম রূপ। কোনটাই প্রচুর নেই কুন্তলার। আবার নেই এমনও নয়। সেই অল্প মূলধনে এক হাত খেলে দেখবে না কি সে-ও! একবার হেরে যাওয়া মানেই বারে বারে হেরে যাওয়া নয়। একবার হেরে যাওয়া মানে পরাজয়ের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা, জয়ের প্রস্তুতিতে। জুয়ো খেলতে পারে নি বলেই পালিয়ে এসেছে পাড়াগাঁয়। এখানেও সেই জুয়ো!

আলোক যেদিন এলো—সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল কুন্তলা। উপকর্তাদের না চটিয়ে আস্তে আস্তে রাত্রিবাস বন্ধ করবে সে।

এ এক আপাত কুৎসাযোগ্য ব্যাপার। হয়তো কুৎসিত হয়েও উঠেছে এতোদিনে। সংকল্পের নদী যখন গুহাগর্ভ থেকে মুক্তি পায়, বিপুল তেজে তখন সে ফেনিল। উপল পাথরের বাধা তার কাছে কিছু নয়। এরপর খোলা প্রান্তরের বিস্তারে আলো লাগে তার কপালে, হাওয়া জুড়িয়ে দেয় সর্বাঙ্গ। গতি তখন মন্থর। পিছন পানে তাকাবার ইচ্ছা প্রবল। খোলা মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাও ঠাণ্ডা হয় তার। অতীতকে খতিয়ে দেখার ইচ্ছা হয়, সময় হয়।

এই খোলা মাঠে পড়ে এতোদিনে খেয়াল হয়েছে তার। গার্ড দাদাদের রাত্রিবাসে ভরসা এসেছে তার নিজের মনে। ভয় কেটে গেছে এই পাড়াটার। আবার সেই পরিমাণেই সুনামের থলি উজাড় হয়ে গেছে তার নিজের।

শশীদা প্রায় আসেই না। মনে হয় বড্ডো ভয় করে বৌকে।

পরেশ আসে বটে। কি যেন না-পাওয়ার অতৃপ্তিতে সর্বদাই ম্লানমুখ।

অমৃত চাটুয্যেও গা আড়াল দিচ্ছে আজকাল। বলে—বড্ডো খরচ।

কিন্তু খরচে পেছপা নয় যারা, লোভ যাদেব প্রচুর, এগিয়ে আসছে তারাই। তারাই ঐ আলোক মুখুয্যের দল।

এক খাঁচা থেকে মুক্তি নিয়েছে কুন্তলা আর-এক খাঁচায় ঢুকবে বলে নয়।

এমনি দিনে কুন্তলার পায়ের কাছে উড়ে এসে পড়ল বাণ-লাগা এক পাখি। পাখা ঝটপট করে ছটফট করতে লাগল যন্ত্রণায়। যে পাখার সাহসে ভর করে উড়তো সে, সেই পাখাতেই তার রক্ত। সেই পাখাই তার জখম!

পাখিটিকে কোলে তুলে নিল কুন্তলা। তাদের মধ্যে না বলা কথায় যে ভাবালাপ হলো, তার রূপকল্পটি এই—

পাখি বলল—বাঁচাও। কুন্তলা বলল—বাঁচাতে পারব কি না তা তো আমি জানি না! জানে তোমার বরাত। চেষ্টার কসুর করব না। —আমার ভয় হচ্ছে কি, জানো? পাখা একদিন মেরামত হবে তোমার।

জখম হওয়া ডানা নিয়ে ওড়ার ইচ্ছেও হবে। মনেও থাকবে না আজকের দিনের ক্ষতি আর ক্ষত!

পাখি বলল—না। ভুল করেছি উড়তে গিয়ে। ওড়া আমার জন্যে নয়।

কুন্তলা বলল না কিছু, হাসল শুধু। হাসিটা অবিশ্বাসের—

কুন্তলা বলল—নাম কি তোমার?

পাখি বলল—যা ছিল তা ছিল, নতুন নাম দাও। নবজন্ম হয়েছে আমার। নতুন করে জন্মেছি। এক মহামরণের হাত থেকে এসেছি বেঁচে।

কুন্তলা বলল—আমার আসল নাম শকুন্তলা। নামটায় কেমন শকুনের গন্ধ। যেন শকুন পড়েছে পালে পালে। আবার কেমন যেন দুঃখের গেরুয়া-ছোপানো। ছেঁটে কুন্তলা। এ নাম আমায় মানাতো। —এই ছাখো—বলে ইঙ্গিত করে আঁট করে বাঁধা খোঁপার দিকে। —যাক, কি নাম রাখি তোমার? অনসূয়া না প্রিয়ংবদা? প্রিয়ংবদাই শুনতে মিষ্টি। না কি বলো! আর, নামের মতন হতে যদি পারো, তবে তো মার দিয়া কেল্লা! প্রিয় বলে ডাকা যাবে। কতো লোকে তোমার ছোট্ট নামটিকে আকার দিয়ে আকারে বাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে!

মেয়েটি বলল—যান—

বয়স কতো আর? বাইশ-চব্বিশ। গ্রাম্য মেয়ে। গ্রামের দাঁড় থেকে উড়ে এসে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল শহরের বিস্তৃতি। ওরে বাবা, এযে কতো বড়ো। অনভ্যস্ত ওড়ার চেহারা দেখলেই ওস্তাদেরা টের পায়। এর যে অভ্যাস নেই টের পেল তারা। শর মারল। মুখে বলেছিল পঞ্চশর মেরেছি। শর আসলে একটাই। শরবনের শর। ডগায় মুখ বাঁকা, বঁড়শি পানা লোহার ফলা। পঞ্চশর তাদের কাছে কোথায়? পঞ্চশরের কারবারী নয় তারা—

মেয়ে দোসর ছাড়া কষ্ট হচ্ছিল এই ব্যাটাছেলের রাজ্যে। মনে মনে ইচ্ছে হয়েছিল সঙ্গিনী পাবার। এক অদ্ভুত যোগাযোগে জুটে গেল।

মেয়েটি বলল—ঝি রাখবেন শুনেছিলাম!

চেহারায় আভিজাত্যের ছোপ। আবিষ্কার করতে দেরি হলো না কুন্তলার। বললে—কই না তো! ঠাকুরঝি খুঁজছিলাম। ঠাকুর আর ঝি আলাদা করে নয়। একসঙ্গে ঠাকুরঝি।

চুপ করে রইল মেয়েটি। সাদা খোলের ময়লা শাড়ি। কাল কস্তা পাড়টা পাকিয়ে গোল করতে লাগল শুধু। আর সেই অবসরে কুন্তলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তাকে।

গায়ের চামড়ার জামাটা সাবান কেচে পরিষ্কার করলে আভিজাত্যের আসল রঙ উঁকি মারবে। জামাটার জাত দুয়েরই। আভিজাত্যের না হলেও সদ্বংশের। মুখে কালি লেগে রয়েছে কলঙ্কের। দাগ খুব গাঢ় নয়, আলতো। উপদেশ উদাহরণ আর দৃষ্টান্তের সম্মার্জনী দিয়ে মাজলে এক ঘষাতেই উঠে যাবে। সজ্জাত সদ্বংশ, পাকা বজ্জাত নয়। আশা আছে।

মনের অনুতাপ ছড়িয়ে পড়েছে বাইরে। রঙটা কালচে দেখাচ্ছে। আসলে সেটা অনুতাপের তাপে পোড়া। আসলে রং বেশ পরিষ্কার। চুলের আগডালে মগডালে আড়ালে আবডালে সর্বত্র বাবুই পাখির বাসা। অবিন্যাসে জটাজটিল। মোটা দাঁড়ার চিরুনির ও শিরদাঁড়া ভেঙে যাবে—সংস্কারের চেষ্টা করলে। মুখটা নিচু করে রয়েছে। সিঁথিটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। সাদা ধবধবে। বয়স্কা মেয়েরা বয়স্কাদের মান আর ভাগ্যের ওজন করে ঐ সিঁথিটার নিরিখে। সেটা মেঠো পথের ধূলো মাখা সাদা, না সুরকি রঙে লাল। তিনটে স্তর। আশাবতী ভাগ্যবতী ভাগ্যহীনা। কুমারী সধবা বিধবা। ভাগ্যবতীদের বাদ দিলে আর দু দলের সিঁথিই মেঠো রাস্তা। সিঁথি দেখে চেনা মুশকিল, আশাবতী না ভাগ্যহীনা। তখন দেখতে হয় মুখের রেখা। তাতেই টের পাওয়া যায়। প্রথম দল ভবিষ্যতের আশায় বিশ্বাসী। কুমারীদের মুখের রেখা দৃঢ়। হাসির আভায় আভাসিত। আর শেষের দলের মুখের রেখায় চলে-যাওয়া ঝড়ের অত্যাচার লেখা।

মুখখানা বেশ। বেশ কমনীয়। নম্র নরম। কোমলতায় মাখামাখি।

দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। হাতে লাল আর সবুজ গালার

কুন্তলা ভাবতে লাগল—সে আশ্রয় না দিলে পাশের উত্তরপাড়া কোলে তুলে নেবে। এ একেবারে ধ্রুব নিশ্চয়।

কুন্তলা জিজ্ঞেস করে—জাত কি গো বাছা?

নিচু মুখ ওঠে না। বন্ধ মুখ খোলেও না।

কুন্তলা ভাবে—ঝড়ের বেগে বলছে না—'কন্যা আমি মুখোপাধ্যায় বংশের'। আর যাই হোক—নিচু বংশ হতে পারে; বজ্জাত নয়।

কুন্তলা কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই একটা দীর্ঘশ্বাসের ঝাপটা। কুন্তলা স্তম্ভিত হলো, স্তব্ধও।

একটা সজোর দীর্ঘশ্বাসে সচকিত হয়ে উঠল ঘর। মুখ তুলতে তুলতে মেয়েটি বলল—নেই।

বেলা না-ত্নপুর না-বিকেল। একটা চেয়ারে বসে ছিল কুন্তলা লম্বা টেবিলটার এক মাথায়। মেয়েটি ছিল সামনে দাঁড়িয়ে। একটা চেয়ার এনে বসতেও বলেছে মেয়েটিকে। বসে নি।

টেবিলেব ওপব চার-পাঁচটা এঁটো থালা। হঠাৎ কুন্তলা কেন জানি সেদিকে একবার আর একবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। স্বগতঃই বলল যেন—ও স্টিলের থালা। ধুয়ে ফেললেই আবার ঝকঝকে। তাতে কি হয়েছে? সাবান দিলে টেরও পাওয়া যাবে না এঁটো ছিল ওটা। কেউ খেয়েছিল কোনদিন।

মেয়েটি বলল—তা পারবো। বাসন মাজতে পারবো খুব। আর কি কি করতে হবে?

হাসল কুন্তলা। উঠে গিয়ে হাত ধরলো। কিছুটি করতে হবে না তোমায়, বোন! আমার বড়ো একা মনে হতো। দোসর পেলাম আজ। এক বাবা বাদে কেবল বেটাছেলে আর বেটাছেলে। পারা যায় এতো দমবন্ধ ঘরে বাস করতে! গায়ের কাপড় ফেলার উপায় নেই। পায়ের কাপড় গোড়ালির ওপর উঠল কি—ত্রিশূল বিঁধতে

লাগল চতুর্দিকের। পুরুষগুলো যেন কি! এখানে অনেক ব্যাটাছেলে থাকে রাত্রিবাসের জন্য। আ মর! এক রাত্রি বৌ ছাড়া। এটা যেন বৌবাজার। চোখ মুখের ভাব এমনি।—তোমাকে পেলাম এবার। দেবো এবার সব তাড়িয়ে।—অসুবিধে কি জানো 'আসুন মশায়' 'বসুন মশায়' 'থাকুন মশায়' বলে একদিন আমিই ডেকে এনেছিলাম এদের। ডেকে আনা মানে কি—পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে একেবারে। ডেকে এনেছিলাম নিজের গরজে। এখন মনে মনে দূর দূর করি, মুখে বলি কি করে!

পুরুষ সম্পর্কে এই সব কথা বলার সময় ইচ্ছে করেই কুন্তলা তাকিয়েছিল মেয়েটির চোখে। চোখের পেরিস্কোপ দিয়ে মেয়েটির মন ভেসে উঠবেই। অতলান্তিকের অতলে ডুবোজাহাজের ডুবো-গতি কোন্ দিকে—জানা দরকার। উজ্জ্বল হয়ে উঠল না চোখ? বরং, ভয়ের আভাস। চোখ দুটি করুণ মিনতি করছে। যেন বলছে—আবার পুরুষ! এখানেও! নতুন করে মনে হলো কুন্তলাব, আর যাই হোক বজ্জাত নয়।

মন না রাঙায়ে কি ভুল করিয়ে কাপড় রাঙালে যোগী—মনে যার লাগে নি গেরুয়া-ছোপ সে ছুপিয়ে নেয় কাপড়। বাইরের কাপড়টা সর্বদা চোখে পড়তে পড়তে ঐ রঙের ছোপ মনেও লেগে যায় একদিন। মন পরে বসে ঐ গেরুয়া কাপড়—বাইরের কাপড় দেখতে দেখতে।

বহির্বাসটা কম মূল্যবান নয়, মনে করে কুন্তলা। শুধুই কি আচ্ছাদন ওটা, শুধুই পরিচ্ছদ! মোটেই নয়। শরীরের পক্ষে যদিও ওটা শুধু লজ্জা নিবারণ, মনের পক্ষে আবরণ নয় আভরণও, অলঙ্কারও।

মেয়েটির বেশভূষায় মন দিল কুন্তলা। সাদা রংটা ভালো হবে? সহজেই প্রতিভাস পড়ে যে কোন রঙের। প্রথম থেকেই রঙ করে দেয়া ভালো। কি রং হবে? কালো? কালো রঙ তো সব রঙ খেয়ে ফেলে দেয়। সাতটা রঙই মনে মনে বিচার করে কুন্তলা। হঠাৎ কি কারণে পছন্দ হয় বেগুনী রঙ। বেগুনী-পূর্ব রঙ আলট্রা ভায়লেট পেলেই ভালো হতো। অদৃশ্য অথচ রঙের লিস্টিতে তার নাম। কুন্তলা ভাবে—এতো

রঙ থাকতে বেগুনীটাই পছন্দ হলো কেন তার? হয়তো লালের থেকে সব চেয়ে দূরে বলে। লালকে বড় ভয় কুন্তলার।

মোটামুটি বেগুনী আর বেগুনীর কাছাকাছি রঙের শাড়ি ব্লাউজ হলো তার।

সত্যিই সুন্দর মেয়েটা। ধোপে ধোপে রঙ খুলছে। মুখের স্বাভাবিক চেহাবা আসছে ফিরে।

ভেতরের ঘরে হয় আজকাল শোবার জায়গার টানাটানি। প্রিয় নামটা যে প্রিয়ংবদা থেকে একথা মাথায় আসে নি সাধারণ জনের। প্রিয় বলে ডাকে কুন্তলা। সবাই ধরে নিয়েছ প্রিয়বালার সংক্ষেপ ওটা। আর সবাই প্রিয়বালা বলে ডাকে। কুন্তলা আর প্রিয়বালা শোয় ভেতরের ঘরে। বাবা আগে থেকেই ছিলেন। কাশির কাঁসি বাজান সারারাত। চোর এলে মনে করতে পারে জেগে আছে বুড়ো। আসলে ওটা না-ঘুম না-জাগা। মূর্চ্ছা যাওয়া রোগীর মতো না-প্রাণ না-প্রাণহীনতা।

তক্তাপোষ ফেলার আর একটা সম্মানজনক জায়গা আছে ঘরের মেঝেয়। অতিথি সজ্জনদের সঙ্গে। অনেক চিন্তা করে হলঘরে কাঠের পার্টিশানের মধ্যে বাবাকে সরিয়ে দিল না কুন্তলা। থাকুন বাবা এই ঘরেই।

বাবার কাশিই পাহারাদার। নকল হলেও পাহারার প্রয়োজন আছে এই ঘরে। এক গা গয়না প্রিয়র গায়। হার চুড়ি রুলি আর্মলেট তাগা বাজুবন্দ নয়। খনির সোনায় তৈরী হলে অবশ্যই খুলে তুলে রাখা যেত। রাখা যেত সিন্দুকে, রাখা যেত নিরাপত্তার সেফ ভল্টে। প্রিয়র গায়ের গয়নাগুলো খোলা যায় না, গায়ের সঙ্গে সাঁটা! এই হয়েছে মুশকিল।

আর এই হয়েছে ভয়ও। প্রিয়র গায়ের গহনার লোভে চোর না ঢুকে পড়ে।

দিনকয় বাদে আলোক যখন এলো, চোখ পড়লো প্রিয়র দিকে। নজর পড়লো কিনা জানি না। নীরবে ভ্রূ তোলাটা যে আসলে জিজ্ঞাসা—শিষ্টাচার সম্মত জিজ্ঞাসা, বুঝতে বাকি থাকে না কুন্তলার।

বলে—আমার মাসতুতো বোন। একা একা আর পারি না আপনাদের খিদমত করতে। আনিয়ে নিয়েছি ওকে।

খাবারের থালা নিয়ে ঢুকেছিল প্রিয়। হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল তার। বড়ো কাঁসার থালায় ট্রের মতন সাজিয়ে এনেছিল ছুটো কাচের প্লেট, কাচের গ্লাস আর কাপ। কাপ অবশ্য চায়ের নয়, রসগোল্লার। নামিয়ে সাজিয়ে রাখছিল টেবিলে।

হাত বন্ধ হয়ে গেল। প্লেটখানা কাঁসার থালা থেকে উঠে শূন্যেই ধরা রইল, টেবিলে নামল না। মুখখানা আপনি উঠে গেল প্রিয়র। চোখ ছুটো শূন্যদৃষ্টি মেলে রাখলে সামনের দেয়ালে। সব চেয়ে খাড়া হয়ে রইল কান ছুটো ভয়-পাওয়া খরগোসের মতো।

এই হঠাৎ কেমন হয়ে যাওয়া ভাব নজর এড়ালো না, যিনি বললেন যাকে বলা হলো—কারোরই। পথ মনে করল তাকে প্রণাম করছে ভক্ত, রথ ভাবল তাকে। মূর্তিও ঠিক একই মনে করল হয়তো। প্রিয়র অন্তর্যামী হাসল।

আলোক স্বাভাবিক ভাবেই মনে করল, তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে উচ্চকিত বনহরিণী। সবাই হয়ে থাকে, এই বা হবে না কেন?

কুন্তলা মনে করল তার ব্যবহারে চমকে গেছে প্রিয়। মাসতুতো বোনের সম্মান দেওয়া হয়েছে এঁটো পাতাকে।

একটা অস্বাস্তকর নিস্তব্ধতা। হ্যাট-র‍্যাকে টুপিটা রেখে মুখ ফিরিয়ে তাকালো আলোক। বলল—মাসতুতো বোন! তাই বলুন। বেটাছেলেদের হলে হতো মাসতুতো ভাই। তা হলেই হয়েছিল আর কি!

কুন্তলা যোগ দিল হাসিতে—বলি চোর কারা? আপনারা না আমরা!

আলোক বলল—রসিকতা করি একটা। অবশ্যই রসিকতাটা যেমন জোলো তেমনি শ্রুতিকটু! সিচুয়েশানের খাতিরে বলছি তবু! চোর উভয়েই। আপনারা আগে আমরা পরে। আপনাদেরটা পুলিশে ধরে না, পিনাল কোডে পেনালটির যোগ্য নয়। আর আমাদেরটা? ওরে সব্বনাশ! অন্ততঃ পাঁচ বছর শ্রীঘর।

কুন্তলা বুঝলেও ধরা দিল না। ভ্রূ তুলে বলল—কি রকম ?

আলোক বলল—ক্রিয়াটির প্রথমটি মন চুরি। সে কম্মটি আপনাদের। তারপর অসহ্য হয়ে পড়ি যখন আমরা,আপনাদের তখন চুরি করি আমরা। তখন একেবারে মানুষ চুরি ! চোর উভয়েই। আপনারাও আমরাও।

ঘরে এক ঘর আগুন নিয়ে শুলো কুন্তলা। বন্ধ দরজার ওধারে এক জালা ঘী।

ভয় লাগে কুন্তলার।

বাবা হয় নাক ডাকান নয় কাশেন। যেটাই করুন, কুন্তলা জানে বাবার আপিঙের জড়তা কাটবে না শেষ রাত্রি শেষ হবার আগে। কান শুনতে পাবে, চোখ দেখতে পাবে, চৈতন্য চোখ মেলে চাইবে—সবই শেষ রাত্রে। তার আগে নয়।

কাজেই দুজনে অনায়াসে মনের কথা বলা যেতে পারে। মনের কথা বলা, মনের নিগড় ভেঙে। কর্ণান্তর হবার ভয় নেই এতে।

এই রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে বড়ো কষ্ট হয় কুন্তলার। ঘুম আসে না সহজে। আর না-আসা পর্যন্ত স্মৃতি আর বিস্মৃতি মিলে বড়ো জ্বালাতন করে তাকে। ছটফট কবতে থাকে সে।

দুচোখের পাতা এক না হওয়া পর্যন্ত আজকাল কথা বলার লোক জুটেছে কুন্তলার। কথা বলে বলে ক্লান্তি টেনে আনা যায় চোখের পাতায়। ক্লান্তির পর চুপি চুপি আসে ঘুম।

কুন্তলা বলে—প্রিয় ঘুমোলি নাকি ?

ঘুম হয়তো পায় প্রিয়র, স্বীকার করে না মুখে। ঘুমোতেই চায় প্রিয়। ঘুমিয়ে কাটাতে চায় যতোটা পারা যায়। এমন কি দিনের বেলাতেও—যদি সম্ভব হতো। ঘুম মানে ভুলে থাকা। স্মৃতির ঝুলি ঝেড়ে ঝেড়ে ফণী মনসার ফণার দংশন !

প্রিয় বলে—না তো !

ঘরটা অন্ধকার না হলে কুন্তলার পক্ষে জিজ্ঞেস করা সম্ভব হতো কিনা বলা শক্ত।

কুন্তলা বলে—আলোক মুখুয্যে দেখতে কেমন রে ?

অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে প্রিয়র মনের নাড়ী ধরতে চেষ্টা করে কুন্তলা। চোখের দ্বারা সম্ভব নয়, অনুভব দিয়ে। এই মুহূর্তে কি ছলাৎছল ঢেউ উঠল সেখানে !

অন্ধকারের নৈরাজ্যে বোঝা গেল না কিছু।

অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে উত্তর এলো সংক্ষিপ্ত—মনে হলো বেশ ভালো দেখতে।

কুন্তলা বলল—শুধুই মনে হলো, না মনেও ধরল !

প্রিয় বলে—অনেক খোঁচা খেয়েছি দিদি সারাজীবন ! তুমি দিদি হয়ে আর খোঁচা দিও না। কুটোব মতো ভেসে যাচ্ছিলুম স্রোতে। কূলহারার—বলে বোধ হয় নিজেব কানেই কূলহারা কথাটা খারাপ লাগল তার। আর কিছু বলতে না পেরে থেমে গেল ঐখানেই।

কুন্তলা বলে—খোঁচা মারতে চাই নি প্রিয়। 'মনে হলো' কেন বললি তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

প্রিয় বলে—রাত্রে লণ্ঠনের আলোয় যা দেখা যায়, তা অস্পষ্ট ! তাই বলছিলাম—দিনে না দেখে—

কুন্তলা বলে—ভুল বললি। রাত্রে যা দেখা যায় সেইটেই স্পষ্ট। সেইটেই আসল রূপ পুরুষেব। আর সে রূপ একই। সব পুরুষের ঐ একই রূপ।—আর এরা তো দিনের বেলায় আসে না—

প্রিয় বলে—তুমি, তুমিও বললে দিদি ! সব পুরুষের ঐ একই রূপ—

কুন্তলা বলে—আমি কেন—সব মেয়েই বলবে। আমি অবশ্যই আলোক মুখুয্যের দেহ সৌষ্ঠবের যে রূপ সেই রূপের কথাই তুলেছিলাম ! —বেশ দেখতে আলোক, না রে ?

চুপ করে থাকে প্রিয়।

কুন্তলা জিজ্ঞাসা করে—মনে ব্যথা না পেলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ভালো লাগলে উত্তর দিস, নইলে দিস না।—সিঁদুর উঠেছিল কপালে ?

উত্তর আসে না।

কুন্তলা বলে—ঘুমোলি প্রিয় ?

পরিষ্কার উত্তর আসে জলদি— না তো !

কুন্তলা বলে—খাঁচার দরজা নিজেই খুললি, না খুলে ধরেছিল কেউ ?

আবার চুপ !

কুন্তলা শুধোয়—খাঁচা ভালো না, খোলা আকাশ ভালো রে ?

ভদ্রতার খাতিরেও উত্তর দিতে হয় এবার—খাঁচা—

কুন্তলা বলে—দূর দূর। আকাশ কতো ভালো ! সমস্ত আকাশটাই তো চরে বেড়াবার জায়গা ! কতো হাওয়া, কতো বাতাস, কতো আলো। তার কাছে খাঁচা ! দূর দূর ! খাঁচায় বাঁধা খাবার, বরাদ্দ বাঁধা। রাত দিন মুখের কাছে ধরে। চাইতে হয় না, চেঁচাতে হয় না, খুঁজতে হয় না, কষ্ট করতে হয় না। 'কেষ্ট কথা কও' বললেই খাবাব—ব্যস ! কিন্তু যে জন্য নাম—পাখি—সেই পাখা দুটোই অচল। মানুষেব একি আনন্দ— ! পাখিব পাখা ব্যবহার করতে না দিয়ে আটকে রাখা। পাখির যদি পাখাই না রইল আর মানুষের না রইল মান—তা হলে ?

কপট নাক ডাকায় প্রিয়।

শেষরাত্রে য়্যানসোনিয়া ডেকে দিল দুজনকেই। দুজনকে কেন বাড়ির সকলকেই। গায়ের আড়মোড়া ভেঙে আলিস্যি ছাড়তে ছাড়তে কুন্তলা বলল—প্রিয় ও প্রিয়, জাগলি নাকি ?

প্রিয় বলল ঃ হ্যাঁ দিদি—

কুন্তলা শুয়ে শুয়েই বলল : আজ আর পারছি না আমি। একটু উঠবি, উঠে চা-টা করে দে না আলোকবাবুকে !

বাইরের আলো আসে ঘরেব নিরালায়। অল্প, সরু, ফালি-ফালি, বিবর্ণ, মর মর আলো। আলোর চেয়ে ছায়া, ছায়ার চেয়ে ভৌতিক আবছায়া রচনা করে বেশী। বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির মতো অনেকটা ঃ দেখা। দেখা যায় না কিছুই।

সেই অন্ধকারে তাকিয়ে আরো কোনো অন্ধকারের সন্ধান পেল প্রিয়। এ অন্ধকার রহস্যে ছাওয়া ষড়যন্ত্রের মতো।

মনের অনিচ্ছাটাকে কোন যুক্তির মোড়কে মুড়লে বেমানান হবে না। না পছন্দ হবে না কুন্তলার। মনে মনে ভাবতে লাগল তাই। আর উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল।

এই মৌনকে সম্মতি মনে করতে পারল না কুন্তলার সহজাত বিচার বোধ। কুন্তলা বলল ঃ অনেক রাত অবধি ঘুম এলো না কাল। এই তো সবে ঘুমিয়েছি আজকের দিনটা চালিয়ে দিতে পারবি না? বড়ো ক্লান্তি লাগছে।

প্রিয় ভাবল—আলোকবাবু দেখতে কেমন, এর উত্তর কুন্তলার মনের মতো করে প্রিয় কাল দিতে পারে নি। তাই অনেক রাত্রি পর্যন্ত নির্ঘুম রাত্রির সঙ্গে লড়াই করেছে আর জবাব খুঁজেছে বুঝি কুন্তলা!

এবার আর দেরি করা নয় উত্তর দিতে। প্রিয় বলল—আমি সবই করব দিদি, তুমি শুধু ঐ ঘরে বসে থাকবে চুপটি করে।

একটা রহস্যময় হাসি হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল কুন্তলা—কেন, ভয় লাগছে নাকি রে! ভয় পাবার কথা নয় তো তোর!

ভোরবেলার বাসি মুখের দুর্গন্ধ যেমন অন্ত্রমুখ থেকে উঠে এসে নিজেরই নাকে কটু লাগে, তেমনি এক মুহূর্তে অন্তর মুখ ছেড়ে বাসি অতীত উঠে এলো সামনে। বাসি বাসনার ক্লেদ মাখামাখি একখণ্ড স্মৃতিপিণ্ড। অনেকটা অবৈধজাত ভ্রূণের মতো।

একটা হাসির বাণ মারল কুন্তলা। রক্তাক্ত করে দিয়ে গেল প্রিয়র প্রায় ফিরে পাওয়া মনের সুস্থতা বোধ। প্রিয় ভাবতে লাগল—শেষ রাত্রের নির্জনতা আলোকের চোখের কালোয় ঘন হয়ে আসবেই। প্রত্যেক পুরুষেরই আসে। সেই মুহূর্তে নীরব চোখ যদি ভাষাময় হয়ে ওঠে তখন সে কি করবে?

কালবিলম্ব না করে সে ও ঘরের দিকে পা বাড়াল। মুখে কিছু বলল না।

প্রথমদিন বলেই বোধ হয় কোন দুর্ঘটনাই ঘটল না। জাগিয়ে দিল জাগ্রত আলোককে। বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিল শেষরাত্রির বয়স। আলোক উঠল। এক জোড়া চোখে। তন্দ্রার আলস্য তার সঙ্গে বারে বারে সংঘাত লাগল এক জোড়া চোখের বিনিদ্রার জড়তা। এর বেশী কিছু হলো না।

স্টোভ ধরাল প্রিয়। চা তৈরী করল। প্লেটে বেড়ে দিল বিস্কুট, সন্দেশ, দু-একটা ফলমূল।

সব তৈরী হয়ে গেলে আলোক বলল—আর কষ্ট করবেন না। শুতে যান—

প্রিয় বলল—ঠিক আছে। খেয়ে নিন আপনি। তারপর শুলেই চলবে—

—না না সত্যি আর কষ্ট করবেন না।

এইবার একটু না হেসে পারল না প্রিয়। বলল—দরজাটাও দিতে হবে তো!

অল্প হেসে জবাব দিল আলোকঃ তাও তো বটে। শত্রুকে দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাবেন না। না?

হাসির আগুনে আরো হাসির হাওয়া দিলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে মনভূমি। গম্ভীর হয়ে গেল প্রিয়, বলল—আমাকে আপনি বলছেন কেন?

আলোক বলল—কি বলব তবে?

—কেন, তুমি!

গরম চায়ে ঠাণ্ডা চুমুক দিতে দিতে আলোক বলল—তুমি! কেন?

—বয়সে জ্ঞানে বুদ্ধিতে হয়তো বংশ মর্যাদায়ও যে ছোট তাকে তো তুমিই বলে। বলে না?

—হ্যাঁ, কনিষ্ঠকে লোকে তুমিই বলে বটে। আচ্ছা, তাই হবে!

জুতো জামা পরা হয়ে গিয়েছিল আগেই। চা শেষ করে জুতোর প্রিয়র পরীক্ষাপাশের শব্দ তুলে আলোক বেরিয়ে গেল। এক-মন চিন্তা প্রিয়র ভাবনায় পুরে দিয়ে বেরিয়ে গেল আলোকের শরীর।

এঁটো বাসনগুলো গুছিয়ে রাখতে বেশী সময় লাগার কথা নয়। সেই স্বল্প সময়েই দরজার ফুটো থেকে সরে গেল এক জোড়া চোখ। দুহাত দূর বিছানায় মড়ার মতো পড়ে থাকল আগের মতো। নিদ্রিতের ভান করে।

ঐ চোখে অগ্নিপরীক্ষার আগুন জ্বলছিল। কার—অবশ্যই কুন্তলার নিজের কাছেও পরিষ্কার ছিল না সে কথা।

একটা অস্বস্তির তুষ আগুন জ্বেলে রেখে দিল কুন্তলা, মনের মালসায়। সে আগুনের জন্ম কিসে তা জানা সম্ভব ছিল না তার। এক নিরবয়ব দহন। স্পষ্ট কোন শিখা নেই, অথচ পুড়েও যাচ্ছে মন জ্বলেও যাচ্ছে, চেতনা।

তার বাইরের প্রকাশটা টের পাওয়া গেল কুন্তলার সারাদিনের ব্যবহারে। মুখে বিরক্তির রেখা। ভাষায় খিটিমিটির শব্দকোষ।

প্রিয় খানিক বুঝল খানিক বুঝল না। বুঝত সবটাই, যদি তার জানা থাকত কুন্তলার অতীত। সেটা একেবারেই জানে না সে। যেমন জানে না কুন্তলার বয়স। শরীরের বাঁধুনির দুর্গে যৌবন বন্দী। যৌবন বেচারার এ বন্দীদশা কতোদিনের পুরনো, সেইটেই প্রিয়র মেয়ে চোখও আবিষ্কার করতে পারে নি।

সে যাই হোক কুন্তলা সম্বন্ধে অতো কিছু জানার প্রয়োজন তার নেই। অধিকার তো নয়ই। সে যতোটুকু জানে তাই নিয়ে তার খুশি থাকতে হবে।

এর পর আলোক ঘন ঘন এসেছে গেছে। অন্যান্য গার্ডদের চেয়ে বেশী ঘন। এতে সন্দেহ নেই কারো। মাঝে মাঝে দিন-দুপুরেও আসছে আজকাল।

আসছে আজকাল, থাকছে বেশী সময়।

এমনি একদিন দিন-দুপুরে আলোক এসে হাজির। নিষ্কর্মা দুপুর তখন বিশ্রাম খুঁজছে।

আলোকের বুকে পেটে বাঙালী সাজ, পায়ে শু। বোঝা যায় হাতের স্যুটকেসে গার্ড সাহেব বোঝাই। শুটা 'কমন'। প্রয়োজন মতো বাঙালী বাবুটি স্যুটকেসে বন্দী হতে বিলম্ব হবে না।

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে কুন্তলা হল ঘরটায় বসে আছে। চেয়ারের পিঠের ওপারে এক পিঠ চুল প্রিয়র হাতে বিলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে কুন্তলা। শরীরে যে আরাম পেলে মানুষেব চোখ বুজে যায় ভারী করে দেয় চোখের পাতা, সেই সুখাবেশ লেগেছে কুন্তলার মনে।

প্রিয় পিছনে দাঁড়িয়ে কুন্তলার চুলে বিলি কাটছে।

জুতোর আওয়াজ ঘরে এসে থমকে দাঁড়াল। চোখ বুজেই বুঝলে কুন্তলা। উপেন তার পুরনো জুতো জোড়াটা পরে সাহেবিয়ানা প্র্যাকটিস করে এই দুপুরেই। উপেন মনে করে চোখ খুলল না কুন্তলা।

হাত থেমে গেল প্রিয়র। চোখ বুজেই কুন্তলা বলল—থেমে গেলি কেন?

কি রকম এক অদ্ভুত ভূতে পাওয়া গলায় প্রিয় বলল—আলোক বাবু—

কতো দূব থেকে ভেসে এল প্রিয়র কণ্ঠ। সুখাবেশে গভীর, গম্ভীর। স্টিমারের সিটি অনেক দূরান্ত থেকে এসে পৌঁছল, কুয়াশার বুটিদার শাল গায় জড়িয়ে।

মনের এক জোড়া চোখ আছে। তা দিয়ে প্রেমিকের চোখে কুশ্রীতম নারীকেও উর্বশী মনে হয়। যে লগ্নে এই দেখা মনের গোপন চোখে চিরলগ্ন হয়ে থাকে—অন্ধ দেবতা আলোকের মনে সেই চোখ মেলে দিল। সেই লগ্ন এসে পৌঁছল আলোকের দিনপঞ্জীর পাতায়। চিরকালের মতো আলোকের মুগ্ধ চোখ এই দৃশ্যটি আবার দেখবার আশায় লুব্ধ হয়ে রইল। কুন্তলা চোখ বুজে আছে। অতিরিক্ত আবেশে প্রিয়ের বক্ষোলগ্ন হয়ে এমনি করেই বুঝি চোখ বুজে থাকে মেয়েরা। আলোকের এই রকম ধারণাই ছিল। অসহায় চুল অজস্র মেঘের স্তরে মাটির ছোঁয়া চাইছে। আশ্রয়হীন। আলোক এই মুহূর্তে কুন্তলাকে মনের মানব জমীনে মৌরুসী আশ্রয় দিল।

ধ্যান যখন ভাঙল, উত্তর দেবার সময় তার অনেক আগেই পার হয়ে গেছে।

চোখ মেলেছে কুন্তলা। আলোকের চোখের মুগ্ধবোধ বুঝে ওঠার আগেই তারও বুঝি নেশার ঘোর লেগেছে।

নেশার ঘোর জোর হলে, কথা বেরোয় না মুখ থেকে। কুন্তলারও তাই হলো। অতো দূর থেকে এসেও আলোকের চোখ দুটো যেন তার গলা টিপে ধরল। বাক্‌স্ফূর্তি হল না তার। অবাক স্ফূর্তি থেকে গেল মনের গভীরে।

আলোক যখন কথা বলতে পারল দেখা গেল সে হাসছে। ঠোঁট নড়ল তার আওয়াজ বের হলো—উকুন তোলা! শকুন্তলার সখী উকুন তোলা—

গম্ভীর পরিবেশ। সবাই উসখুস করছিল মনে মনে। চেষ্টা করছিল সবাই নিজের মনকে চোখ ঠারতে। আর কেউ টের না পায়। টের না পায় নিজের মনও। মনোভাব ধরা না পড়ে যায়, অপরের কাছে। এই হাসির হাতুড়িতে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল ঘরের আবহাওয়া। যতোটা হাসি হাসা যেতে পারে এই কথার কৌতুকে, ইচ্ছে করেই তার চেয়ে বেশী হাসল সবাই।

প্রিয় হাসল নিঃশব্দে। তার বোধহয় সশব্দ হাসি বারণ। অন্ততঃ নিজেকে নিজে নিষেধ করে রেখেছে সে।

আলোকই বলল আবার—আপনার পোষাকী নাম শুনেছি শকুন্তলা। আর আপনার প্রিয় সখী উকুন তোলা, উপস্থিত যিনি উকুন তোলা কার্যে ব্যস্ত আছেন। এখন একজন দুষ্মন্ত জুটলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়—

এতোক্ষণ চুপ করে থাকার অস্বস্তি কাটাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কুন্তলা। কিছু যেন বলা চাই। হঠাৎ একটা কথা জুগিয়ে গেল মুখে—দুষ্মন্তর আর একটা বানান আছে। যার সংস্কৃত ঘেঁষা উচ্চারণ দুশমন-তো করা যায়। কাজেই যতোদিন না জোটে, ততোদিনই

মঙ্গল। আর স্বামী মাত্রেই দুশমন তো!—ওর পুরো নামটা কিন্তু প্রিয়বালা নয়, প্রিয়ংবদা। জানেন তো! কাজেই আশঙ্কা হয়, দুশমন এসে কাঁধে ভর না-করে কোনদিন।

লেখা পড়া যা হোক কিছু করেছে কুন্তলা। পুঁথি পুস্তকের লেখা-পড়ার চেয়েও শিক্ষা নিয়েছে বেশী। নিজের মনকে শেখাবার চেষ্টায় পড়েছে সত্যিকার পাঠ।

তা নইলে স্বাধীন জেনানার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে না আর। যে জীবন কুমারী কালে পিতার, আর বিবাহিতা অবস্থায় স্বামীরূপী অন্ন-দাতার মুখ চেয়ে থাকে, তার আর যাই হোক বিকশিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। মুখ চেয়েই জীবন কাটে—এর মুখ আর তার মুখ। এর তার মুখ দেখেই মুগ্ধ হতে হয়। মুগ্ধ না হলেও ভান করতে হয়—

শিক্ষিতা হলেও এতোখানি গুছিয়ে কাব্য করার অভ্যাস তার ছিল না। কি রকম করে হয়ে গেল।

মুখ চাপা দিয়ে নীরবে হাসতে হাসতে প্রিয় চলে গেল পাশের ঘরে।

কুন্তলার খেয়াল হলো—দাঁড়িয়ে আছে আলোক। বলল—বসুন।

হাতের সুটকেস মেঝেতে নামিয়ে আলোক বসল। অদূরে একটা চেয়ারে—

মাথার পিছনে হাত দুটো নিয়ে এক অপূর্ব সুঠাম ভঙ্গীতে চুলটা জড়িয়ে নিল কুন্তলা। আলোকের চোখ দুটো না না করতে লাগল—। সেটুকু নিষেধ বুঝল কুন্তলা। বুঝল বলেই কুন্তলা এটুকুও বুঝল—তার পক্ষে আলোককে আর রূপমুগ্ধ করা ঠিক হবে না। কুন্তলা ছেলেমানুষ নয়। মক্ষিকাকে জড়িয়ে পড়তে দেওয়া উচিত হবে না ঊর্ণনাভের জালে। যে মক্ষিকাকে দেওয়া যায়—সে আলোক নয়—

কুন্তলা বলল—অসময়ে যে—

কাব্যে পেয়ে বসেছে আজ আলোককে। আসলে মনের যে প্রকোষ্ঠে কাব্য বাস করে, সেই কুঠুরিতেই থাকে রূপজ মোহ। আর তারই কাছাকাছি কামরায় থাকে কামরাঙা রঙ প্রেম।

আলোক বলল—আজ যাই তাহলে! অসময়ে এসে ভালো করি নি। সুসময়েই আসব না-হয়?—ভুলে যাচ্ছেন কেন আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা অসময়েই। গভীর রাত্রে দরজা ঠেলাঠেলি। কি বিরক্তই হয়েছিলেন, মনে পড়ে?

কুন্তলা বলল—বেশ হাত গুণতে পারেন তো! আমি নিজেই জানতুম না নিজের খবর। বিরক্ত হয়েছিলুম নাকি?—যাক, ডিউটি কখন?

আলোক হাসল। বলল—নেই। পালিয়েছি। আজ আমার অফ। বেলেঘাটার মেসে শুয়ে না থেকে এসে জুটেছি পান্থপাদপের ছায়ায়।—এই নামটা দেওয়া কার? বেশ রসিক লোক তিনি। আপনার দেওয়া নাকি?

নিঃশব্দে হাসল একটু কুন্তলা।

মাথার পেছনে পড়েছে বিকেলের রোদ। বাঁ গালের পাশ দিয়ে সেই রোদ এসে পড়ছে পুব দেয়ালে। রোদ নিজেই ধন্য হয়েছে চিজেল কাট মুখের ছোঁয়া পেয়ে—গালে পড়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। কুন্তলাকে জ্যোতিষ্ক করেছে রোদ, না রোদকে হাসিয়ে তুলেছে কুন্তলার মুখ নাক গালের ডৌল, বুঝতে পারছিল না আলোক।

হোটেল রেস্টুরেন্টের উনুন রাবণের চিতা। কেৎলী চাপানোই আছে—কুচো কয়লা সারাদিন মুঠো মুঠো দেওয়া হচ্ছেই।

এক কাপ চা করতে আর কতোক্ষণ?

ধূমায়মান একবাটি চা নাকের ডগায় এনে ধরল প্রিয়। তারও মুখে সামনে থেকে পড়ল বিকেলের রোদ।

আলোক সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল, দেখে দেখে বিস্মিত হলো। প্রিয় রূপসী, আর কুন্তলা ময়লা রং নিয়েই সুন্দর—। অনেক বেশী সুন্দর, তুলনাই চলে না দুজনের।

প্রিয় চা রেখে চলে গেল। ভিতর ঘর থেকে রান্নার গন্ধ আসছে মিষ্টি। কারির মাংস চেপেছে মনে হয়। হয়তো রান্নার তদারক করতেই কুন্তলার ভিতর বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন হলো। গায়ের ওপর কাপড়-

জামা বিশ্রাম সুখে শিথিল হয়ে নিজেরাই বিশ্রাম নিচ্ছিল। ডান বুকের গিরিচূড়া থেকে খসে গিয়েছিল আঁচল। সেটাকে অবশ্য আগেই নিজ জায়গায় পুনরায় স্থাপন করেছিল, আলোক ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে। সর্বাঙ্গের শিথিলতা দৃঢ় করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কুন্তলা। টেনে দিল জামা-কাপড়ের কঠিন বাতাবরণ। যাতে আলোকের মুগ্ধ চোখের দৃষ্টিবাণ আবরণের বর্মে বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়।

চলে যাবার আগে কুন্তলা বলে গেল—বসুন একটু, আমি আসছি—

আলোক চেয়ে চেয়ে দেখল কুন্তলার চলে যাবার ছন্দটুকু। দারুশিল্পের চমৎকার উদাহরণ। চন্দনকাঠের উড কাট। অঙ্গের লাবণি গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল।

কুন্তলা যেতে যেতে অনুভব করল তার সর্বাঙ্গে আলোকের চাহনি আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

ফিরে এলো কুন্তলা—বেশ বাস সংহত করে। দেখল তেমনি আবিষ্টের মতো বসে আছে আলোক। আবিষ্টের মতো, সম্মোহিতের মতো।

আলোকের চোখের এই চাহনি কুন্তলার ভালো লাগল। না-লাগবার কারণ নেই। স্বয়ং দেবাদিদেব একটি বেলপাতায় খুশী। পূজা সকলেই চায়।

আর, ভালো লাগল বলেই নিজের ওপর অকারণে অকরুণ হয়ে উঠল কুন্তলা। নিজেকে কঠিন সমালোচনা করল মনে মনে। তার নিজের মুগ্ধ হওয়া চলে না, অন্যকে মুগ্ধ করা চলে না। এইজন্যই কি সব ছেড়ে এসেছে সে? স্বাধীন জীবনযাপন করবার আশায় সে পাড়ি দিয়েছে বিদেশে! এই কি নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টার ভূমিকা! এখানে কি প্রেম ভালবাসার জালে জড়িয়ে পড়তে এসেছে সে! কখনও নয়। সে জীবন তার জন্যে নয় আর।

সেই থেকে নতুন করে কঠিন তপস্যায় মেতে উঠল সে। নিজের সাথে সংগ্রাম। ভালো লেগেছে বলে সেই ভালো লাগার গলা টিপে

মারতে হবে। আর সেই সুন্দর সুগন্ধ ফুলটিকে বিনাশ করতে হবে অঙ্কুরেই।

কঠিন কঠোর হয়ে উঠল কুন্তলা নিজের ওপরই।

কিন্তু কুন্তলা বোধহয় জানত না যে মনটা বাতাসের মতো অনেকটা। একঘর বাতাসকে সংযম-বোধের কমপ্রেসার দিয়ে চেপে চুপে ছোট করা যায়। করা যায় এক মুঠো সংনমিত বায়ু। কিন্তু বেহুলার লোহার বাসরের মতো সূচ্যগ্র ছ্যাঁদাই যথেষ্ট। কোন অসতর্ক মুহূর্তে হাতছাড়া হয়ে সে হয়ে গিয়েছে এক আকাশ বাতাস। ছড়িয়ে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে আকাশে।

প্রিয় তো জানে না কি কারণে তাকেই এগিয়ে দিচ্ছে কুন্তলা। কুন্তলা নিজে চলে যাচ্ছে দূরে। আলোক মুখুয্যে ছাড়া বিশেষ কেউ আসেও না আজকাল। আলোক যতোক্ষণ থাকে চেষ্টা করে ব্যস্ত থাকে কুন্তলা। চেষ্টা করে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে।

সব চেয়ে বেশী মন দিয়েছে রেষ্টুরেণ্টের ছুঁতোকে জুৎসই ছাতা করে গড়ে তুলতে। হোটেলের ভাত-ডালে লাভ কম নেই হয়তো। আছে কি নেই, সেটা বড়ো কথা নয়, রেষ্টুরেণ্ট গড়তে মন লাগছে আজকাল তার।

আসবাব বাড়ছে আস্তে আস্তে। শ্বেতপাথর রঙা সিমেণ্টের টপওলা টেবিল এসেছে খাবার। কাঠের চেয়ার এসেছে বেশ পালিশওলা। গুণহীন কাঠের নয়, সেগুনের। মাঝখানের হলটায় রাজমিস্ত্রি লেগেছে। টেনে ফেলে দিয়েছে ভিখিরির কম্বলের মতো জোড়া-তালির দৈন্য। বালি ধরিয়েছে নতুন। তার ওপর নতুন রঙ। মেঝে আর মেঝে থেকে হাঁটু অবধি দেয়ালে এক রঙ। তার পর ফিতে-চওড়া কালো বর্ডার। সীমানার ওপরে অন্য রঙ—হাল্কা হলুদ। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ছাল তোলা মেঝে খুবলে তুলে ফেলেছে। বসিয়েছে সেখানে হাল আমলের মোজেক।

এ যেন পুরনো কুন্তলার নিজেরই নতুন প্রসাধন। বাড়ির দেয়ালে নয়, ও যেন মনের দেয়ালে রঙ দিয়ে গেছে। বনিয়াদ বদলানো যায় না। চরিত্রের বনেদ কি বদলানো যায়, গেলে হয়তো তাই চেষ্টা করতো কুন্তলা। মেঝেটাকে তাই শৌখিন করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়ও করে

তুলেছে। আর নয় নড়বড়ে ভিত। ভিতরে ভিতরে আর নয় খানা-খন্দ। তাতে জমে থাকে অতীতের ময়লা আর ঘোলা জল। টেনে তোলা চাই অতীতকে। ফেলে দেয়া চাই অতীতকে, অতীতেই—

রেস্টুরেণ্ট গড়া কাজে বেশী করে মন দিয়েছে কুন্তলা। পান্থ-পাদপের তৈরী 'পাপা চপ' ট্রেন লাইনের হাত ধরে পোনাহাট ছাড়িয়ে বিদেশেও সৌরভ ছড়িয়েছে। এমনি দিনে আলোক মুখুয্যে এক কাণ্ড করল। ঢাক ঢাক গুড়গুড়ের ঢাকা থেকে টেনে বের করল খেলো আলোচনার বাঁকা তলোয়ার। ভেবেছিল ঝল্‌সে দেবে কুন্তলার মরচে ধরা মনোযোগ। কেটে টুকরো করবে কুন্তলার জড়তার শামুকের খোল।

আলোক এসেছে সেদিন সন্ধ্যেবেলা। না-মালুম কোন্ ট্রেনে এলো তখন। এগিয়ে এলো প্রিয় দু-একটা কথা নিয়ে। বড়ো হলটায় সেই জামা-কাপড়েই বসে আছে আলোক। তার চিন্তার চলন্ত ইঞ্জিন থেকে সিগারেট চিমনিতে গাঢ় সাদা তামাকী ধোঁয়া আকাশে উড়ে যাচ্ছিল।

প্রিয়র কথাগুলো রান-ওভার হয়ে অকালে মারা গেল। আলোক জেনে-দেখেও গার্ডভ্যান থেকে ভ্যাকুয়াম ব্রেক টানলে না। মন দিল না প্রিয়র কথায়।

প্রিয় বলল—চা দেবো, না, একবারে রাতের খাবার খাবেন ?

আলোক ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তেমনি তাকিয়ে রইল। তিন আঙুলের ডগায় তেমনি ঘোরাতে লাগল সিগারেটটাকে।

প্রশ্নের রেকর্ডটায় আবার পিন চাপাল প্রিয়। তেমনি সুরে তেমনি ছন্দতালে কথাগুলো পুনরুচ্চারিত হলো। আলোকের ট্রান্সমিটার তেমনি অকেজো পড়ে রইল তবু।

চলে গেল প্রিয়। বেশীক্ষণ দাঁড়াবার উপায় বা ইচ্ছা কোনটাই ছিল না তার। হলটায় রেস্টুরেণ্টের ভিড় জমে উঠবে অচিরাৎ। প্রস্তুতি চাই তার—প্রস্তুত হতে হবে এখন থেকেই।

আলোক আসার সঙ্গে সঙ্গেই কুন্তলা ভেতরের ঘরে গেছে। গেছে আলোকের আশার বকুলতলা দিয়ে। পায়ে-দলা ফুল-দলগুলোর

তখনও উপেক্ষার অপমানের পার ধুলো লেগে। কুন্তলার পার। আলোক তাকিয়ে তাকিয়ে পরখ করে দেখছিল সেই ধুলো। ধুলোটা অপমানের, উপেক্ষার—না অন্য কিছুর!

উপেন ঘোরাঘুরি করছিল নিজের কাজে। ইশারায় ডাকলে তাকে আলোক, বললে—মিস রায়কে ডেকে দাও তো! দেখে নিও, উনি ব্যস্ত আছেন কিনা!

মেয়েরা অপ্রতিভ হয় না। ওদের অপ্রতিভ করতে যে প্রতিভার দরকার, সাধারণ পুরুষের তা থাকে না।

কুন্তলা এলো। হাতে 'পাপা চপ'। ধোঁয়া বেরুচ্ছে তা থেকে। আর আসছে গন্ধের নিমন্ত্রণ।

আলোক রাগ করতে চাইলেও আলোকের ক্ষিধে রাগ করতে নারাজ। ক্ষিধে আর আলোক তো একই সত্তার। দোটানায় পড়ে গেল বেচারা।

কুন্তলাকে দেখে হাতের সিগারেট ফেলে দিল আলোক। সিগারেটটা তখন আত্মদাহের মাঝপথে মাত্র। আলোকের মনের আত্মদাহও মাঝ পথেই বোধহয়।

চপের ডিসটা আলোকের সামনে দিলেও মন দিল কুন্তলা অন্য কাস্টমারে। হাসি দিল অবশ্য সকলকেই। আলোককে বিতরণ করল খানিকটা, দুপাটি শুভ্র দাঁতের প্লেটে ঝকঝকে হাসির আলো—

আলোককে বলল—খান। তার সঙ্গে মিশিয়ে দিল হাসির মাধুরী। দিল বলেই অভিমানের কাঠিন্যের খোল খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল আলোকের।

বলেই যদিও অন্যদিকে এগিয়ে গেল কুন্তলা, তবুও।

ওধারের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি যুবক। খানিকটা থতমত খাওয়া মুখের ভাব। বড় বড় ঢেউয়ে কপালে নেমে এসেছে চাঁদির চুলের গোছা—অযত্ন অবিন্যাসের ধারায়। ডাগর ডাগর চোখ, পুরনো বল্লালসেনী আভিজাত্যের ছাপ মারা। গোটা একখানা গড়ুরিনের

বোরেটা সাবান লেগে যেতে পারে গায়ের চাপ বাঁধা ময়লা তুলে ফেলতে। কিন্তু তারপর যে রঙ ফুটে বেরোবে মেঘভাঙা রোদ। পিন-ফুটোন তীক্ষ্ণতা থাকবে তাতে!

কুন্তলা তারি দিকে এগিয়ে গেল। আলোক ঈর্ষার লগি ফেলে ফেলে মেপে দেখেছিল ছেলেটার সৌন্দর্যের গভীরতা। গায়ে সবুজ ডোরা কাটা ছিটের শার্ট। হাতা গুটানো। হাতা নয়,—আস্তিনই গুটানো। শার্টটা যেমন ভঁাজ ভাঙা আধ ময়লা, পরনের ধুতিখানা আর এক কাঠি সরেস। ছোপ ছোপ দাগ লাগা কিসের কে জানে। পায়ে এক জোড়া আধা হিল-তোলা মেয়েদের স্যাণ্ডেল—জরীর কাজ যার শরীরে বিগত গৌরবের মতো লেগে। পরন আর গড়ন, রূপ আর ঠাট, সবই নিরীক্ষণ করে দেখছিল আলোক।

সামনে গিয়ে কুন্তলা ভৎ র্সনার নিঃশব্দ হাসি হাসতে লাগল। কথা বলল না কেউই।

খানিক বাদে কুন্তলাই কথা বলল—জানো তো রামধনু সাইন পেণ্টার্সদের কাছে ছোট্ট সাইন বোর্ড লিখতে দিয়েছি—'আজ নগদ কাল ধার।'

ছেলেটি বলল ঠোঁট উল্টে—তা আর জানি না! ওষুধও বের করে ফেলেছি তার ক-বে!—মুখে তার দুষ্টুমি ভরা কিছু-না-মানা হাসি।

—কি! কি! তার আবার ওষুধ কি, শুনি! তার ওষুধ পয়সা ফেলে দেওয়া—বলল কুন্তলা।

ছেলেটির মুখে সীরিয়াস হবার কোন লক্ষণই দেখা দিল না। বলল—ই-স্ তাই বুঝি। দুরাত্মার কখনও ছলনার অভাব হয় নাকি? তারিখ লেখা কাগজ মেরে দেবো তলায়। আজ না হয় পাব না, কাল ধার দেবে তাহলে তো—

কুন্তলা বলল—নিজ মুখেই স্বীকার করলে তুমি দুরাত্মা! বেশ, দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ করতে বলে গেছে সবাই।—আজ কিন্তু শেষ, তা বলে দিচ্ছি। কাল অবধি পাওনা ছিল ছাব্বিশ টাকা দশ আনা।

আজ কি কি চাই বলো ?—আচ্ছা, এই পয়সাগুলো তো তুমিই মেরে দাও! কি করো এতো পয়সা দিয়ে? যারা কিনতে দেয় তারা তো পয়সা দিয়েই পাঠায়? আমার কাছে ধারে নিতে পাঠায় না নিশ্চয়—শেষের কথাগুলো কুন্তলা হাসির সুইচ অফ করে দিয়েই বললো।

গম্ভীর হয়ে গেল ছেলেটাও। তারও মুখে নামল গাম্ভীর্যের ছায়া। বললো—তা তো দেয়ই! বেশীর ভাগ দিনই ব্যালান্স ফেরৎ দিতে ইচ্ছে করে ভুলে যাই। বড়োলোক আর বড়োলোকের ছেলেদের ব্যাপার। ফেরৎ চায় না, জেনে শুনেই। মুখ ফুটে চাইতে পারে না। চক্ষুলজ্জা তো আছে!

যেন ধমক দিয়ে উঠল কুন্তলা—থামো-থামো, চক্ষুলজ্জা। জানোয়ারের দল, ওদের চোখ কই যে চক্ষুলজ্জা থাকবে ?

ম্লান হাসল ছেলেটি—রাগ করছেন! মানুষের মধ্যেই স্বর্গ নরক। মানুষ খানিকটা সুর খানিকটা অসুর। খানিক ভালো আর খানিকটা মন্দ! এ তো প্রত্যেকের মধ্যেই আছে! আপনার মধ্যে কি কিছুই খারাপ নেই, আমার মধ্যে ভালো নেই একটুও ?

কুন্তলা বলল—চপ রাঁধতে পারি, মাংস রাঁধতে পারি। বিদ্যে ঐটুকুই। রসায়নের রান্না একটুও জানি নে। জানলে কি করতুম জানো ? এক জালা দুধের মধ্যে থেকে ঐ একফোঁটা চোনা তুলে ফেলতুম! তুমি তো সবটাই ভালো! মারাত্মক এক ফোঁটা গোমূত্র পড়ে গেছে তোমার চরিত্রে—গেছে যাক, আরো খদ্দের আছে পাঁচটা। দাঁড়িয়ে বকবক করলে চলবে না আমার। বলো কি দেবো আজ ? ক'টা করে।

ছেলেটি বলল—শনিবার আজ। ভিড় হবে বেশী। ক'টা কি লাগবে জানি না এখনও। বলছিলুম কি—বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডান পা-টা দোলাতে লাগল। খানিক প্রত্যাশা খানিক সঙ্কোচে।

—বলো, বলো—সময় নষ্ট করো না আমার। আমার সময়ের দাম আছে।

—আপনার কেন, সে তো ঐ ওপাড়ার ওদের! আপনার সময়ের

আবার দাম!—যাকগে। বলছিলুম কাটলেটগুলো কি গড়ে ফেলেছেন? ঐ মশলা পুর কিমার পরিমাণ এক রেখে সেপটা বদলে দিন না! ওদের বলেছি—কুন্তলীন কাটলেট খাওয়াবো আজ। একটা নাম লাগসই করে লাগাতে পারলেই হলো—ব্যস!—কি হলো আপনার? অতো হাসছেন যে!—আরে, আরে—কি হলো—হলো কি?

এতোক্ষণ বাদে খেয়াল হয়েছে ছেলেটির—মুখে আঁচল চেপে হাসতে হাসতে চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে কুন্তলার। বসে পড়েছে কুন্তলা সামনের চেয়ারটায়। মুখটা চেপে ধরেছে টেবিলে। হাসির ধমক কমে নি তাতেও। মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না এবার—হাসির গমকে গমকে বিরাট খোঁপাটা আকাশমুখী হয়ে নাচছে শুধু—

বেশ খানিকক্ষণ হাসিটা দাবানো সম্ভব হলো না কুন্তলার।

আলোক যে সব কথা জিজ্ঞেস করবে স্থির করেছিল, কুন্তলার হাসির দাপটে ওলট-পালট হয়ে গেল। অন্য প্রশ্ন তৈরী করতে লাগল মনে মনে। সোজা থার্ড ব্রাকেটের মতো সরল ভ্রূ দুটোর সন্ধিতে বিরক্তির ধাক্কায় সেকেণ্ড ব্রাকেট তৈরী করে অনেক জল্পনা করছিল আলোক।

খানিকটা কালাতিপাত হলো—ভালোই হলো। ইতিমধ্যে যুক্তির সুমুখ মনের সমুখে এসে দাঁড়াল তার। নতুন খাতে বইতে লাগল ভাবনা। স্বাভাবিক ভাবে যে মুখ বিরক্তি-রক্ত হয়ে গোমড়া হয়ে উঠেছিল, যুক্তি এনে জোর করা হাসির নকল মুখোশ এঁটে দিল তাতে। আলোক ভাবতে লাগল কি অধিকার আছে তার এখানে? কোন দাবীতে কৈফিয়ৎ চাইতে যাচ্ছিল সে কুন্তলার কাছে! কি কৈফিয়ৎ? কিসের? কুন্তলা কে? আশ্চর্য, তার এতোক্ষণের চিন্তা এইবার তাকে আশ্চর্য করে দিল। সে এতোক্ষণ কি এইভাবে ভেবে আসে নি যে কুন্তলা তার আপনজন, ভালোবাসার লোক—যে তাকে কথা দিয়েছে আমি তোমারি। আর তাই, সে-মেয়ে যখন তারি চোখের সামনে হেসে গড়িয়ে পড়ছে অন্যলোকের সঙ্গে, ঐ ভুয়ো মমত্ব বোধই তাকে ঈর্ষা-

পাগল করে তুলেছিল। হাসি পাচ্ছে এখন আলোককের। সে মনে মনে কুন্তলাকে শাস্তি দেবার কথাও ইতিমধ্যে ভেবে ফেলেছে একবার।

হাসির বেগ খানিকটা কমে এলে মুখ তুলল কুন্তলা। ঐ হাসির ফাঁকে ফাঁকেই বলল—কি বললে, কি কাটলেট? বেশ নাম বের করেছ তো?—কেন, নতুন সেপে গড়ে দিলে কি উবগার হবে? কার উবগার?—তোমার? না আমার?

ছেলেটা বলল—ও—এই কথা। আমি ভেবেছি না জানি কী! উবগার? আমারই—আর কাব?—হ্যাঁ আপনারও বলতে পারেন! অক্ষয় হয়ে থাকবেন আপনি কাটলেটের নামের মধ্যে! প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। না না, সান্ধ্যস্মরণীয় হয়ে থাকবেন আপনি। যে পঞ্চকন্যা নিত্য স্মরণীয় হয়ে আছেন, তার মধ্যে কুন্তী আছেন। আপনি না হয় কুন্তলাই। বেশী তফাৎ নেই—

কুন্তলা বলল—তোমার উবগারটা কি, শুনি?

ছেলেটি বলল—বা রে—চার আনা দাম কাটলেটের, নামটার দাম আর দু-আনা। হলো ছ আনা! বড়োলোকের ছেলেদের পকেটে বেশ ভদ্রভাবে ছুরি চালানো যাবে।

গম্ভীর হয়ে কুন্তলা বলল—তা বেশ তাই না হয় হলো! স্মরণীয় হয়ে কাজ নেই আমার। তোমার উবগার হলেই হলো—

আবার হাসি পেয়ে গেল তার। আর এক চোট হেসে নিয়ে বলল—কিন্তু মুশকিল হলো যে একটা। যেদিন মাটন ফাউল না থাকবে, আমার গা থেকে মাংস কেটে নিয়ে কাটলেট বানিয়ে দিতে বলবে না তো!—দ্যাখো ভেবে চিন্তে! রাজী হয়ে যাই নইলে—

কুন্তলার মনে হলো—এক ঢিলে অন্ততঃ দুটো পাখী মেরেছে। আলোককে দেখিয়ে দেখিয়ে অজ্ঞাতকুলশীল একটা সুন্দর ছেলের সঙ্গে হাসি মস্করা করেছে। একটু আগেই প্রিয়র মুখে শুনেছে সে—অকারণ ক্রোধে গুমরে মরছিল আলোক। তাকে নীরব অথচ ভদ্র অর্ধচন্দ্র

দেবার সময় এসেছে। তাই অপরিচিত এই ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজে হাসল জোর করে—করে ছেলেটাকেও হাসাল।

আর একটা কাজ হলো বলে মনে হলো কুন্তলার। এই ছেলেটার যতোটুকু সে জানে ততোটুকু গ্লানিকর। ক্লিন্ন ইতিহাস। এর বাইরে যেটুকু সে জানে না সেটুকু চোখের চেহারায় লিখেই রেখেছেন ভগবান। মুখের রেখাচিত্রে, কথা বলাব ধরন-ধারণে সেটুকু ভদ্র। সেটুকুতে এই ছেলেটার মনুষ্যত্ব ফিরে পাওয়ার অঙ্গীকার স্পষ্ট করে লেখা।

ভদ্রলোকের ভদ্র ছেলে। পঙ্ককুণ্ড থেকে টেনে তুলতে হলে সেই নিম্নে নেমে যেতে হবে তো। নইলে হাতখানা নাগাল পাওয়া যাবে কি করে? চপ কাটলেট নিয়ে যায় ছেলেটা, উত্তরপাড়ার সান্ধ্য অতিথিদেব জন্য। সারাদিন ঘোবে ভবঘুরের নিরুদ্দেশ ঘূর্ণী। বকবাজির সঙ্গে সঙ্গে কুলোকের পাল্লায় পড়ে ডিগবাজি খায়। ডিগবাজি খায় ওর ঘোর-প্যাঁচ-না-জানা হাইপলিশ মনটা। জীবন নেই, জীবিকা নেই বলেই। অতীত গিয়েছে বলবাব মতো নয়। সেই অতীত আজও পঙ্কিল নোংরা হাত বাড়িয়ে রেখেছে ভবিষ্যৎকে কলঙ্ক কালি মাখাতে। সবাই মিলে দূর ছাই করেছে। ফলে দূর তো করেইছে নিজেকে! ছাইও হতে বসেছে বিরাট একটা চন্দন কাঠ জ্বলা আগুন। ছাই দেখা যাচ্ছে বলে সভয়ে পরিহার কবেছে সবাই। কিন্তু পুড়ছে চন্দন কাঠ। যে সে কাঠ নয়! আত্ম অভিমানে এই খেয়ালটা করছে না কেউ।

একে বাঁচাতে হবে। নিজের গায়ে আঁচও যদি লাগে, পরোয়া নেই। লেগে যায় যদি খানিকটা কাদাই, পিছিয়ে গেলে চলবে না। ইংরিজিতে প্রচলন আছে, একটা পয়সা বাঁচানো মানে একটা পয়সা রোজগার করা। এও তাই—একটা প্রাণকে ফিরিয়ে আনা মানে, কে জানে একটা পথই তৈরী করা হয়তো।

অবাক হলো তিনজনেই। ছেলেটা ভাবল, অকারণ উচ্ছ্বাসের এই জোয়ার কেন? সে এসেছে গেছে কতোবার। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চিনেছে কুন্তলাকে। দোকানে ঢুকে চপ কাটলেট কিনতে এসে তাকে

দেখেছে। কথা কয়েছে, আলাপ করেছে। আস্তে আস্তে বাকিতে নেবার প্রস্তাব তুলেছে। বাকিতে দিয়েছে কুন্তলা। আর কারোকে না দিলেও তাকে দিয়েছে। কেন দিয়েছে তা জানে না। তার পরিচয় জানে নি, জানতে চায় নি কুন্তলা। সেও বলে নি। তবু কেন দিনের পর দিন ধার দিয়েছে তাকে? সে কৌতূহল মেটানো তার স্বার্থের পরিপন্থী হবে ভেবে ছেলেটা নিজে যেচে জানতে চায় নি। তার বর্তমান পরিচয় বলার মতো নয়। অতীত? বলার মতো নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই অতি উজ্জ্বল অতীতের পটভূমিতে বর্তমান আরো যে হতমান! উজ্জ্বল সূর্যোদয়ের পটভূমিতে মেঘে ম্লান দুপুর।

আলোক এতো অবাক হলো যে, হাতের সিগারেট আগা থেকে গোড়া হাতেই পুড়ে যেতে লাগল। টানতে ভুল হয়ে গেল। একি! কুন্তলা এতো প্রগলভ! এতো বাচাল! এতো সস্তা! সস্তা মানেই তো মূল্যহীনের কাছাকাছি। কুন্তলা কি তবে বাজে মেয়ে? এতোদিনের গাম্ভীর্য তার মুখোশ! কে একটা রাস্তার ছেলে, স্বভাব চরিত্র ভালো নয় নিশ্চয়ই ছেলেটার! কালি পড়তে শুরু করেছে চোখের কোলে! তার সঙ্গে এতো হা-হা হাসি কিসের! এই তাহলে কুন্তলার সত্য স্বরূপ!

অনেক আশা নিয়ে এসেছে আলোক। তার মধ্যে (শুধু ফাঁকা প্রেম নয়) জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও একটা। জীবনে বন্ধন নেই তার। মাও স্বর্গবাসে চলে গেছেন কবে। থাকার মধ্যে সৎ বোন আর এক অসৎ ছোট ভাই, বৈমাত্রেয়! কোন পক্ষই পক্ষান্তরের খবর রাখে না। তার মা ছিলেন বাবার প্রথমা স্ত্রী—সত্যিকার শুক্লপক্ষ। তিনি মারা গেলে বিমাতা, অশোক আর পরীর গর্ভধারিণী। দেহের বর্ণে আর কর্মে—কৃষ্ণপক্ষ। জননী মারা যাবার পর বাবা পুনর্বার বিবাহ করলে বাবা আর আপনজন থাকেন নি। আলোক বিধবা দিদিমার কাছে মানুষ হতে থাকে। মানুষ হয়েছে কিনা জানে না, বয়স বেড়েছে। গার্ড হয়েছে সে।

আলোক অনেকদিন থেকে দেখেছে, লক্ষ্য করেছে,—কুন্তলা তার

বিষয়ে আস্তে আস্তে উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। আজ ভেবে এসেছিল একটা কথা পাকাপাকি জেনে যাবে। আলোকের আসা-যাওয়া আর চায় কি না-চায় কুন্তলা। তাহলে আজই গুড বাঈ। বন্ধন জন্মায় নি। মায়া মমতার ফাঁসি গলায় পরার আগে সরে পড়া চাই তার।

সেই মনে করে এলেও বিপরীত মুখে মোড় ঘুরল মনটা। গত পনেরো মিনিটের ব্যবহারে ঠিক উল্টো দিকে পাল্টে গেল পালের হাওয়া। আলোক দেখতে চায় এই পরিচ্ছেদের শেষ। কিসের ঘনিষ্ঠতা ঐ রাস্তার ছেলেটার সঙ্গে। কে ঐ ছেলেটা? তার চোখের সুমুখে যাকে দেখিয়ে যে লীলা রঙ্গ হলো, সেটা কি বাস্তবিক না অভিনয়!

অভিনয়ই যদি হয় সে কি অভিনয় করতে জানে না! তার অভিনয় সঙ্গিনী তার নায়িকা হাতের কাছেই রয়েছে। প্রিয়। প্রিয় অনেক বেশী সুন্দর। বয়সেও অনেক কম। তবে তার কুলশীলের পরিচয় অবশ্যই জানা নেই তার। তাতে কি যায় আসে? আলোক তো শুধু অভিনয়ই করবে।

আলোক যাবে বলে এসেছিল, থাকবে বলে চলে যাবে আজ! থাকবে মানে যাতায়াত বজায় রাখবে! যেমন চলছিল তার চেয়ে বেশী। ভাব জমিয়ে নেবে প্রিয়র সঙ্গে—

তৃতীয় জন যে অবাক হলো, সে কুন্তলা নিজে। আলোককে দেখাতে গিয়ে বাহুল্যের পর্যায়ে চলে গেল তার ব্যবহার। রাস্তার ছেলেটার সঙ্গে এ কি ব্যবহার করে ফেলল সে। তার গোপন মনে ছেলেটাকে পাঁক থেকে টেনে তোলার সংকল্প অবশ্যই ছিল। সেই ক্ষীণ ইচ্ছার সূত্রটুকু এতো প্রবল হয়ে উঠবে বুঝতে পারে নি।

হয়ে যখন গেল—আর উপায় কি? এটাকে বজায় রেখে ভবিষ্যৎ অভিনয় করে যেতে হবে।

উত্তরপাড়ার চেহারা খুব খারাপ নয় দিনের বেলায়। দোতলার জানালার শিকে ত্রুকোণ-বাঁধা মিল বা তাঁতের শাড়ী শুকোয় রোদ্দুরে—পোনাহাটের অন্যান্য পাড়ার মতোই। ছোট ছোট দোতলা একতলা

বাড়ি। কোনটার সামনে উঠোন বা আঙিনা। বাঁশের বেড়ায় গোমুখ থেকে আত্মরক্ষা করে ফুলের বাগান বসিয়েছে কেউ। দু একটা বাড়ি আবার রাস্তার ওপরই। এগুলোর নিচের তলায় জানলা বন্ধ থাকে দিনের বেলায়। ওপরতলা যদি থাকে—তার জানলাও প্রায়ই বন্ধ থাকে দিনের বেলা। অন্য পাড়ার মতো শাড়ী ঝুলিয়ে শুকোতে দিচ্ছেও, চুল ঝুলিয়ে শুকোয় না কেউ ছাতের ওপর। রাস্তায় হল্লা উঠলে, শবযাত্রা শোভাযাত্রা মিছিল বেরোলে, অন্য পাড়ার মতো খোলাখুলি হা-পাট খুলে যায় না বন্ধ জানালার পাল্লা। দাঁড়ায় না তাতে এসে উৎসুক মুখ চোখ। ছাতের আলসে ধরে দাঁড়ায় না শাড়ী-পরা মানুষের দল।

এ পাড়ার রাস্তায় কৌতূহল জমা হলে জানালার পাল্লা একটা চোখের পরিমাণে ফাঁক হয় মাত্র। তার বেশী নয়। তাও সন্তর্পণে। মিছিল চলে গেলে সেই ইঞ্চি প্রমাণ ফাঁকটুকুও বুজে যায়। আবাব নীরব নিথর স্পন্দনহীন। বাড়ীগুলো রাত জাগবে বলে দিনের বেলা রাতের ঘুমটুকু পুষিয়ে নেয়।

সেই ইঞ্চি প্রমাণ ফাঁকের মধ্যে দিয়ে যদি দেখতে পেতেন, আপনার নজরে পড়ত ফর্সা ফর্সা মুখ। ঘুমে আর ঘুমের অভাবে ঢুলুঢুলু চোখ। দোক্তা জর্দা রাঙা টুকটুকে ঠোঁট। মুখগুলো প্রথম দৃষ্টিতে ফর্সা মনে হলেও সবগুলোই স্বাভাবিক ফর্সা নয়। অনেকগুলি আবার প্রসাধন সাধনের ফল। অনেকের হয়তো চাপা রঙ। চাঁপা রঙেরও আছে অনেক।

দিনের বেলা ঝিমোয় উত্তরপাড়া। চলাচল থাকে না লোকজনের। বাড়িগুলি মনে হয় খালি খালি। যেন কেউ নেই। অথচ ছিমছাম ফিটফাট করে রেখেছে। অনাবশ্যক কুটোটি নেই, নেই ফালতু কাগজ পড়ে কোথাও। উনুনের ধোঁয়া ওঠে না আকাশে তা নয়, কিন্তু খুব কচিৎ আর কম পরিমাণে। মানুষ আর কই! যা এক-আধজন, তাদের রান্না পান্থপাদপই করে দেয়—

বিকেল থেকে জাগতে থাকে রাতের উত্তরপাড়া। সারেঙ্গী নিয়ে

আসে মুসলমান ওস্তাদেরা। ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ায়। এসে দাঁড়ায় রিকশা, আগমন হতে থাকে তবলচীদের।

তারপর শোনা যায় গলা সাধার সাধনা। গলা সাধা ব্যাপারটা অবশ্যই সকালের দিকেও শোনা যায়। গামা পাধা সাধা আর মাপা ধানির ধ্বনি আকাশে উঠে উঠে যায়। অনেক অপূর্ণ আশার মতো। উত্তরপাড়ার বদ্ধ আত্মার আকৃতির মতো।

রাত্রিবেলা অমনি সন্তর্পণে হর্ণের ঢাকঢোল না বাজিয়ে একখানা মোটর এসে·দাঁড়ায় এক একখানা বাড়ির সামনে। এক একখানা বাড়ির সামনে হয়তো দুখানা গাড়ি। একখানা মোটর একখানা ফিটন। বা দুখানাই মোটর। কোন কোনদিন একখানাও গাড়ি দাঁড়ায় না এমনও হয়।

এই অভিজাত ভাড়াটে-বৌবাজারে রাত্রিবেলা প্রাণের যে সাড়া জাগে, তাও খুব বেশী নয়।

পাড়ার এপাশে-ওপাশে খোলাব খাপরার চালওয়ালা বস্তি পাওয়া যায়। এখানে শোনা যায় মাতালের অসংবদ্ধ প্রলাপ। জড়ানো গলায় স্বরচিত গানের এক-আধ কলি। প্যাঁ পোঁ করে হারমনিয়ম বাজে এখানে। রাস্তায় ছড়াছড়ি পড়ে থাকে সবুজ কাচের পাঁট বোতল—পড়ে থাকে কাঁকড়ার খোলা আর মাংসের হাড়।

এই খোলার বস্তির কোথাও কোন কোণে থাকে নিখিলেশ দাস ঘর ভাড়া না দিয়ে।

উত্তরপাড়ার উপান্তে খোলার বস্তিতে সে কেন পড়ে আছে তা সে নিজেই জানে না। খোলার বস্তি-টস্তি তো এককালে তাদেরই ছিল, তারাই ভাড়া-টাড়া দিত। ভাড়াটে হয়ে থাকতে হবে তা তো কোনদিন ভাবে নি সে। খোলার বস্তি, পাকা বাড়ি তারাই ভাড়া দিত—সেদিন অবশ্য এখন আর নেই। সেই সুদিন তাদের পিতার আমল থেকেই চলে গেছে। বাকি ছিল প্রাসাদোপম ভদ্রাসন—তাও ছিল বাঁধা-বন্ধকের শত শত নাগপাশে বাঁধা। তাও চলে গেছে। সেটা তাদেরি আমলে।

ছেলেবেলায় সেই প্রাসাদ বাসের সময়ে প্রাচুর্যের অবশেষ কিছু ছিল

না বিশেষ। রেশটুকু ছিল তার। তাদের পুরুষেও ধারণা ছিল—ফিরে আসবে হয়তো চলে যাওয়া সব সম্পত্তি। দলিল দস্তাবেজের পায়ে হেঁটে। আব সেই ভরসাতেই বাবুগিরি করা, বাইরের চাল বজায় রাখা, দান খয়রাতের বড়োলোকি, সব শেখা হয়েছে—মন দিয়ে শেখা হয় নি শুধু লেখাপড়াটা। কারণ পরের চাকরী করে খেতে হবে এই সম্ভাবনা দেখা গেলেও শরীরের আরামপ্রিয়তা এমন কায়েম হয়ে বসেছিল যে, পরের দাসত্ব করার সম্ভাবনাটাকে বিশ্বাস করতে চায় নি মন।

নিখিলেশদের চলে গিয়েছিল সব, বিনয়দের আসছিল। স্কুলের সহপাঠী সেই বিনয় সন্ধান দিয়েছিল এই সান্ধ্য নগরীর। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল নিজেদের গাড়ি করে, কলকাতা থেকে এই পোনাহাট। গাড়ির তো পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন মিনিটের জানি। নিয়ে এসেছিল একদিন শনিবার সন্ধ্যাবেলা। রবিবার সারা দিনরাত ছিল এই ইন্দ্র কাননে। চলে গিয়েছিল সোমবার সকালে। প্রথম প্রথম এমনি শনিবার শনিবার ব্যবসার কাজে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে আসত বিনয়। নিজে ড্রাইভ করে। এই গোপন সম্পত্তি দেখতে বেরোনতে বাড়ির ড্রাইভার না আনাই ভালো। অসুবিধা আছে। তারপর সপ্তাহের মাঝে মধ্যেও। সম্পত্তির কাজে জোর পড়েছে। তখন নিখিলেশ পাকা ড্রাইভার। সাত বছর বয়স থেকে সিটের পিঠে বালিশ দিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসছে। সে পাশে থাকলে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে স্পীড তুলে সাহস পাওয়া যায়। দোসরে দোসর—পাশে বসলে গল্প করা যায়, ড্রাইভিংয়ে ক্লান্তি আসে না। মাঝপথে ব্রেকডাউন হলে? সার্ভিস স্টেশন ছিল না তখন বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। সাহায্য পাওয়া যাবে নিখিলেশের। সাহায্য সাহস দুই-ই। সাহচর্যও।

এক একদিন রাতারাতি ফিরে যাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফিরতি পথে নিখিলেশকে স্টিয়ারিং সঁপে দিয়ে নিরাপদ আরামে চোখ বোজা যায়। নিখিলেশের হাতে স্টিয়ারিং নিরাপদ। পাল তোলা নৌকা যেন ডাঙার। এমনি তরতর করে স্পীড ওঠে নিখিলেশের হাতে, গাড়ীর

গতিবেগে টের পাওয়া যায় না। মাইল মিটার ছুঁয়েছে পঞ্চাশের দাগ।

নিখিলেশ কর্মহীন বেকার। তার সময়ের অভাব নেই।

খুব ভালো লাগে। ভালো লাগে স্পীড তুলতে। বিপদের আশঙ্কা থাকে যেখানে, সেখানে নিরাপদে পার পাওয়া গেলে তবেই না আনন্দ! বাড়ির গাড়ি তো আর নেই। পরের গাড়ির বেতনভুক ড্রাইভার হওয়ার চেয়ে এ তবু বন্ধুর গাড়ি। কে জানে পরের বেতনভুক ড্রাইভারই শেষে হতে হয় কিনা—

এক দেড় বছর চলল এইভাবে। বিনয়ের মোসাহেবী আর শফেয়ারী করে। এই দেড় বছরে উত্তরপাড়ার অভিজাত অংশটার স্থায়ী-অস্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মোলকাত হয়েছে স্রোতের ফুলেদের সঙ্গে। বড়োলোকের ছেলে। মনে ভদ্র, দৃষ্টি ভঙ্গীতে উঁচু, ব্যবহারে অমায়িক নিখিলদাদার জনপ্রিয় হতে বিলম্ব হয় নি। নিখিলদা বলতে সব এক মুখ হাসি। টুকিটাকি উপকারে, দুটো গোপন প্রাণের কথা বলতে নিখিলদা। আসে, এসে সন্ধ্যাটা মাৎ করে রেখে দেয়। শুদ্ধ হাসিতে, বিশুদ্ধ ফচকেমিতে, নির্দ্দোষ হাল্কা ঠাট্টায় নিখিলেশ মন হরণ করেছে পাড়ার অনেকের।

সব চেয়ে বড়ো কথা, নিখিল কমিশান চায় না কোন কিসিমের। যতোটুকু পারে, করে দেয়—প্রতিদান চায় না।

আর চায় না বলেই সবাই কিছু কিছু দিতে চায়। যে যা পারে, ভালোবেসে দেয়।

ভালোবাসাও দিতে চায় কেউ কেউ। কিন্তু ভালোবাসার এটা হচ্ছে বাজার। পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায়, পয়সা পেলে বিক্রীও করে। এই রূপের হাটে বিনিমূল্যে ভালোবাসার অমূল্য দিতে চাইলেও অসুবিধা আছে। যিনি মেয়েটির ভালোবাসা মাসোহারায় কিনে রেখেছেন, তাঁর সেটা মোটেই পছন্দ হবে না। এতে বিপদও অনেক।

চন্দ্রাবলী বিনয়ের পয়সায় প্রাণ ধারণ করে। কিন্তু প্রাণ সঁপে

দিতে চায় নিখিলকে। চেহারায় খারাপ নয় বিনয়। নিখিলেশের তুলনায় হয়তো কিছু ম্লান। নিখিলেশ যদি একাদশীর চাঁদ, বিনয় নিদেন অষ্টমীর। তাও রুচি ভেদে। আলাপে আচরণে বিনয় স্মিতহাস—ব্যবহারে ভদ্র, আচারে অভিজাত। পয়সা তো আছেই।

তবু চোখের চাহনি যদি মনোদর্পণ হয় তা হলে চুলচেরা নজরে অবশ্য ধরা পড়বে। বিনয়ের মুখে চন্দ্রা তাকায় উচ্ছল চোখে। আর গোপন লগনে একান্তে নিখিলেশের মুখে তাকায় ছলছল চোখে।

বলে—বলি হ্যাঁগা বিশ্বপ্রেমিক, তোমার কি কাজ-কম্ম নেই নিজের? সারাজীবন বড়োলোকের ছেলের মোসাহেবী করে কাটবে? বড়লোকের হাত তোলায় চলবে চিরকাল? চাল নেই চুলো নেই—

হাসতে থাকে নিখিলেশ—য়্যাই ছ্যাকো! বলে কি 'কোথা চারু-চন্দ্রাবলী'! চাল নেই? মাথার ওপর এতোবড়ো ছাত?—বলে চন্দ্রাবলীর বসবার ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকায়। বলে চলে—চুলো নেই? নিদেন পক্ষে পঁচিশটা। পাড়ার এ মুড়ো থেকে যদি এক সাঁঝ করে পাত পাততে পাততে যাই, পঁচিশ দিনের আগে রিপীট দি মিক্‌শচার করতে হবে না।

চটে যায় চন্দ্রাবলী সত্যি সত্যি। খোঁচা মেরে মেরে জাগাতে চায় নিখিলেশের মধ্যেকার সিংহটাকে—সব সময় ইয়ারকি আর ছ্যাবলামো। একটুও সীরিয়স হবে না কোনদিন? তোমার ভবিষ্যৎটা কি, ভেবে দেখেছো কখনো?

নিখিলেশ হাসি থামায় নি—চন্দর রাগই করুক আর যা-ই করুক। বলে—আমি হবো চন্দরের বাগানের মালী। মালঞ্চের হবো মালাকর। চন্দ্রাবলী যে ফুল ভালোবাসবে সেই ফুলের গাছ পুঁতবো। ফুল তুলে মালা গেঁথে দেবো। সেই মালা চন্দর তার ভালবাসার লোককে পরাবে—

অল্প গানের সুর লাগায় এবার কথায়—ফুল বাগিচায় থাকবো তোমার, মেলবো ফুলের মেলা। আর—আর কি জানো! ঘুম ভেঙে রোজ তোমায় আমি দেখবো সকাল বেলা।

চন্দ্রাবলীর গালের টোলটি হাসির ছোঁয়াচে গভীর হয়ে উঠল—ওটার ফার্স্ট লাইন মোটেই ওরকম নয়—

বলে আর এগোল না। হাসতে লাগল চন্দ্রাবলী।

গানটা কোন আধুনিক গানের মাস্টার সন্ত শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে পাড়ায়।

নিখিলেশ বলল—প্রথম লাইনেও রাজি। আমায় চাকর রাখো গো। তোমার চাকর হতে পারাটা কি কম সৌভাগ্যের ?

চেঁচিয়ে ওঠে চন্দ্রা—না না না। তোমার এমনি বয়ে যাওয়া চলবে না, তা বলে দিলাম। চাকর ? চাকর হতে যাবে কেন তুমি ? কোন দুঃখে ?

নিখিলেশের কথার পরশ-পাথর চন্দ্রার মনের একটি কোণায় ছুঁয়ে গেছে। টের পায় নি চন্দ্রা। বিনয়কে তাকে এতো ভালোবাসতে হয় যে, কথাটার সত্যিকার মানে চন্দ্রা ভুলেই গেছে। চন্দ্রা একা নয়, চন্দ্রার দলের সবাই। এই নিয়ম।

এই কথাগুলো এমনি রঙে এমনি ঢঙে এ পাড়ার যে কোন মেয়েকেই বলতে পারত নিখিলেশ। বলেও। নিখিলেশকে এতো বেশী দেখে, এতো স্টাডি করেও কথাগুলো সম্পূর্ণ মূল্যে গ্রহণ করল চন্দ্রা। আর প্রচুর কষ্ট পেল।

চন্দ্রার মনে হয়েছিল—নিখিলদা বলে কি ? চন্দ্রাবলীর ভালোলাগা ফুল ফোটাবে। মালাকর হয়ে ভালোলাগা ফুলে মালা গেঁথে দেবে চন্দ্রাকে। চন্দ্রা যাতে তার ভালোবাসার লোককে পরাতে পারে। চন্দ্রার ভালোবাসার লোক ! হাসল চন্দ্রা মনে মনে। কে সে ? নিখিলেশই নয় তো !

এখানেই ক্ষান্ত হয় নি নিখিলেশ। আরো এগিয়েছে। ঐ ফার্স্ট লাইন পর্যন্ত—ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে তাকেই দেখতে চায় নিখিলেশ।

একি কম কথা ! এই ভাবে এই রূপে তো কেউ তাকে দেখতে চায় নি কোনদিন ! সব চেয়ে বড়ো কথা নিখিলেশের চোখ দুটোই সমস্ত পুরুষের দৃষ্টির চেয়ে আলাদা।

এইটাই বোধহয় গোড়ার কথা—নিখিলেশ খোলার বস্তিতে পড়ে আছে কেন!

মনে হয় ঘুমুচ্ছিলেন চিত্রগুপ্ত। খেয়াল হয়েছিল হঠাৎ। হিসাবের খাতায় তিনে কত্তি তিন নামাতে নামাতে ঝিমুনি এসেছিল। খেয়াল হল, বড়ো সাহেব যম এসে যখন কাঁধে ট্যাপ করলেন। বললেন—আজকের লিস্টে যে বিনয় রায় আছে! তার অসুক-টসুক কিছু করালেন না! আনি কি করে?

নিয়ে আসুন ধরে।—বলে বাঁ দিকের এনট্রিটা লাল কালি দিয়ে কেটে ডান দিকের 'কলমে' লিখলেন—বিনয় রায়।

কোন কিছু রোগ ধরা পড়ার আগেই হঠাৎ দু'ঘণ্টার নোটিসে চলে গেল বিনয়। কেউ বুঝল না, কেন হল—শুধু বুঝল বিনয় মারা গেছে।

চন্দ্রাবলীর বাড়িখানা রইল, মাসোহারার টাকা ক'টা গেল। গেলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে।

সে নিবিড় করে মনোযোগ দিল নিখিলেশে। নিখিলেশকে বলল—একা একা থাকব কি করে নিখিলদা! আমার এখানে এসে থাকো।

কলকাতা বাস নিখিলেশের তখন নেই, প্রায় উঠেই গেছে। একে তো নিজেদের বাড়ী হাতছাড়া হয়ে গিয়ে পর্যন্ত ভাড়াবাড়িতে বাস। সেখানে জায়গার অকুলান। অর্থকষ্টের দৈত্যটাও আস্তে আস্তে আহার্যে এসে হাত বাড়িয়েছে। বাবা নেই। মা নেই অনেকদিনই। জ্যেঠামশায় ছিলেন বাড়ী আর সম্পত্তির মালিক। কি দিয়ে কি হল, তার অংশ সুদ্ধু বিক্রী করে দিলেন। সর্বনাশ সমুৎপন্ন হয়েছিল নিশ্চয়, তাই অর্ধেক ত্যাগ করে দিলেন।

জ্যেঠিমা বলেছিলেন নিখিলেশের হয়ে। বন্ধক রেখে টাকা নিলে তার অর্ধেকটা তো নিখিলেশেরই পাওনা। জ্যেঠামশায় বলেছিলেন—সে তো আর এক সর্বনাশ বন্ধ করতে টাকা নিলাম। ভরাট করতে আর এক অভাবের গহ্বর। তা ছাড়া অসৎ সংসর্গে পড়েছে আজকাল, ওর হাতে টাকা! সব ওড়াবে। শনিবার শনিবার কোথায় যায় জিজ্ঞেস করো তো ওকে!

এমনি করে এদিককার আকর্ষণ আর ওদিককার প্রবল বিকর্ষণের ফলে সত্যি সত্যি পোনাহাট চলে এলো নিখিলেশ। এবং চন্দ্রাবলীর বাড়ীতে এসে থাকতে লাগল।

মাসোহারার টাকা বাঁচিয়ে পল্লী অঞ্চলে ছোট একখানা বাড়ী কেনা অসাধ্য ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ এখানকার সব বাড়ীর মালিকই প্রায় স্ত্রীলোক। বাড়ীগুলি প্রায়ই ঐ উপায়ে পাওয়া।

বেশ বড়ো গঞ্জ এই পোনাহাট। একদিকে ঘূর্ণী নদী, জলজ পণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। দো মাল্লাই, চার মাল্লাই নৌকো। বালি শুরকীর ব্যাপারী থেকে কাঠ লোহার কারবারী। ইট টালির নৌকো থেকে জেলে ডিঙি পর্যন্ত। সব রকম নৌবহর বাহার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পোনাহাটের গঞ্জের ঘাটে। পাহারা দেয় পোনাহাটের সমৃদ্ধি। আমদানী রপ্তানীর লক্ষ্মী এই বৃহৎ বিস্তীর্ণ জলপথের নদী-ঘাটে পা রেখে পোনাহাটে আনাগোনা করে।

আর এক দিকে রেললাইন। স্থলপথের কাঁচামাল নেওয়া, পাকা মাল আনার কাজ করছে মুখে উল্লাসের সিটি বাজিয়ে বাজিয়ে। মন্থর গতিতে মালের গৌরবে ভারী মালগাড়ী এসে দাঁড়ায় সাইডিংয়ে। সহস্র পায়ে। মাল খালাস করে কুলীরা সারাদিন। সাইডিংয়ের প্লাটফরমে ধুলো ওড়ে, পকেট ভারী হয় মালবাবুর।

জল স্থলের সঙ্গম এই পোনাহাটের বাতাসে টাকা ওড়ে। ব্যাপারী ব্যবসায়ীদের রাত্রিবাসের প্রয়োজন হয় যখন তখন। যে কারণে বড়ো বড়ো ব্যবসা কেন্দ্রে পণ্যাঙ্গনাদের পল্লী গড়ে ওঠে—সেই একই কারণে নানা স্তরের মেয়েমানুষের আমদানী এই পোনাহাটে। পণ্যের সঙ্গে পণ্যার আক্ষরিক মিলও যথেষ্ট।

উত্তরপাড়া বাদে আরো একটা মেয়ে পল্লী আছে। এটা যেমন রেল স্টেশন সংলগ্ন, সেটা নৌকো ঘাটার। তার বাসিন্দাদের আভিজাত্য নেই, তারা শুধুই মেয়ে।

এইভাবে কাটল কিছুদিন। কিন্তু ঘড়ার জল গড়িয়ে বেশীদিন খাওয়া চলে না। অস্বস্তি লাগছে নিখিলেশের। নিজের উপার্জন চোখে দেখে নি

আজো। আযৌবন চলেছে পরস্মৈপদী। তার জন্যে বিবেক তাকে ধমকালেও সে খুব বেশী জবাবদিহি করে নি। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীলোকের উপার্জন! দিনের পর দিন বিবেক তাকে খুব চাবুক মারতে লাগল।

নিজের কাছে লজ্জা পেলেও কাজে কর্মে অনভ্যস্ত এই একদা বড়োলোক ছেলেটি অনন্যোপায়। আহার্যের তালিকা হ্রস্ব হতে লাগল, তালি মারা চলল তারপর। ও বেলার খাবার খানিকটা রেখে এ বেলার গায়ে তাপ্পি মারা। কিন্তু বাড়ীখানা কিনে নগদ বিশেষ কিছু ছিল না চন্দ্রার। আয় বাড়ানোর উপায় খুঁজতে মনে মনে তাকেও ব্যতিব্যস্ত হতে হচ্ছিল।

এমন দিনে দেখা কালীচরণ সাধুখাঁর সঙ্গে। পাটের দালালী করে পয়সা হয়েছে সম্প্রতি। হাল আমলের বড়োলোক বলে পয়সা চেনে খুব। ওআন পাইস ফাদার মাদার। কোন মাইফেলে পরিচয় বিনয় রায়ের সঙ্গে গিয়ে।

যাই হোক কি করে যেন কালীচরণ খুঁজে বের করেছে নিখিলেশকে। সন্ধ্যা তখন হবো হবো—

কালীচরণ জিজ্ঞেস করে—বিনয় তো মারা গেছে। তুমি কি করছ এখন?

কথাটার নিগূঢ়ার্থ বুঝতে বিলম্ব হল না। অর্থাৎ, তোমার নিজের তো এক পয়সা উপার্জনের মুরোদ কোনদিনই ছিল না। হলো কিনা তাই জানতে চাইছি।

সন্ধ্যার আধো আলোয় কালীচরণের ডান হাতে আংটির নকল হীরে চমক লাগাল। হীরের আসল নকল নিখিলেশ ভালো করেই চেনে।

হলেও টপ করে কেমন একটা কমপ্লেক্স এসে গেল তার। টাকার কুমীর এই লোকটাকে চট করে চটাতে চাইল না নিখিলেশ।

হেসে বলল—আর কারো চওড়া চ্যাটালো কাঁধ খুঁজছি। ভর করবো বলে। তা এই দিকে কোথায় এসেছিলেন?

কালীচরণ হাসল। সামনের দাঁত দুটোতে সোনার জলের বিন্দু

ঝকঝক করে উঠল। বলল—কোথায় যাওয়া যায় তাই তো খুঁজছি। আজ রাতটা থাকতে হবে কিনা! একটা হোটেল-টোটেল—।—জানা আছে নাকি তোমার?

নিখিলেশ একটা লম্বা টান দিয়ে বলল—হ্যাঁ—। যাবেন নাকি?

কালীচরণ বলল—চলো তো দেখে আসি।

নিখিলেশ এনে তুলল চন্দ্রাবলীর বাড়ী—দেখুন, পছন্দ হয় কিনা হোটেল!

কালীচরণ উদ্গত ভালোলাগার ভাবটা গলাধঃকরণ করে বলল—মন্দ নয়। কাজ চলা গোছের।

হাসল কালীচরণ অল্প। হেসে জিজ্ঞেস করল—তা, হোটেল মালিকের নাম কি?

খুশী হয় নি চন্দ্রাবলী। আর এ পথে নয়। অন্য পথে পেট চালানো যায় কি না—সেই চিন্তাই পেয়ে বসেছিল তাকে। দিনরাত গানের চর্চা করছে সে আজকাল। ওস্তাদী গান। লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজীদের মতন হওয়া যায় না, শরীর না বেচে গলা বেচা! মুজরো গেয়ে জীবন ধারণ! বাঈজী কথাটা কি খারাপ অর্থে ব্যবহার হয় এ দেশে! আসলে কথাটা মাঈজীর অপভ্রষ্ট, নইলে মীরাকে কি কেউ মীরাবাঈ বলত!

কিন্তু গলা সেধে গলার উন্নতি করে মুজরো! ততোদিন ঘড়ায় জল থাকবে না—এও নিশ্চিত।

অথচ পাড়ার সবাই চন্দ্রাবলীর নির্বুদ্ধিতার নিন্দে করছে উঠতে বসতে। নিখিলেশ লোক ভালো সে সন্দেহ কেউ করবে না। কিন্তু তাই বলে ভবিষ্যতও তো একটা আছে। পেট চলবে কিসে? ভালোবাসা তাদের লাইনে আত্মহত্যার সামিল। ভালোবাসলে কি গেলে! ভালোবাসার ব্যসন তাদের জন্যে নয়। নিখিলেশ যদি প্রচুর উপার্জন করতো—সে ছিল আলাদা কথা। এ শুকনো ভালোবাসার অর্থ পেট শুকিয়ে মরা। এটা চন্দ্রাবলী কি করছে? মেয়েটা এইভাবে মরে যাবে নাকি! কতোই বা বয়েস ওর!

এই সমস্ত কথা একই সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছিল চন্দ্রাবলীর। হোটেল মালিকের নাম বলতে দেরা হয়ে যাচ্ছিল তাই।

উত্তরটা জুগিয়ে দিল নিখিলেশ—হোটেল মালিকের নাম চম্পাবতী। গান টানের শখ ছিল তো আপনার। এ-ও ভালো গাইয়ে। বসুন সঙ্গত ডাকি।

বাইরে বেরিয়ে এলো কালীচরণ, নিখিলেশের পিছু। বললে—কথা আছে গোপনে। চলো।

নিখিলেশ বললে—তা কি হয়? আপনি বসুন। বিশ্রাম করুন। তা গোপন কথা থাকে এইখেনে সেরে নিন না।—বলে দাঁড়িয়ে পড়ল নিখিলেশ।

চন্দ্রাবলীর বাড়ীর তলার রাস্তায় তখন ওরা।

কালীচরণ বলল—আমার নামটা এখানে পাল্টে ফেলতে চাই।

নিখিলেশ বলল—এখানে পারলে লোকে মুখে মুখোশ পরে আসে, তা নামের মুখোশ। আর সত্যি বলতে আপনার নামটা মনেই নেই আমার। ভালোই হয়েছে। নইলে হয়তো মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলতুম। তা আপনার নাম?

কালীচরণ চিন্তা না করেই বলে ফেলল—মিস্টার বসন্ত চৌধুরী!

নিখিলেশ মুণ্ডুপাত করলে মনে মনে—খাজা কোথাকার! নিজের নাম মিস্টার জুড়ে কেউ বলে নাকি। টাকার গরম দেখাচ্ছে শালা, টাকার কুমীর।

নিখিলেশ আনন্দের আতিশয্যে ডান উরুতে চাপড় মারলে দুটো। কুস্তিগীরের ভঙ্গীতে। দি আইডিয়া। লাভলি। একদম ফাস ক্লাস। বসন্তে চাঁপা ফুলে মিলেছে। মারভেলাস।—তা চাঁপা ফুল দেখলেন কি রকম?—চলুন চলুন, গুঁজে দিই বাটন হোলে। আরে দাদা, রসিক লোক আপনি বলতে হয়।

বলে নিখিলেশ কালীচরণের বাহু ধরে মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করলে—রাইট য়্যাবাউট টার্ণ।

কালীচরণ মোড় ফিরলে না। বলল—আর একটা কথা। দক্ষিণে? আমি কিন্তু সামান্য লোক। গরীব। নিখিলেশ বলল—আরে রাম রাম। দক্ষিণে আবার কি। দক্ষিণে—দক্ষিণা বাতাস। বা রে, চাঁপা ফুল রইল বসন্ত রইল! দক্ষিণে বাতাস থাকবে না!—চলুন, চলুন—

বলে সত্যি সত্যি গায়ের জোরে ঠেলে নিয়ে চলল কালীচরণকে। কয়েক পা মাত্র।

উদাস হয়ে বসেছিল চন্দ্রাবলী। খোঁপা বাঁধা নেই। চুলটা আঁচড়ে হাত-খোঁপা গড়া। কুঙ্কুমের একটি টিপ ছাড়া প্রসাধনের কোন চিহ্নই নেই। আলতো করে পাউডার পরা আছে হয়তো। চন্দ্রাবলীর মুখ যে সুন্দর তা নয়, তবে খারাপও নয়। হ্যাঁ, রংটি! রংটি বেশ। বয়েস? মেয়েদের বয়েস হয় না। ওটা জানতে চাইতে নেই। পনেরোর মাথায় এসে রেকারিং বা পৌনঃপুনিক চিহ্ন পড়ে। পনেরো থেকে ঊনচল্লিশ অবধি প্রতি পাঁচ বছরে এক বছর করে যোগ হয়। চল্লিশে পৌঁছুলে এই হিসেবে কুড়ি তিরিশ হয়ে যায় হঠাৎ। তার বেশী নয়।

চন্দ্রাকে কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল একটা নিখিলেশ। বলল—আরে চম্পা, কে এসেছে দ্যাখো। তোমাকে যে ফোটায়। বসন্ত। বসন্তকাল।—বসন্তবাবু, থুড়ি—মিস্টার চৌধুরী, বসুন।—নাও বাপু, তোমরা কথাবার্তা কও। আমি সঙ্গতের ব্যবস্থা দেখিগে—

বোধ হয় একটু ভয় ভয় করছিল কালীচরণের। অথচ চম্পাবতীর সঙ্গ ছেড়ে যেতে মনও চাইছে না। কালীচরণ বলল—তুমি—তুমি থাকো কোথায়? তোমার নামটা যেন কী—

—আমার নাম নিখিলেশ দাস। আমি? আমি থাকি খোলার বস্তিতে। ঐ যেখানটায় আপনার সাথে আমার দেখা, ওরি কাছাকাছি।

চন্দ্রাবলীর দিকে ঘুরে বলল নিখিলেশ—শোনো চাঁপা, মিস্টার চৌধুরী বলেন কি? দক্ষিণে জানতে চান। ছি! তুমি কি সেই বংশের মেয়ে, সেই রকম খারাপ মেয়ে নাকি তুমি! মিস্টার চৌধুরী মনে করেন কি তোমাকে? —আচ্ছা, মিস্টার চৌধুরী, বসুন আপনি। তবলচী ডেকে আনি।

বড়ো বড়ো রুই কাৎলার মনে ধরলে এই সব মেয়েরা মাসিক ব্যবস্থায় থাকে।

সেই রাত্রে চন্দ্রাবলীর বাড়ী থেকে নিখিলেশ তার বিছানাটুকু সরিয়ে ফেলল। বিছানা নয়, বিছানার পরিহাস! মোটা দম বন্ধ করা ছোট্ট একটু মশারি। মশা আটকায়, দমও আটকায় তাতে।

চলে এলো মণিমালার পাশের খালি ঘরে। খোলার চালের তলায়।

মাঝখানে চৌকোণা উঠোন। তার চার পাশে হাত ধরাধরি চার ভিটে। খোলার চালের মাথায় কোথাও য়্যাজবেস্টসের টুকরো, অতিরিক্ত চালা তৈরী করে রেখেছে। কোথাও টিনের। অনেক জায়গায়—বিশেষ করে মটকার ওপর—দড়িদড়া দিয়ে গরুর জাবনার গামলা উবুড় করে বাঁধা। সেখানে য়্যাজবেস্টস বা টিন বাঁধা যায় না হয়তো। চটের পরদা হেথায় হোথায় ঝুলছে। কোথাও এই চট আবরু রক্ষার পরিহাস, কোথাও বৃষ্টির ছাঁট আটকাবার চেষ্টা। কোথাও বা পশ্চিমে রোদ।

নিখিলেশের মনে হল ওদের নরেশ মুকুয্যে রোডের বস্তির কথা। এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল সেটা। দস্তুর মতো এক ইটের দেয়াল, হলোই বা ঘেঁসের গাঁথনি। পাকা মেঝে। চালের বাতা কাঠের। তাতে করে খোলাগুলি সমানভাবে বসানো যায়! ঘুণ ধরে, আর বাঁশের হলে বাঁশ তাদের জন্মগত বাঁকাচোরা ছাড়তে পারে না। মাথার খোলা-গুলোও উঁচু নিচু হয়ে জল ঢোকার রাস্তা খুলে দেয়।

পান্থপাদপে নিখিলেশ সেই প্রথম গিয়েছিল। পান্থপাদপ নতুন খুলেছে তখন। খুলেছে ভাত ডাল মাংসর ব্যবস্থা নিয়ে।

গিয়েছিল চন্দ্রা আর কালীচরণের জন্য মাংস আর ভাত আনতে। ঐ সঙ্গে একমুঠো ভাত বেশী এনে নুণ দিয়ে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থায়।

বিনয়কে চন্দ্রাবলীর যদি লাগত খারাপ, বসন্ত চৌধুরীকে লাগে অসহ্য। লোকটা শুধুই পুরুষ। কোনো গুণ নেই, শুধুই কপালে আগুন।

কিন্তু ক্ষুধার আগুনটাও আরো অসহ্য হয়ে উঠবে শীগগীরই, সবাই মিলে কানে মন্ত্র দিয়ে সে জ্ঞানটাও জাগিয়ে দিয়েছে চন্দ্রাবলীর।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল চন্দ্রা—আমার নামটা অমন বদলে দিলে কেন? বিনয় আমাকে—

অবজ্ঞার হাসি দিয়ে নিখিলেশ থামিয়ে দিল চন্দ্রাকে—হায়রে—চন্দ্রাবলী গেছে বিনয়ের সঙ্গে এক চিতেয়। নতুন করে জন্মেছে চম্পাবতী। বসন্ত চৌধুরীর জন্য। এই দুটো মেয়ের চেহারায় মিল আছে কিনা! নাম দুটোও তাই শুনতে একরকম।—যেমন, বসন্ত চৌধুরী হচ্ছে সেই লোকটা, যে পাটের দরদস্তুর ভুলে অন্য লোক হয়ে আসে। এখানে আসে প্রেমিকের পাট করতে। পাটের বাজারে নিশ্চয় তার পেটো নাম আছে একটা!—আমরা আসলে জায়গা বুঝে পাট করি। এক এক জায়গায় এক এক নাম। এক জায়গায় নাম বাবা, এক জায়গায় ছেলে। এক জায়গায় চাকর, এক জায়গায় মনিব। এক জায়গায় স্বামী, এক জায়গায়—বলে থেমে যায়।

চন্দ্রা জিজ্ঞেস করে—আমাকে ফেলে চলে গেলে কেন? আমি যে তোমাকে—

শেষ করতে দেয় না নিখিলেশ। বলে—বুদ্ধি তোমার কবে হবে আর, বলতে পারো? চম্পা যে নতুন মেয়ে। তার সঙ্গে মুখ চেনা হয়তো আছে, খাতির তো নেই। তা ছাড়া, আমাদের চেনা জানা আছে—এ কথা জানতে পেলে বসন্ত খুশীতে নেচে উঠতো না নিশ্চয়। বসন্ত জানে তুমি টাটকা ফোটা চাঁপা। চাঁপা কলি। খুশী হয়ে আছে তার মন। তাই থাক। অকারণ খুশী থেকে বঞ্চিত করি কেন তাকে!··· খবরদার, ভুলেও বোলো না, আমি এখানে থাকতাম!

চন্দ্রা বলেছিল—আমি যে তোমাকে—

সেই আগেকার কথার পুনরাবৃত্তি। সেই আগের বারের মতনই থামিয়ে দিয়েছিল নিখিলেশ—থাক-থাক।

থাক-থাক-টা যে কি, না বলা রয়ে গেল সেটা চিরকালের মতো।

আমি যে তোমাকে—তারপর কি ? ভালোবাসি, না, বিশ্বাস করি, না, ভরসা করে আছি ? কি বলতে চেয়েছিল চন্দ্রা ?

খোলার বস্তিতে পড়ে রইল নিখিলেশ। প্রাসাদ থেকে একতলা। একতলা থেকে খোলার চালা। বেশীদিন নয় যদিও।

চন্দ্রার সাথে দেখাশোনা কথাবার্তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তার। বসন্ত চৌধুরী নিজে থাকে রাজার হালে। পান আছে ভোজন আছে তার। বন্ধুদের নিয়ে হৈ-হল্লা করে নয়, একলা। চন্দ্রাকেও সে বন্ধ করে রেখেছে পর্দা ঘিরে। মেয়ে বন্ধুদের আসাই সে পছন্দ করে না, তা নিখিলেশ। চাইলেও চন্দ্রা সাহায্য করতে পারে না নিখিলদাকে।

এই সময়টায় দু মুঠো মোটা ভাতের জন্যেও তাকে বেগ পেতে হচ্ছিল। হাত পাতা অভ্যেস নেই। মুঠোয় গুঁজে দিলেও লজ্জাবতী লতার মতো মুঠো বন্ধ হয়ে আসে। ঢুকতে চায় না কিছু। তবু বেনামে, ছলে ছুতোয় মেয়েরা পাঠিয়ে দেয় কিছু। কিছু খোরাক, পোষাকও কিছু। খোরাকের পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ নেই। পোষাকের তো আছে। এই পোষাকের ব্যাপারে বড়ো অসুবিধে হচ্ছিল তার।

হাসা যার স্বভাব সে খেতে পেলেও হাসে, না পেলেও হাসে। কান্না নিয়ে জন্মেছে যে, তার কান্না ভগবানও ঘোচাতে পারেন না।

হাসির শাদা মলাটে মোড়া থাকে তার অনটন অনশনের দিনপঞ্জীর পাতা। পৃষ্ঠাগুলি হলদেটে হয়ে কুঁকড়ে আসছিল। মেয়েরা বুঝত সবই—করবার ক্ষমতা ছিল না বিশেষ। চেষ্টা ছাড়া।

এমনি দিনে ডাক এলো কুন্তলার কাছ থেকে। উঞ্ছবৃত্তি না করে চলে এসো এখানে। থাকবে এখানে, খাবে এখানে। কাজ-কম্ম করবে কিছু কিছু না-করার দরুণ নিচু না হয় মাথা! কিছু করে উঁচু। রাখো সেটা!

ব্যাপারটা কুন্তলীন কাটলেট আবিষ্কারের দু চারদিনের মধ্যেই।

অভাবের ভাবনা আজকাল ভাবতে হচ্ছিল। কুন্তলার এই ডাকটাকে

বেশী দিন বেশী ঘণ্টার ভাবনা দিতে পারল না নিখিলেশ। মনে মনে রাজী হতে হোলো।

মুখে বলল—ওখানে থাকা যা, এখানে থাকাও তাই। কাজ তো ওখানে থেকেও করে দিতে পারি! পারি না?—কিন্তু—জানেন তো,—অকম্মার ঢেঁকি আমি। কোন কাজ জানা নেই।

হাসিতে গালে টোল ফেলে কুন্তলা বলে—যেমন কথা! ঢেঁকি বুঝি অকম্মা থাকে কখনও! স্বগগে গেলেও ধান ভানে।

নিখিলেশ বলে, বলে হাসতে হাসতেই—আমার কথা আলাদা। স্বগগে গেলেই বুঝি ধান ভানতে পারব! তার আগে নয়। এ যাত্রা আর কিছু হল না।

কুন্তলা বলে নকল অভিযোগে—কেমন ব্যাটাছেলে রে বাবা!—মেয়ে হয়ে রাজ্যি ছেড়ে এলাম। এসে করে খাচ্ছি। দুয়ো তোমাকে—মেয়েছেলেরও বাড়া।

নিখিলেশ গম্ভীর হয়ে যায়—না-না সত্যি বলছি। কোন কাজই জানি না।

কুন্তলা বলে—পেট থেকে কেউ জানা নিয়ে পড়ে না। পড়ে জানে! কিছু জানো না তুমি বলতে চাও?—একেবারে কিচ্ছু না?—মোটর ড্রাইভারি?

হেসে ফেলে নিখিলেশ—হ্যাঁ—ঐ কোচোয়ানিটা জানি বটে!

কুন্তলা বলে—কোচোয়ানি বলছ কেন?

নিখিলেশ বলে—নিজের গাড়ী তো নেই। পরের গাড়ী চালানোকে লোকে কোচোয়ান ছাড়া কি বলবে আর?—তা বেশ, গাড়ী কিনুন, হাওয়াগাড়ী। হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব রোজ দুবেলা।

হাসতে হাসতে বলে কুন্তলা—কাজ নেই আমার হাওয়া খেয়ে। পেট ফেটে মরি শেষ কালে! হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকে কারা, জানো না? বায়ুভুক। তাদের দলে ফেলতে চাও আমাকে?

পরের দিন আবার ধরেছে কুন্তলা—উপেনকে বলেছি, তোমার ও ছেঁড়া কাঁথা কানি টান মেরে ফেলে দিতে। মানুষ ঐ বিছানায় শুতে পারে! ছি!

হাসতে থাকে নিখিলেশ—তা বেশ—তা বেশ। ও সব যতো না থাকে ততোই ভালো! থাকা মানেই মায়া। বলতে পারেন, আমার পিছনে লেগেছেন কেন?

কুন্তলা বলে—ব্যবসা করে খাই—মতলব আছে নিশ্চয়। অমনি কি আর ডাকছি? চার পয়সার কাজ করিয়ে এক পয়সা দেওয়া আমার অভ্যাস। কাজেই—সাধু সাবধান।

নিখিলেশ বলে—সত্যিই বুঝতে পারছি না ছাই ফেলা ছাড়া, কি কাজে লাগব আমি!

কপট চিন্তায় ভ্রূ দুটো এক করে কুন্তলা। কপালে রেখার ঢেউ-তোলে। বলে—দ্যাখো, আমার সব না হলেও অনেক কিছু আছে। নেই একটা মোসাহেব। সেই কাজটা তোমায় দিতে চাই।

নিখিলেশ বলে—সাহেবের মেয়ে কথা মেম। মোসাহেব না থাকে তো মো-মেম তো আছে। ঐ যে মেয়েটি—

কুন্তলা বলে—কে! আমাদের প্রিয়! প্রিয়ংবদা! তুমি ওকে চেনো নাকি?

নিখিলেশ বলল ঃ চিনি না ছাই। আপনার এখানে দেখেছি—তাই বলছিলাম।

বস্তি বাড়ি থেকে নিখিলেশকে তুলে আনার ইচ্ছাটা এই মুহূর্তে সঙ্কল্পে রূপ নিল কুন্তলার। উপেন গিয়ে সত্যি সত্যি নিখিলেশের বিছানাপত্র নিয়ে এল।

আমার আপনার তো আছেই, বিশেষ করে আছে মেয়েদের। ছোট সাজার শখ। বয়স যা, তা থেকে কমিয়ে বলা, তার কম ব্যবহার করা। মেয়েদের মধ্যে এটা এতো সংক্রামক যে রোগ না বলে বলা যায় ধর্ম। মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়তো প্রয়োজনও।

পরদিন সকালের দিকেই বলল কুন্তলা—কাজটা কি, মনে আছে তো?

নিখিলেশ বলল—আজ্ঞে, তা আছে! সাদা বাঙলায় মোসাহেবী। তবে কি জানেন, সাহেবদের মোসাহেবী করে অভ্যেস। মেয়েদের মোসাহেবীতে—সময় দিন একটু!

—আচ্ছা আমিই তালিম দিয়ে নিই! এক নম্বর, 'আপনি' 'আজ্ঞে' করলে মোসাহেবীটা খোলাখুলি হয়ে পড়ে। ওটা ধরা যায় সহজেই। ওটাকে জড়াতে হবে 'তুমি' বুলির নামাবলী! তা ছাড়া তোমার চেয়ে আমি হয়তো—

খেই ধরে নেয় নিখিলেশ। ভাবে, বাকিটুকু মুখ ফুটে বলতে পারবে না আর কুন্তলা। বাধবে। বলে—বয়সে ছোটই হবে তুমি। কিন্তু সম্পর্কটা যে মনিব চাকরের। সাহস পাই নি তাই। তা তুমি যখন পারমিশান দিলে! না হয় বাদই দেবো ওই 'আপনি' 'আজ্ঞে'।

চাঁদনীর বাজারের দরাদরি। ছেলেটার চোখ মেয়েটার বয়েস ভাবছে আটত্রিশ। চাঁদনীর ক্রেতার মতো মেয়েটা অক্লেশে বলে বসল আঠারো। চক্ষুলজ্জা নেই। তারপর দরাদরিটা নিঃশব্দ। ছেলেটার অবিশ্বাস মেয়েটার শরীরে অন্য গঠনের দিকে তাকায়। মনকে বলে—আঠারো? হতেই পারে না। আটত্রিশ না হলেও বত্রিশ তো বটেই! মেয়েটার বেহায়াপনা ছেলেটার চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে বলছে—এতোই যদি অবিশ্বাস, জিজ্ঞেস করা কেন? বেশ—আঠারো নয় তো নয়। যা ভাবো তাই—

এই জিনিসটা উত্তরপাড়া দক্ষিণপাড়ায় ভেদ নেই! উত্তরপাড়া দেখেই শিখেছে এটা নিখিলেশ।

মোসাহেবীর শিক্ষানবীশীতে নিখিলেশের চেয়ে নিজেই বেশী খুশী হল কুন্তলা।—না, এ ছেলে পারবে।

ছাই সরে যেতেই নিখিলেশের আসল বহ্নিরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল দু-তিনদিনের মধ্যেই। কুন্তলারও প্রাণতট ছিল শূন্য। সঙ্গী ভরতি নৌকা নিখিলেশকে ফেলে চলে গেল কুন্তলার প্রাণ সাগরের শূন্য তটে। একজন পেল প্রাণ, একজন কূল।

সাগর-সঙ্গমে জোয়ার আসছিল তখন। একজনের মনের বহতা নদী আর এক জনের মনের সাগরে এসে মিশছিল।

তটের তলায় কখন জোয়ার লেগেছিল, নিজেই জানে নি কুন্তলা। এ জিনিস জানা যায় না। সে কি নিখিলেশের লাবণ্যে! আলোক তো আরো সুন্দর। আলোক তাকে টানতে পারে নি কেন? আলোক যদি সুন্দর, নিখিলেশ তবে সুষমা। আলোক মিছরি, নিখিলেশ তালশাঁস।

সত্যি, কাজ চাই একটা। বুড়ো বাবাকে দিয়ে চলছিল না আর। বাবা তো সত্যি অভিভাবক নন, অভিভাবকের 'শো'। রাত্রে কাশি আর দিনে ক্যাশ—ক্যাশ মানে হিসেবে গরমিল—এই তো তার অভিভাবনা। প্রথম দিকে তাকে দরকার হয়েছিল দুই হিসেবে। অভিভাবক এবং পুরুষ মানুষ। বয়স্ক পুরুষ পাহারা দেয় অল্পবয়সী মেয়েদের যৌবন।

আজ আর প্রয়োজন নেই। কুন্তলা স্বপ্রতিষ্ঠ। তাকে পাহারা দেবার দরকার নেই। সে-ই পাহারা দিতে পারে অন্যকে। প্রিয়কে যেমন দিচ্ছে।

নরেশ বাবুকে হাত-বাক্সর চার্জ থেকে রেহাই দিল কুন্তলা। সেখানে বসল নিখিলেশ। হাত-বাক্স নেই আর মান্ধাতার আমলের। হাল আমলের ক্যাশ-কাউন্টার একেবারে।

কর্ম জুটল নিখিলেশের, কর্মব্যস্ততা জুটল না। আয়েসী কাজ। বসে বসে কুঁড়ে হয়ে ভুঁড়ি বাড়ানো। টাকার টুং টুং গোনা আর কাপে চামচের ঠুনঠুন্ শোনা।

কুন্তলা বলে—ওগো কেশিয়ারবাবু, যাও না একটু ঘুরে টুরে এসো। বসে বসে যে বাত ধরিয়ে ফেললে। সত্যিকারের বাত ধরলে তেল মালিশ করে দেবে কে?

নিখিলেশ বলে—পেটে ভাত—বাতে তেলমালিশ—দুটোই আশা করি কি করে? এদিকে তো কম্মের দুখীরাম। মুরোদ নেই এক পয়সার।

ময়ূরের পেখম মেয়েদের চুল। মেলে দিলে মুগ্ধ হবে না, এমন চোখ নেই।

কাল সাধ করে খোঁপা তৈরী ক'রে দিয়েছিল প্রিয়। বলেছিল—ধূলো মেখে কাদামাটি ঘেঁটে মানুষ হয় গরীব দুঃখীর ছেলে। কিন্তু কি বলিষ্ঠ। যত্নে আর, আয়াসে বড়ো হয় বড়োলোকের ছেলে। আয়ার কোলে। নিটপিটে স্বাস্থ্য। সর্বদা হারাই হারাই ভয়, এই গেল এই গেল ভাব।

চোখ বুজে বসে ছিল কুন্তলা। বিলি কেটে চিরুনি চালিয়ে জট ছাড়াচ্ছিল প্রিয়। চুলের জট ছাড়াচ্ছিল, কিন্তু আপাতঃ নিশ্চিন্ত অবস্থায় মনের মধ্যে জট পাকিয়ে উঠছিল তার। কুন্তলা কেন, আমিও ভাবি। বিজ্ঞানীরা এতো করেছেন! টরিসেলির যুগ থেকে আরম্ভ করে কতো রকম ভ্যাকুআম তৈরী করতে পেরেছেন। ভ্যাকুআম মানে বায়ুশূন্যতা। মনের জন্যে একটা চিন্তাশূন্যতা সৃষ্টি করতে আজও পারেন নি কেউ। জেগে থাকব, সজ্ঞানে থাকব, নেশাভাঙের প্রভাবে নয়—অথচ ইচ্ছামতো চিন্তাশূন্য করে ফেলব মনটাকে। মনের এই তূরীয় ভাব সৃষ্টি করা সম্ভব নয় কেন? চিন্তা মানেই চিন্তার পিছু পিছু দুশ্চিন্তা যে!

কুন্তলাও কি-সব ভাবে যেন আজকাল। প্রিয় ঠিক জানে না—এই চিন্তার সঙ্গে নিখিলেশের আসার কোন যোগাযোগ আছে কিনা! প্রিয় ভাবে, দিদির অর্থ হয়েছে, প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ভাবনা কোথায় কমবে—এ যে বাড়ছে দিন দিন।

ভাব-সাগর থেকে উঠে এলো কুন্তলা—কি বললি প্রিয়ে চারুশীলে মুগ্ধময়ী।

প্রিয় বলল—তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। অতো কি ভাবো আজকাল বলো তো!

কুন্তলা বলল, ফাৎ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলার আগে নয়—আজকাল বড্ডো ভাবি আর ভাবি রে। ভাবনা জিনিষটা কমলির মতো! আমি ছাড়তে চাইলে কি হবে, ও তো নেহি ছোড়তা! নিখিলেশ আসার পর থেকেই বেড়ে গেছে এটা।—যাক, কি বলছিলি যেন! বড়োলোক, আয়ার ছেলে—কি সব! কে রে আয়ার ছেলে?

প্রিয় কপালে হাত রেখে বলে—মরণ দশা আমার! তাই বলেছি নাকি। বললুম—বড়োলোকের ছেলে আয়াসে মানুষ হয়েও গরীবের ছেলের মতো অমন স্বাস্থ্য পায় না। মনে মনে ভাবে প্রিয়—দিদি স্বীকার করেই ফেলল, নিখিলেশ আসার পর থেকে বেড়ে গেছে চিন্তা।

কুন্তলা বলে—তা, একথা কেন?

প্রিয় বলে—বলছিলাম—অতি ঘরন্তী না পায় ঘর। এই আর কি!

কুন্তলা বলে—অতো শতো বুঝি নে বাপু! খোলসা করে বলবি তো বল!

প্রিয় বলেছিল—আমরা এতো যত্ন করি একটুও চুল হয় না। আর তোমার খোঁপা থেকে বাবুইরা ফুরুৎ ফুরুৎ পালায়। এতো অযত্ন, তবু কতো চুল তোমার! তোমার চুলে চিরুনিতে সাপ নেউল সম্পর্ক। তেলের সঙ্গেও তাই। তবু আজও নিত্যি নতুন চুল গজাচ্ছে তোমার।

কুন্তলা লঘু সুরে সুরু করে গুরু হয়ে গিয়েছিল—আমি ভাবি—কি না কি!—এই কথা—। নিবি, নিবি তুই এই আপদ জঞ্জাল, নিবি? আমার এতো যত্ন আত্তি কোন দিনই পোষায় না।—অনেক কারণেই ভেবেছি—দেবো একদিন কাঁচি চালিয়ে।—

প্রিয় বলেছিল—বালাই, ষাট। চিরুনি চালিয়ে দিই উপস্থিত।

এই বলে জট ছাড়িয়ে, বেণী গড়ে দিয়েছিল একটা। কাঁটা আনাতে চেয়েছিল প্রিয়, উপেনকে বলেছিল ফিতে আনতে। আপত্তি করেছিল কুন্তলা। বলেছিল, আকাশের মুক্ত পাখী আমি! খাঁচার বাঁধন মানি নি। বাঁচার প্রয়োজনেও নয়। আর আজ চুলে পরাতে চাও ফিতের বাঁধন আর কাঁটার জ্বালা! ওই বেশ আছে—মুখ খোলা বেণী। এক মুহূর্তে খুলে ফেলা যায়। গোড়ায় ডগায় আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা—ও আমার পোষায় নি কোনদিন! চুলেও নয় জীবনেও নয়। যাকগে—। যদি কোনদিন জানতে পাস, বুঝবি কি বললাম আজ।

সেই কাল বিকেলে বাঁধা চুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুলছিল কুন্তলা।

ক্যাশ-কাউণ্টারে নিখিলেশ। কালকের হিসেব টুকছিল, মুখে কথা বলতে বলতে।

কুন্তলা নিজের খেয়ালের অভাবেই কার্যটি সুরু করেছিল। যখন প্রথম খেয়াল হলো এই প্রথম কুন্তলা দেখল তার চুলের ঢেউ আর পরিমানকে অপমান করার লোকও পৃথিবীতে আছে। কার্যটি বন্ধ করে দেবে প্রথমে মনে করে থাকলেও, এখন জেদ এসে পেয়ে বসল তাকে। কারণ, না—আড়চোখেও নয়—একবারও তাকাচ্ছে না নিখিলেশ। তার এই ঐশ্বর্যের দিকে।

আমার মতোই আপনাদেরও ভীরু-যৌবন, উঠতি বয়সে এই ভুলটা করে থাকবে। পথ চলতে, ট্রামে বাসে ট্রেনে সুন্দরী না হলেও যৌবনবতী মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির ভান করছে। মুখে রেখা ফুটিয়ে ভুরু উঠিয়ে উঁচোনো ভুরু দিয়ে বলছে—তাকিয়ে আছেন কেন অসভ্যের মতো? মা বোন নেই? আপনি ভাবছেন এই কথা ভাবছে মেয়েটি। একটুও নয়। মেয়েটি চোখ রাঙিয়ে বলছে—তাকাবে না মানে? এই জন্যেই কি এতো সেজেছি! সাধনা করেছি এতো প্রসাধনের! মুখখানা দেখেছো আমার? দেখেছো আমার চুল বাঁধার কায়দা! এই জন্যেই কি উদ্ধত যৌবনকে উদ্যত করে রেখেছি! না তাকিয়ে অপমান করে যাবে বলে!—ইস! সাহস কতো।

আপনি মুগ্ধ চোখে তাকাবেন, মেয়েটির রূপ যৌবনের তারিফ ফুটে ওঠে যেন আপনার চোখে। সামনা সামনি তাকাবেন না যেন। তাকাবেন আড়চোখে। ওটাতে কেমন যেন অস্বস্তির খোঁচা বিঁধতে থাকে।

কুন্তলাও মেয়ে। ওরও বোধহয় এই জেদ চেপে বসল।

এগিয়ে এলো কুন্তলা। যেখান থেকে ওর সান্নিধ্যের গন্ধ হাত বাড়িয়ে ধরতে পারে নিখিলেশের ঘ্রাণশক্তিকে। কস্তুরী মৃগের মতো নিজের চুলের বন মাতানো গন্ধ কুন্তলাকেই মাতাল করে তুলেছে তখন।

তবু তাকালো না নিখিলেশ।

নিখিলেশের চক্ষুতে আপীল করেছিল কুন্তলা। টারগেট মিস

করেছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে গুলী। কর্ণে তো নিবেদন করেই চলেছে। তাও তো চড় খেয়ে ফিরে এলো। এর পর নাসিকা। সেখানেও ঘাড় ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো কুন্তলার অহংকার। তথা কুন্তলার নারীত্ব।

বাকি রইল জিহ্বা আর ত্বক। কিরে বাবা! এই প্রিয়দর্শী ছেলেটা ইন্দ্রিয়জিৎ হয়ে বসে থাকবে, আর তার রূপ যৌবনের গর্ব মুখ বুজে সে-ই অপমান সহ্য করে নেবে বুঝি! আরো এগিয়ে এলো কুন্তলা। হাত থেকে হিসেবের খাতা কেড়ে নিল।

—রাখো ওসব। ভারী তু পয়সার হিসেব তু ঘণ্টা লাগছে মেলাতে! অকম্মা কোথাকার! চলো—চলো—

অসহায়ের মতো কাড়া-খাতাটার পিছু পিছু হাত বাড়ালো নিখিলেশ —দাও-দাও, সত্যি, এই আর তু চার মিনিট—

হিসেবে ডুবে না থাকলে অকম্মা কথাটার সত্যতার ধাক্কা নিখিলেশের হৃৎপিণ্ডটা তুলিয়ে দিত নিশ্চয়।

কুন্তলা বলল—নো-নো নেহি-নেহি। নেহি মিলেগা।

কুন্তলা খাতাটার কথা বলেছিল নেহি মিলেগা। অর্থাৎ ফিরিয়ে দেবে না খাতাটা।

নিখিলেশ অতোটা চিন্তা না করেই বলল—এই যে তুমি বললে নেহি মিলেগা! তুমি কি করে জানলে হিসেব মিলবে না? তা হলে কি হবে?

বিজয়িনীর মতো বলল কুন্তলা—কি হবে? আমার সাথে বেরোতে হবে!

নিখিলেশ বলল—আমি তা বলি নি। আমি বলছিলাম এই গরমিলের কি হবে?

মালিকের পরোয়াবিহীন মর্জিতে বলল কুন্তলা—কিৎনা রূপেয়াকা চুক?

—তু টাকা সাড়ে বারো আনা!—সভয়ে না হলেও সকুণ্ঠ বলল নিখিলেশ।

হেসে পিঠে একটা চড়ই মেরে বসল কুন্তলা। জিহ্বাটা বাকি রইল,

স্তক অবধি পৌঁছল কুন্তলার বিজিগীষা। হিন্দীতে পেয়ে বসেছিল কুন্তলাকে। বলল—আরে ছোড়ো ইয়ার। নরেশ বাবুনে নেহি বোলকর মাং লিয়া হোগা। কোই ফিকর নেহি। চলো—ওঠো—। জামাটা বদলে নাও। আমিও শাড়ীটা পাল্টে আসছি।

নরেশবাবু সম্বন্ধে উক্তিতে তো বটেই, বেরোবার প্রস্তাবে আরো অবাক হল নিখিলেশ। এই রকম বের হওয়া তার অজানা। বলল—কোথায়? এই সাত সকালে!

ওঘরে যাবার আগে চোখের কোণায় বিজলী ঝল্কে কুন্তলা বলে গেল—নরকে! যেতে পারবে না? ভয় লাগছে? আমার সাথে যেতেও ভয়!

হেসে ফেলল নিখিলেশ—ভয়? ভয় করতে তো শেখে নি নিখিলেশ দাস। চলো দেখি, আজ সকালে পোনাহাটের কোন জায়গাটা নরক হয়ে উঠল!

সাদা খোলের সবুজ ভেলভেটের পাড়ওয়ালা শাড়ী পরেছে কুন্তলা। ধোপ ভাঙা।

মনের সাদার কিণারে সবুজের পাড় বসেছে নিশ্চয়। এটুকু নিখিলেশ বুঝল কিনা জানি না। গায়ে ব্লাউজ, তার রং কিন্তু চেষ্টা করলে গেরুয়াও বলা যায়। পায়ে স্যাণ্ডেল।

রাস্তায় নেমে কুন্তলা বলল—চলো ঘূর্ণীর জলে ঘুরপাক খাইয়ে আনি তোমায়!

বসন্তের সকাল। রাস্তায় নেমে ভালোই লাগল নিখিলেশের। হাওয়া না থাকলেও আভাস আছে হাওয়ার। বদ্ধ ঘরে মাংস থোড়ার আওয়াজ, কাঁচা পিঁয়াজ কুচোনর গন্ধ, খাওয়ার টেবিল ধোলাই, মেঝে ধোলাই—এই তো হোটেলের সকাল। সেই সকাল থেকে রাস্তার খোলা সকাল ভালোই লাগল নিখিলেশের।

লোকজন যাতায়াত করছে—চেনা, আধচেনা, অচেনা। তাদের হাতে ব্যাগ। ব্যাগে বাজার। বাজার নয়, বাজারের সামর্থ্য। বাজারের ব্যাগটা পরিবারের লোকসংখ্যার অনুপাতে ফোলে না, ফোলে

ক্রেতার সামর্থ্যে। অনেকেই চেনা তার, অনেকের পরিবারের আয়তন জানা আছে নিখিলেশের।

অলস রিকশা ফিরে চলেছে। সিক্সটি থ্রি আপের লোক ছেড়ে এলো স্টেশনে। সকালের দিকে রিকশাওলাদের পায়ের ছুটি। মনটা খাই খাই করতে থাকলেও ওদের পা কাজ খুঁজে পায় না। কচিৎ ভাড়া জোটে দু একটা। স্টেশন থেকে দু একটা। বাজার যেতে আসতে দু একটা। অতো সকালে ট্রেনপথে লোক নামে না ব্যাপারী ছাড়া। তারা আসে আনাজ তরকারী নিয়ে আরো সকালে। একটু বেলা হলে কোর্ট কাছারির লোক আসতে থাকে। পোনাহাট সত্যিকার পোনাহাট হয়ে উঠতে থাকে। বেলা ন-দশটা থেকে রাত ন-দশটা পর্যন্ত কর্মে চঞ্চল, অকারণে মুখর। কাজে ও কাজের ভণিতা ও ভূমিকায় সরগরম। ব্যবসা কেন্দ্র পোনাহাট। জলপথ স্থলপথের সঙ্গম পোনাহাট। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর বসতি পোনাহাটে। সেই পোনাহাট।

ঘোড়ার গাড়ীর চারটে চাকা চারটে বিন্দুতে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে। চাকাদের বিশ্রামের সময় এখন এটা। এরপর বিকেল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে হায়রাণ হতে হবে! অদূরে স্টেশনের সীমানা। ঘোড়ার আর গাড়ীর প্রবেশ নিষেধ দেওয়া রেলের তৈরী রেলিঙে ঘোড়া দুটো বাঁধা। ঘোড়া নয়, ঘোড়ার অস্থি-র অস্তিত্ব। প্রাণটা ধুকপুক করছে যে-অস্তিত্বের পাঁজরায়। খানিকটা করে জলো ঘাসের খোলা আঁটি পড়ে আছে মুখের সামনে। অবশ আলস্যে খানিকটা করে চেখে দেখছে সেই জলো প্রাণধারণের উপাদান। ঘোড়া জোতা হয় না সকালে। অর্ডার থাকলে তবে দানাপানির ঘুষ পায় অশ্বিনী তনয়েরা। সকালের দিকে সেটা কচিৎই হয়।

স্টেশনের সামনে তুফান আলীর এই আড়গড়া। আড়গড়ার সামনে তেমাথা। এইখান অবধি রেল লাইনের সমান্তরাল দক্ষিণে এসে পশ্চিমে মোড় ঘুরল তারা। পশ্চিমের রাস্তা নাক বরাবর পোয়াটাক মাইল সোজা গিয়ে ঘূর্ণীস্নানে নেমেছে।

রাস্তার দুপাশে লোকালয়। ছোটো বড়ো বাড়ী। বাড়ীর তলায় তলায় দোকান। ওপরের বারান্দা থেকে শুকোতে দেওয়া শাড়ীর আঁচল নেমে এসেছে। কোথাও কোথাও সাইন বোর্ড আড়াল করে দিয়েছে দোকানের। তাতে কাপড়ের দোকানকে পানের আর মনিহারীকে অলঙ্কারের বলে ভুল হয় না অবশ্য। ক'খানাই বা দোকান। কতোটুকুই বা জায়গা।

তবু এই নেপিয়ার রোডকে দুপাশ থেকে কোণঠাসা করে এনেছে পোনাহাটের আভিজাত্য না হলেও সমৃদ্ধি। বাড়ীর পর বাড়ী উঠে গেছে—একতলা, দোতলা, আড়াইতলা। বাড়ীগুলো হাত পা ছড়িয়ে বসেছে বলে রাস্তাটিকেই সংকুচিত হতে হয়েছে।

পাশাপাশি হেঁটে চলেছে দুজন, কখনো বা আগু-পিছু। বাংলা দেশে যে মেয়ে স্বামীর রোজগার না খেয়ে নিজের রোজগার খায়, মনের বৈঠকখানায় তাকে সম্মানের আসন পেতে দেয় না কেউ। বাইরে খ্যাতির ওজন বুঝে খাতির করে মুখে।

কুন্তলাকে এই মহকুমা শহরের ব্যবসাদারেরা আর বড়োলোকেরা চেনে। রাতারাতি বড়োলোক হয়েছে এই মেয়ে। রাতের শহর কুন্তলাকে চেনার চেষ্টা করে করে হায়রাণ হয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছে। উত্তরপাড়ার কোল ঘেঁষা তার বাড়ী—তবু উত্তরপাড়ার নয় সে।

নিখিলেশকে চেনে না অনেকেই। যারা চেনে তারা তাকে উত্তরপাড়ার বাসিন্দে বলেই চেনে। তার চেয়ে মর্যাদা বা স্বীকৃতি কোনটা দিতেই নারাজ তারা। কেন দেবে? তারা তো জানে না উত্তর কলকাতার দাসপাড়া রোড তাদের বাড়ীরই নামানুসারী। দাসেদের বাড়ী আজ আর দাসেদের নেই। না থাকলেও রাস্তাটার এনামেল প্লেট করা নামাঙ্কে আজও দাসেরা বেঁচে।

খুব জোরে না হাঁটলেও আস্তেও হাঁটছিল না তারা। পায়ে পায়ে পোয়া মাইল ফুরিয়ে যেতে ক' মিনিটই বা লাগে।

নদীর ঘাটে পৌঁছবার আগেই জানান দেয় রাস্তা। য়্যাসফল্টের কলঙ্ক তো অনেক আগেই শেষ, তারপর নিষ্ঠুর খোয়া। যেমনি বন্ধুর,

তেমনি লাল। ইটের ভগ্নাংশ হওয়ার লালাভা ফুরিয়ে গেছে অনেকদিনই। এখন যে লাল মতন রঙ, ওগুলো শুকনো রক্ত লেগে। মানুষের পা থেকে রক্ত ঝরিয়ে গায় মেখে নেওয়া।

রুগ্ন গোরুর মেরুদণ্ডের মতো শিরদাঁড়া জাগিয়ে মাঝখানটা উঁচু। পঞ্জরাস্থির দুপাশে উঁচু নীচু। আবার এই পথটা নিজের মাথা উঁচু রেখে জোয়ারের তটের সীমানা অবধি এসেছে। দুপাশে ক্রমে ঢালু হয়ে আসা জমি। ঢালু জমিতে শুকোচ্ছে গাবের আঠা মাখানো মাছের জাল, গন্ধ আসছে তা থেকে। ফাটা পিঠ ফুটো পিঠ মেরামতের পর উবুড়-করা জেলে-ডিঙি আলকাৎরা মেখে পেটে রোদ্দুর পোহাচ্ছে।

ঘাটে, ঘাটের কাছে যতো রকমের নৌকো হওয়া সম্ভব প্রায় সব রকমের স্যাম্পল আছে। জেলে-ডিঙি, খেয়া নৌকো, এক মাল্লাই, একাধিক মাল্লাই, ঘাসি নৌকো, ভাওয়ালি বা ভাউলে। এখন হয়তো নেই, খোঁজ করলে পানসি বজরাও পাওয়া যেতে পারে। সন্ধ্যেবেলা নৌকোয় নৌকোয় মুক্তোবিন্দু জ্বলে—জলে ছায়া পড়ে। তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙতে ভাঙতে টুকরো আলোর লাঠি ভেসে আসতে থাকে পাড় পর্যন্ত। খুব নয়নরম দৃশ্য। ভালো লাগে চোখ ভরে দেখতে। ভালো লাগে নাক ভরে শুঁকতে, মাল্লারা নিজেদের রান্না রাঁধে যখন। গলুইয়ের পাটাতনের খোঁড়লে তোলা-উনুনে হাওয়ার আবডাল রেখে মুসুর ডালে পেঁয়াজের সম্বরা দেয়। সেই গন্ধ ভিজে জলের গন্ধে সওয়ার হয়ে এসে আপনার নাকে করাঘাত করে।

এখানকার ঘাট প্রায় চড়ার ওপর। এমন ছিল না। এই ভাঙা ঘাট আর রাস্তা মেরামতের চেষ্টা করা হয়েছিল একবার। কোত্থেকে অন্যান্য নদীর রোষ ধার করে ছুটে এসেছিল ঘূর্ণী। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিবসনা উন্মাদিনীর মতো। ঢেউয়ের আঁচড়ে দংশনে, স্রোতের টানা-টানিতে নিরীহ মেরামতওলাদের ডুবিয়ে তবে রাগ শান্ত হয়েছিল তার। সেই সঙ্গে পাকা ঘাট আর পাকা ঘাটের ওপরে পাকা রাস্তা তাসের প্রাসাদের মতো ঘূর্ণীর জলে ডুবে গিয়েছিল।

একটু নজর করলে অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারে। জেলে ডিঙিটাই বা কেন ঘাটের এতো কাছাকাছি। ভাউলে আর লঞ্চটাই বা কেন বেশ দূরে! নোঙরের দড়ি শিকল গলায় বেঁধে তারাই বা অতো দূরে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু কাঁপছে কেন!

ঘাট এখানে অগভীর জলের ওপর। অতো অগভীর ছিল না—এখন হয়ে উঠেছে।

সকল চোখের বাঁকা দৃষ্টি পার হয়ে এসে পৌঁছল ওরা। সারাটা রাস্তা একটি লোকও বোধ হয় সোজা চোখে তাকায় নি ওদের দিকে। সমবয়সী দুটি লোক। একটি সুদর্শন ছেলে, একটি ময়লা রং মেয়ে। সুগঠিত দেহী সুঠাম সুন্দর।

যে কোন কারণেই হোক, সারা রাস্তা কথা হয় নি আর।

ভাঁটার সময়। রাস্তাটা মূর্তিমান বেমানানের মতো জল থেকে উঁচু হয়ে তো আছেই, কাছ পর্যন্ত পৌঁছতেও পারে নি।

এক পাশের ঢালু জমি ধরল ওরা। ধরে কাছ বরাবর এলো জলের। পায়ে চলে যে পথ গড়ে ওঠে—জোয়ার তার জলাধিক্যের ন্যাতা বুলিয়ে মুছে দেয় খানিকটা আবার।

এইবার কথা বলল কুন্তলা—এই হাঁদারাম, সাঁতার জানো?

নিখিলেশ মনে মনে হিসেব করছিল, এই প্রশংসাবাক্য শুনে ফেলল না তো কেউ! তাই জবাব দিতে একটু দেরী হল—চর্চা না থাকলে যোগ বিয়োগের মতো সোজা অঙ্কও ভুলে ফেলা যায়। সাইকেল চড়া আর সাঁতার, চেষ্টা করেও ভোলা যায় না।

পরিষ্কার জবাব না পেয়ে আর উত্তর দিতে দেরী হওয়াতে কুন্তলা ধরেই নিল—নিখিলেশ এড়িয়ে গেল উত্তর। বলল—লেকচার শুনতে চাই নি, তুমি জানো কি না!

নিখিলেশ এবারও সোজা জবাব দিল না। নিজের দৃষ্টির পিছন পিছন কুন্তলার দৃষ্টিকে নদীর মাঝবরাবর টেনে নিয়ে ফেলল। মাছধরা হচ্ছিল। জেলে ডিঙির গায়ে লাগানো তেকোণা জাল। মাছ উঠেছিল

কিছু। অল্প গোটা কতো। খরগুল্লো জাতীয় চকচকে মাছ। জলের জীবন থেকে নির্জলা মৃত্যুর শুকনো উপকূলে আসতে শেষবারের মতো ছটফট করছিল রোদের আলোয়।

নিখিলেশ বলল—ভ্যাখো ভ্যাখো কি চমৎকার দেখাচ্ছে।

কুন্তলা যা বোঝার বুঝে নিল। একটু চুপ করে থেকে বলল—চলো ঐ টাটকা মাছ কিনে নিয়ে যাই। ঝাল হবে ভালো—

ফাল্গুন মাসের আটটা-নটা বেশী বেলা নয়। রোদও তেমন প্রখর নয়। একটা পিটুলি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল ওরা। তলায় গোল গোল প্রায় সবুজ রঙা ফলগুলি পড়ে গিয়ে কাদায় পুঁতে পুঁতে আছে।

নিখিলেশ কাদা না মাখা একটা ফল হাতে করে লুফছিল—ওরা কখন আসবে পাড়ে, ঠিক আছে কিছু? এবেলা বেচবে বলে তো মনে হয় না! চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

—কি চেষ্টা করবে?—শুধোল কুন্তলা। সামান্য হাওয়ার আভাস। ঘামের আঠায় জড়িয়ে গালে কপালে লেপ্টে যাচ্ছিল খুচরো চুল। খোঁপার তলায়, ঘাড়ে, গলায়, কম্বুগ্রীবার রেখার খাঁজে, বুকের অলিতে গলিতে ঘাম জমেছে কুন্তলার।

—তাই তো।—বলে থমকাল নিখিলেশ। বলল—নৌকো নিয়ে ওর কাছে গিয়ে কিনে নিয়ে আসবো!

—ওর কাছে গেলে ওর মাছ ধরার ক্ষতি হতে পারে তো! কুন্তলা বলল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও মাছ প্রাপ্তির 'মেড-ঈজি' খুঁজে পাওয়া গেল না।

অগত্যা ফেরা গেল।

ফেরার পথে কুন্তলা বলল—রিকশা নাও একটা!···এই রিকশা!

টানা রিকশা। হাতে নূপুর বাজাতে বাজাতে কাছে এল। ঘাড় নুইয়ে মাটিতে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। পিঠ পেতে দিয়ে যেন বলল—ওঠো হাওদায়—

পাশাপাশি দুজনের অকুলান না হবার কথা নয়। চারখানা উরু পাশাপাশি হয়েও পিন ফেলার জায়গা রইল না।

নিখিলেশ বলল—উঃ কি মোটা রে বাবা! দুটো যেন কলাগাছের টুকরো।

অপাঙ্গে তাকায় বুঝি কুন্তলা।

এর গায়ের গরম সঞ্চারিত হচ্ছিল ওর গায়ে। ওর গায়ের তাপ এর গায়ে। গা থেকে এই তাপ মনকে আতপ্ত করে তুলতে সুরু করেছিল। উভয় পক্ষের না হলেও এক পক্ষের তো বটেই। কথার মোড় ঘোরাবার দরকার মনে করল নিখিলেশ। বলল—হঠাৎ রিকশা কেন?

হঠাৎ বুদ্ধি আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মরদের নেই। আছে চোরদের। চোরেদের চেয়ে বেশী আছে মেয়েদের। কি জন্য রিকশা করেছিল সেটা কুন্তলার মনের ওপর তলা জানত কিনা জানি না। অবচেতন মনের গোপন তলা সে খবর জানত কুন্তলার। হেসে বলল—উঃ, কী ভীষণ হাঁটিয়েছ খেয়াল নেই বুঝি!

খানিকক্ষণ আগে কুন্তলার রূপ যৌবনকে অপমান করেছে নিখিলেশ। শোধ তুলবে না বুঝি কুন্তলা!

জালের ওপ্রান্তে বসে মাকড়সা হাসছে।

বস্ত্রহরণ ভাণ্ডারের কাছে আসতেই কুন্তলা বলল—এই রোককে, থামাও—।

মানসিক একটা অস্বস্তির কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ক্লান্তি বোধ করছিল নিখিলেশ। রিকশা ভালো করে থামার আগেই লাফিয়ে নেমে পড়ল নিখিলেশ। যেন মনের সেই অস্বস্তির হাত থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পেতে।

একটা সহজ সরল তথ্য নিখিলেশ তখনও শেখে নি। যে-কোন মেয়ে ইচ্ছামাত্র যে কোন পুরুষকে বাঁদর নাচ নাচাতে পারে। শুধু ইচ্ছে হওয়া চাই মেয়েটির, আর কিছু চাই নে।

মেয়েদের সঙ্গে মিশেছে সে। চন্দ্রাবলীর মতো মেয়ে, মণিমালার মতো মেয়ে। চলতি ভাষায় তাদের নাম খারাপ মেয়ে। তা হলেও তারা

মানুষ। মানুষ বলেই মনুষ্যত্বও আছে। খারাপ মানে যেমন গোটাটাই খারাপ নয়। চাঁদ নিজেকে কেন্দ্র করে ঘোরা বন্ধ করেছে। যেই দিকটা আমরা দেখি সেদিকটাই বরাবর দেখি। আর সেদিকটাতেই আছে গোটা কতো গভীর গহ্বর। সেগুলোকে বলি কলঙ্ক। অপর পিঠটা হয়তো কলঙ্কহীন। চন্দ্রাবলীদেরও তেমনি। তাদের একটা দিকই চোখে পড়ে আমাদের, একটা রূপ। তাদের রাত্রির জীবনের রূপ। তাই তারা খারাপ। খারাপ কেন তা কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে না। খারাপ বলে আরাম পায়।

মেয়েদের সঙ্গে মেশা শেষ হয় নি তার। কুন্তলার মতো আর এক ধরণের স্বাধীন জেনানার সঙ্গে মেশা বাকি আছে। মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে অতি বড়ো প্রাজ্ঞও কি হলপ করে বলতে পারেন—জানার যা ছিল জেনেছি। দেখার যা ছিল দেখলাম—রূপ রস বর্ণ গন্ধ! বাকি রইল না কিছু!

রিকশা থেকে আভিজাত্যের গাম্ভীর্য নিয়ে আস্তে আস্তে নামল কুন্তলা।

আস্তে আস্তে ঢুকল বস্ত্রহরণ ভাণ্ডারে। কোন নির্দেশ না পেয়ে পিছু পিছু ঢোকাই সমীচীন মনে করল নিখিলেশ।

পিছনে তাকিয়া সামনে কাঠের হাত-বাক্স। ফতুয়া গায়ে যিনি বসে আছেন তিনিই নকুল চন্দ্র সরকার হতে পারেন। সাইনবোর্ডে যাঁর নাম মালিক বলে ঘোষণা করছে। ঝাঁটার কাঠি গোঁফের তলায় তাঁর মুখ হাসিতে প্রশস্ত হয়ে এলো।

—আসুন-আসুন মিস ঘোষ। বসুন! ওরে জগা, জগন্নাথ বেঞ্চিটা পুঁছে দে শীগগীর।

কাপড়ের দোকানে যেমন হয়, ফরাস শেষ, দেয়ালের গায়ে গায়ে বসবার বেঞ্চি।

কুন্তলা বসল। চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলল নিখিলেশকেও। কুন্তলার মুখের গাম্ভীর্যের অনুপাতে দূরত্ব বজায় রেখে বসল নিখিলেশও। আড়ষ্ট!

সামনের কাঠের বাক্সে কনুইয়ের ভর রেখে শরীরটা একটু সুমুখে ঝুঁকিয়ে নকুলবাবু বললেন—বলুন কি দেবো?

কুন্তলা বলল—ধুতি দেখান। একটু ভালো কোআলিটির।

নকুলবাবু বলার আগেই ওপরের কাঠের প্লাটফরম থেকে ধুপধাপ পড়তে লাগল। ধুতি আর ধুতি।

এক নজর দেখে কুন্তলা বলল—ফরাসডাঙ্গা নেই, কাঁচি ধুতি?

ওপর থেকে পড়া বন্ধ হয়ে গেল। যেগুলো ফেলা হচ্ছিল সেগুলো ছিল মিলের।

সকাল বেলা শাঁসালো শিকার পেয়ে নকুলবাবু খুশী হয়েছিলেন অবশ্যই। পাশে যিনি নিষ্কর্মা বসেছিলেন, তিনিও কম খুশী হন নি। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সড়াৎ করে কাঁচের আলমারী খুলে দিলেন। মারকিনে মোড়া একবাণ্ডিল তাঁতের ধুতি সামনে মেলে ধরলেন।

ধুতি কেনা হল দুখানা। বেশ দামী একখানা। আর একখানা কিছু কম দামী।

নমস্কার বিনিময়ের পর একদিকে রইল 'আবার আসবেন' অনুরোধ, অপর দিকে নীরব হাসি।

গোঁজা মুখ তুলল রিকশা। পিঠে আড়াই মণী বোঝা তুলে নিয়ে এগোল টুং টুং—

নিখিলেশ জুত করে বসতে বসতে শুধোল—বেশ তো ছিল শাড়ী। ধুতি ধরবে কেন? ভালো মানাবে কি? সকলকেই কি সব কিছুতে মানায়?

কুন্তলা গাম্ভীর্যের মুখোস একটুও না-খুলেই বলল—তোমার সঙ্গে চেনা হয়ে পর্যন্ত বেষ্টুমীই হয়ে যাবো ভাবছি। আপত্তি আছে নাকি?—আর মানামানির কথা বলছ? তোমার পাশে আমাকেই মানিয়েছে নাকি? যে না চেহারা। এক রিকশায় বসতেই লজ্জা হয়। আমার আবার মানামানি।

কথাগুলির নিহিতার্থ নিখিলেশ বুঝে উঠতে পারল না। চুপ করে রইল।

চাকার বেশী পাক হবার আগেই আবার হুকুম—এই—দাঁড়াও—

এবার 'ফিটওয়েল'। দরজির দোকান।

এখানে দেখা গেল পাঞ্জাবীর মাপ নিতে বলছে কুন্তলা। ভালো

পপলিন আর আদ্দির। বার কতো মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখের ফিতে দিয়ে মেপে নিল কুন্তলা। পরে দরজিকে বলল—মাথায়—তা—সামান্য ইঞ্চি দুয়েক বড়ো এনার চেয়ে। গায়ে গতরে এমনি মোটা। তফাৎ হবে না বিশেষ। এনারই মাপ নিন মোটামুটি। লম্বাটা আসটা একটু হিসেব করে কাটবেন।—কবে পাবো?—য়্যাডভান্স নিলেন না? —এই নিন—দশ রাখুন—ডেলিভারী বুধবার?—তা—বেশ অসুবিধে নেই আমার। কথায় খেলাপ করবেন না যেন।

আবার তুফান আলীর আড়গড়া। তেমাথায় এসে রিকশা থামল। নেমে পড়ল দুজনেই। ভাড়া মিটিয়ে বাঁদিকে মোড় ফিরে হেঁটে চলল দুজনে।

কুন্তলা বলল—কি তুমি বলো তো! একটু বুদ্ধিও নেই। মেয়েমানুষের সঙ্গে মিশলে-টিশলে একুটু বুদ্ধি খোলে জানতুম। ঘোড়ার ডিম মিশেছো তুমি! শুধু ফরমাস খাটতেই শিখেছো।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো নিখিলেশ। খানিক বিস্ময়ে, বেশীটা অপমানে বোবা।

চলতে চলতে কুন্তলা বলল—রিকশা নিলাম কেন বুঝলে না তো? বাইরে আমি মান্য গণ্য হোটেলের মালিক। রাস্তায় ঘাটে আমি রেসপেক্‌টেবল। রিকশা থেকে না নেমে পায়ে হেঁটে দোকানে ঢুকবো বুঝি! মান থাকবে তাতে?

কৈফিয়ৎটা যেন মনগড়া মনে হল নিখিলেশের। সে ভেবে দেখছিল যাবার সময় ঐ একই পথে হেঁটে গিয়েছিল তারা। বুদ্ধির বদলে আরো বেশী বুদ্ধুপনা না বেরিয়ে পড়ে এই ভয়ে চুপ করেই রইল সে।

বিপদ তাতেও কাটল না। চুপ করাটাকেও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই দিল না কুন্তলা—এবারে ভাবছ—রিকশা থেকে ওখানে নামলুম কেন! ভাবো বসে বসে!—আরে, নিজেদের বাড়ির লোকের কাছে এক রিকশায় চড়া। নাই বা দেখালুম বাহাদুরি নেই ওতে। অসুবিধে থাকতে পারে।—আমার লোক আমায় তা হলে মানবে কেন?

এইবার হেসে ফেলল নিখিলেশ—সত্যি বলব? মোটা মাথায় এটুকু ঢুকেছে কিন্তু!

বাড়ি পৌঁছে দেখা গেল—আলোক এসেছে। প্রিয়র সঙ্গে হাসি ঠাট্টার কিছু হয়ে থাকবে বোধহয়, হাসছে দুজনেই। আলোক হো হো করে, প্রিয় মুচকি মুচকি।

কুন্তলাকে ঢুকতে দেখে হাসি শুকিয়ে গেল প্রিয়র। আলোকও অপ্রস্তুত হলো মনে হলো।

কুন্তলা প্রস্তুত করে দিল দুজনকেই। হাসতে হাসতে বলল—আলোকবাবু অনেকক্ষণ নাকি!—আজ এসেছেন ভালোই হয়েছে। অবাক মাছের ঝাল খাওয়াবো আজ। পোনাহাটে কেবল পোনা আর পোনা খেয়ে নোনা ধরে গেল মুখে। চুনো মাছের ঝাল হবে।

প্রিয় বলল—কই আজো তো পোনা আর ভেটকি। চুনো—? এনেছো নাকি তোমরা?

লম্বা টান মেরে 'হুঁ…' বলল কুন্তলা। বদ্ধ ডান হাতের ফাঁকা মুষ্টিটা খুলে মেলে ধরল সামনে—এই যে। বলে নদীর ঘাটের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলল সকলকে হাসতে হাসতে।

যতটুকু জানি আমি কুন্তলাকে, হলপ করে বলতে পারি—প্রিয় আর আলোককে হাসাহাসি করতে দেখে খুশী হয় নি কুন্তলা। নেহাৎ নিজেই যে নিখিলেশের সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরল—তাই। তার পক্ষে আলোকের সামনে নিখিলেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জাহির করার প্রয়োজন ছিল—।

পরদিন সকাল এমন কিছু নতুনত্বের সওদা বয়ে আনল না, কারো জন্যেই। অন্ততঃ আপাত দৃষ্টে তাই মনে হল।

কাল সারাদিন নিখিলেশের মনে হয়েছে—আলোকবাবু বড়ো বেশী মাখামাখি করছেন প্রিয়র সঙ্গে। প্রকাশ্যেই। আলোকবাবুর হাসি ঠাট্টার পরিমান বেড়েই চলেছে। প্রিয় সাহস পাচ্ছে না সমানে তাল রাখতে। সাহস পেলে আপত্তি হতো না, মুখে সেই ছাপ সুস্পষ্ট। প্রিয়

বোধ হয় ভাবছে হাস্য পরিহাস কার না ভালো লাগে! কার না মন খুশীতে ভরে ওঠে নিজের রূপের সুখ্যাতি শুনে। বাজপাখীর নখরের থাবা মুক্ত হয়ে আশ্রয় জুটেছে কোকিলের কুলায়ে। সাহসে কুলোচ্ছে না আবার আকাশ পথে ভাসতে। নীড়ের আশ্রয় হারিয়ে নিরাশ্রয়। তাই মুখে সমর্থন করতে সাহস পাচ্ছে না আলোকবাবুর রসিকতার।

ঘুমের আগে জাগ্রতে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে একটি রহস্যময়ী নারীকে কাল সারারাত মনে পড়েছে তার। নারী মাত্রেই রহস্যময়ী, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কথাটা শুনেছে, মনেও হয়েছে। বাস্তবে পরখ করে দেখা হয়নি ভালো করে। এর আগে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাদের মধ্যে রহস্য কম। সেই মেয়েদের কথাবার্তায় চালচলনে যা ফুটে উঠত তার মধ্যে অভিনয় ছিল না। সারারাত অন্যের সঙ্গে অভিনয় করে ক্লান্ত তারা। সারাদিন নিখিলদার সঙ্গে ব্যবহারে ফাঁকি ছিল না তাদের।

তবু তার মনে হয়েছে নারী মাত্রেই রহস্যের সুতোর বিরাট বাণ্ডিল।

একথা জেনে বুঝেও চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায়নি নিখিলেশ। কি চায় কুন্তলা তার কাছে, কোন ধরণের ব্যবহার? হাঁদারাম বলে ঠাট্টা করতে পারে তরঙ্গোচ্ছল অন্তর। যে অন্তর অন্তরঙ্গতায় বোঝাই, আন্তরিকতায় একাগ্র। বুদ্ধির অল্পতায় খোঁচা মারে কে! যে চায় খোঁচায় খোঁচায় নির্বুদ্ধিতা দূর করতে। ক'রে আমাকে বুদ্ধিমান দেখতে চায় যে, এ মাথাব্যথা তারই।

সাত আট মিনিটের পথ। রিকশায় চড়ার মানে কি শুধু মান অপমানের প্রশ্ন, না সান্নিধ্যের ঘনতায় আর মেদের নরমে তাকে আতুর করে তোলার চেষ্টা?

কুন্তলা তাকে যেচে আশ্রয় দিল। কেন? অমনি? গুহায় নিহিত কি কিছুই নেই?

আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল সে অনেক। একটি মনে আছে তার।

একটা উঁচু পাহাড় থেকে বিনা-ক্লেশে বিনা-দ্বিধায় তাকে ঠেলে ফেলে দিল কুন্তলা। বলল, হাঁদারাম কোথাকার! কিছু পারো না!—সেই শূন্য থেকে নিচুকার শূন্যে মাথা নিচু অবস্থায় ক্রমশঃ নেমে নেমে আসছে সে। এমনি সময় প্রিয় ডেকে দিল তাকে—কেমন ধারা শোয়ার ছিরি গো তোমার বাবু! বালিশ থেকে মাথা পড়ে গেছে, খেয়াল নেই হুঁশ নেই একটুও।

অন্য দিন তাকে ডেকে দিতে হয় না। ডেকে দেবার চাকর যখন ছিল তখন ছিল। ডেকে যদি কেউ দেয়ই সে সূর্যকর, চাকর নয়।

আজ ডেকে দিল প্রিয়।

উঠে কার মুখ দেখল এই চিন্তা তার রোজ প্রাতের। আজ সুন্দরী নারীমুখ। দিন ভালো যাবে আজ। এতে সন্দেহ নেই।

এই খুশীতে রাতের চিন্তা স্বপ্নের দুশ্চিন্তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। নির্মল খুশী-উজ্জ্বল সূর্য উঠল তার মনে।

রোজের মতো ক্যাশ কাউন্টারে বসে লাভ লোকসানের খতিয়ান লিখছিল নিখিলেশ। প্রায় কালকের সময়েই কুন্তলা এসে হাজির।

—চলো!

নিখিলেশ দেখল কুন্তলার হাতে কি সব পোঁটলা-পুঁটলি।

নিখিলেশ হাত বাড়ালো। বলল—আমার হাতে দাও।

বলে চাবিটা বন্ধ করে পকেটে রাখতে যাচ্ছিল, কুন্তলা হাত বাড়ালো—ওটা না হয় আমাকে দাও! আর প্যাকেটটা নিতে চাইছিলে, এই নাও বরং। বদলাবদলি। কেমন, রাজী তো?

ভীষণ আশ্চর্য হল নিখিলেশ। হাঁদারাম বলে ক্যাশ থেকে সরিয়ে দিল নাকি!

পথে নেমে তুফান আলীর আড়গড়া পর্যন্ত যেতে যেতে কুন্তলা বলল—অতো কি ভাবছো? ভাববার সময় পাবে, বিষয়ও পাবে। পরে।—হয়তো

আজও পেয়ে যেতে পারো।—তুমি কী বলো তো! যা এলো তাকেই মাথা পেতে মেনে নাও কেন? প্রতিবাদ নেই, চিন্তা-ভাবনা নেই। হাতের কাছে এগিয়ে দিল কেউ—খেলে। ঠিক তাও নয়। এগিয়ে দিলেই খাও না। কেউ সাধল, অনুরোধ করল—তবে খেলে। আজকের দিনে কেড়ে না খেলে পাওয়া যায়?—কে তোমায় মুখের কাছে এগিয়ে ধরে সাধবে? —হাতের কাছে পেলেই খাও না—এটা দাসপাড়া রোডের বনেদী চাল। রয়ে গেছে তা বুঝি, কিন্তু—এই রিকশা—

আজ দেখি ঘূর্ণীর যাবার পথেই রিকশা!

কুন্তলা বলে যেতে লাগল—পায়ের তলা থেকে জমিদারীর মাটি একদিনেই সরে যায় নি। অত বিঘে মাটি, অত দালান কোঠা ইমারত একদিনেই উপে যায় নি। সময় লেগেছে। যখন প্রথম বুঝলে, সরতে সুরু করেছে, নড়ে উঠেছে, গতি পেয়েছে জমিদারী, চঞ্চলা লক্ষ্মী বাড়া বদলাচ্ছেন আবার—তখন তো জীবন সম্বন্ধে ভাবতে পারতে! ভেবেছিলে কিছু—কি করবে, কি করে খাবে ভবিষ্যতে?

চুপ করে রইল নিখিলেশ। যে সময়ে এই ভাবনা ভাবা উচিত ছিল সেই সময়েই সে বিনয় রায়ের পাল্লায় পড়েছে। কুন্তলা যা বলছে সে কথা তো বর্ণে বর্ণে সত্য। এর উত্তর কি আছে!

রাস্তার চলতি একটা পাশের দিকে উদ্দেশ্যহীন তাকিয়ে রইল নিখিলেশ।

সম্ভবত বুঝল কুন্তলা, নিখিলেশের দেবার মতো উত্তর নেই। ইচ্ছাও নেই। বলল—আর যাই হোক, অমন গোমড়া মুখে রাস্তায় বেরোতে হবে না।—পাদপাদপে অসুবিধে হচ্ছে কিছু? হলে বলো—চেষ্টা করবো।—তোমায় কিন্তু আয়েস না দেওয়াই ভালো—

ঘাটে পেঁছে ঢালুপথে নামতে নামতে নিখিলেশ বলল—মাছের নৌকোটা কই দেখছি না তো আজ!

কুন্তলা বলল—হয়তো এমনিতেই নৌকোটা নেই। তা ছাড়া স্বাভাবিক কোনো কারণ আছে। বলতে পারো সেটি, হাঁদারাম!

নিখিলেশ বলল—এই জোয়ার-ভাঁটার সময়ের ওপর নির্ভর করে খানিক। সঠিক জানি না। এই রকমই শুনেছিলাম।

কুন্তলা বলল—আমিও খুব ভালো জানি না। একটু একটু জানি। নদীর মাছ জোয়ার-ভাঁটার স্রোতের উজোন চলতে ভালোবাসে। তখন ওরা একটু গভীর দিয়েই যায়। তখন ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে ওরা, জোয়ারের টান শেষ ভাঁটা সুরু হয় নি—আর ভাঁটার টান শেষ জোয়ার সুরু হয় নি, জলের এই থমথমে ছুটো অবস্থায়। এই সময় হাত পা ছড়িয়ে একটু খেলাধুলো করতে জলের ওপরতলায় উঠে আসে। আর ধরা পড়ে যায় বেচারারা। জলের থমথমে এই অবস্থা ছুটোর ছুটোই দিনে পড়তে পারে, ছুটোই রাত্রে পড়তে পারে। একটা দিনে একটা রাত্রে পড়তে পারে। কাল যে সময় জোয়ার এসেছিল আজ আসবে ঠিক তার আটচল্লিশ মিনিট পর। ঠিক তেমনি ভাঁটাও। ছুবার জোয়ার ছুবার ভাঁটার সময় কিন্তু পাঁচ মিনিট করে পিছিয়ে যায়। একটা জোয়ার সুরু আর পরের জোয়ার সুরুতে বারো ঘণ্টা পাঁচ মিনিট তফাৎ! ঠিক বারো ঘণ্টা নয়। এসব মোটামুটি ঠিক আছে। জোয়ারের পর ভাঁটা আরম্ভ চার ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট পর। ভাঁটার টানটা কিন্তু দীর্ঘতর—সওয়া সাত ঘণ্টা।—কাজেই মাছধরার সেই সময়টাও আজ আটচল্লিশ মিনিট পিছিয়ে আসছে। আমরা বোধ হয় কালকের চেয়ে সকালেই বেরিয়েছি।

জোয়ার-ভাঁটার লেকচারের মধ্যে এই প্রথম অবকাশ পেল নিখিলেশ। বলল—তা, আধ-ঘণ্টাটাক আগেই বেরিয়েছি বোধ হয়।

জলের একান্ত কাছে চলে গিয়েছিল ওরা।

কুন্তলা বলল—ভেবেছিলুম, নৌকো চেপে মাঝনদী থেকে মাছ কিনে আনবো। নৌকো চাপার সখটাই দেখছি বাজে হয়ে গেল আজ। মাছের নৌকোই নেই—

নিখিলেশ বলল—মাছ কেনা এক জিনিষ, নৌকো চাপা আর। একটার জন্যে আর একটা জলাঞ্জলি যাবে কেন? বলো তো নৌকো নিই একটা।

কুন্তলা সানন্দে মত দিলে। ডিঙি নৌকো আধ-ঘণ্টা ভাড়া নেয়া হল।

উঠে বসল দুজনে। মাঝিকে বলল—এদিককার পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে কলকাতার দিকে যেতে।

ছোট্ট পোনাহাট—বোটের কয়েক ঘায়েই ফুরিয়ে গেল। এধারে নদী আরো চওড়া। মাঝে মাঝে ইট চূণ সুরকী টালি বালির নৌকো নোঙর করে আছে। এখনও পর্যন্ত এপাড় জুড়ে চড়ার আভাস। কুন্তলা বুঝে নিল সেটুকু। ঠিক পাড় হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠে যায় নি কোথাও। ঢালু হয়ে নেমে এসেছে।

নৌকোর মাঝ বরাবর বসে নিখিলেশ। একটু পিছনে কুন্তলা।

হাত নিসপিস করছে কুন্তলার, মন ফসফস। কিছু একটা করা চাই—যা ভেবে বেরিয়েছে তা না হলেও। কিন্তু কেমন করে? অছিলাটা কি?

পাড় থেকে গজ কয়েক দূরে নৌকো ওদের। কাছ ঘেঁষে লাল রঙের ফুল চলেছিল একটা ভেসে। এমন কিছু দামী দুর্লভ নয়। হয়তো পলাশ। পাড়ে দাঁড়িয়ে কোনো মা-পলাশ ওঁ নমো গঙ্গায় বলে একটিকে হয়তো জলাঞ্জলি দিয়েছে। উপহার দিয়েছে চলতি জলকে।

উপলক্ষ্য উপলক্ষ্যই। লক্ষ্যের প্রয়োজনে বাড়তি পাওনা। 'বাই প্রোডাক্ট।' লক্ষ্যে পেঁাছে দিলেই উপলক্ষ্যের অপমৃত্যু বা ছুটি!

পলাশ পলাশই সই। উপলক্ষ্য হতে বাধা নেই তো!

কুন্তলা হাত তালি দিয়ে উঠল—ছাখো না কি সুন্দর ফুলটা! কি সুন্দর লাল টুকটুকে। এনে দাও না লেশ!

নিখিলেশ স্তম্ভিত হল—। বলল—ও তো সামান্য পলাশ! কতো চাই তোমার? একগাছ ফুল এনে দোব তোমায়।

কুন্তলা কপট কোপে গাল ফোলালো—কবে দেবে? কখন দেবে? দিতে হলে এখুনি দাও।—পারবে না বলে দাও, ব্যস।

নিখিলেশ চেয়ে দেখলো দেবী কুপিতা। দেবীর সব চেয়ে ধারালো যে আয়ুধ, সেই অস্ত্র ধারণ করেছেন। দেবীদের ত্রিনয়ন থাকে। ভস্ম

করার প্রয়োজনে ত্রিনয়ন থেকে বহ্নি বের করে থাকেন তারা। মানবীদের তিনটে নেই।দুটো চোখই যথেষ্ট। ধ্বক ধ্বক দাবানল বেরোচ্ছে সেখান থেকে।

নিখিলেশ মরে গেল। অসহ্য সুখে মরে গেল। এই দৃশ্যের দৃষ্টি-গোচর হয়ে অনায়াসে মরে যেতে পারে সে। ঠিক এই মুহূর্তে মরে যেতে কষ্ট হবে না তার।

মদন বিষে জরজর হয়ে আতুর স্বরে বললে নিখিলেশ—মাঝিকে—

কথা শেষ হতে না দিয়েই বজ্র গর্জন করে উঠল—না-না-না। আমি জানি মাঝিকে বলতে। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না দয়া করে। অকর্মণ্য অপদার্থ কোথাকার।

নিখিলেশ বলল—তা হলে—

—তা হলে? —বলে দণ্ডায়মান নিখিলেশকে এক ঠেলায় জলে ফেলে দিল কুন্তলা!

ডিঙ্গি নৌকো। যথেষ্ট কাৎ হয়ে এক ঝলক জল উঠে গেল। পাশাপাশি দুলতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর স্থির হয়ে গল।

মাঝি হায় হায় করে উঠল। জল ওঠার জন্যে নৌকাডুবির ভয়ে, না একটা মানুষ ডুবে মরে যাচ্ছে এই কষ্টে—

কুন্তলা ঝুঁকে পড়ে দেখছে। চোখে ভয় না অনুশোচনা বোঝা গেল না। কৌতূহল? কিন্তু একটু পূর্বের কৌতুক নেই।

দীর্ঘ চুল জল ছুঁই ছুঁই। হাতের পুঁটুলী দুলুনি-থেমে-আসা নৌকোর পাটাতনে রাখা। চোখে দৃষ্টির একাগ্রতা একটুও না কমিয়ে গাছ কোমর বাঁধছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জলের ওপর, নিখিলেশকে ফেলে দিয়েছে যেখানটায়। চুল জড়িয়ে নিচ্ছে হাত খোঁপায়। শরীরে বেশে বাসে দীর্ঘতার বাহুল্য ছেঁটে নিচ্ছে। ফস্কা গেরোগুলিকে বাঁধছে বজ্র আঁটুনি দিয়ে। কিসের যেন প্রস্তুতিতে। রণরঙ্গিনী মূর্তিতে। কার সঙ্গে সংগ্রামে—

জল অগভীর। খানিকটা অর্থাৎ হাত তিন-চার তফাতেই ঢালু চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। সেই ঢালু বরাবর টানলে হাত ছ-সাতের বেশী গভীর হওয়া উচিত নয় জল।

কুন্তলা চেয়ে আছে নির্নিমেষ। চোখে অপলক দৃষ্টি!—একি ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে কেন! তলিয়ে প্রথমটায় যাবেই। শরীরের চেয়েও মাথার ওজন বেশী। প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষ—সাঁতার যাদের চেষ্টা করে শিখতে হয়। আর মাথার মধ্যেই ভগবান দিয়েছেন নাক। সেই নাককে জলের ওপর জাগিয়ে রাখা বা রাখার চেষ্টার নামই সাঁতার।

যেন উঠছে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ-হ্যাঁ ঐ তো! গায়ের জামাকাপড়-গুলো ভিজে দশমণ ভারী হয়ে উঠেছে। মুশকিল হচ্ছে সেখানেই।

এ কি! উঠতে উঠতে আবার তলিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। আর নয়! বিপদ হতে কতক্ষণ!

ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল কুন্তলা। জলের সারফেসের অল্প খানিক তলা থেকে নিখিলেশ দেখতে পেলো সব।

এই অবসরে খানিকটা ওপরে উঠে এক বুক নিঃশ্বাস ভর্তি অক্সিজেন নিয়ে আবার ডুব মারল। হাঁচোড় পাঁচোড় করতে লাগল জলের তলায়। যেন দম নেবার চেষ্টায়।

সকালবেলায় জলকেলির লীলা রঙ্গ দেখে এতোক্ষণ মনে মনে হাসছিল মাঝি। প্রকাশ্যে হাসল এইবার। কিছু পয়সা প্রাপ্তির ওপর উপরি পাওনা হল এই দৃশ্য। লক্ষ্যের উপর উপলক্ষ্যের মতন।

ত্বরিতবেগে জলকন্যা মারমেডের গতিতে গিয়ে নিখিলেশকে ধরে ফেলল। ডুবন্ত মানুষের মতো ডুবে যাচ্ছে তখন নিখিলেশ।

বুকের জামাটা ধরেছে কুন্তলা। আরো গা এলিয়ে দিয়েছে নিখিলেশ। হাত পা লটপট করছে। যেন মৃত্যুর সুমুখে জীবিতের শেষ বার জীবনের আকুতি।

তখনও কয়েক সেকেণ্ডের অক্সিজেন ফুসফুসে পোরা। কলার ধরে নিখিলেশের মাথাটা জলের ওপর জাগিয়ে ধরল কুন্তলা। খানিকটা কৃত্রিম এবং খানিকটা আসল কাশি কাশল নিখিলেশ। ঐ তালে আর এক ফুসফুস ভরতি অক্সিজেন জমা করে নিয়ে আবার ডুবে যাবার ভাণ করল।

নিখিলেশের এক একবার সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে হতে লাগল।

নৌকোর ওপর কুন্তলার যে চেহারা দেখেছিল এ তার চেয়ে শতগুণে মারাত্মক। জলের তির্যকে অপূর্বতর হয়ে উঠেছে কুন্তলার মুখ। আরশি প্রান্তের প্রিজমে মুখের ভগ্নাংশ যেমন শুধু অপরূপই হয়ে ওঠে না চোখ যেমন শুধু দ্বিগুণ বড়োই হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে মেশে রামধনু রং—এ ঠিক তেমনি। একরাশ বাঁকা বাঁকা চুল। অসহায়ের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে প্রায় নিস্তরঙ্গ দীর্ঘতায়। ডাঙ্গায় হাওয়ার রাজ্য। শরীরের সঙ্গে শাড়ীতে হাওয়ার আড়াল থাকে ডাঙ্গায়। বুকের সঙ্গে জামার তাই অসহযোগ। এই জলের রাজ্যে হাওয়াকে হটিয়ে দিয়েছে জল। জামা কাপড় ভিজিয়ে শুকনো অসচ্ছতাকে দিয়েছে আর্দ্র স্বচ্ছতা। জলছবির সুষমা। উঃ কুন্তলার শরীর কি সুগঠিত! কি সুঠাম! 'কাফ মাসল' দুটি কি সুডৌল।

আর চাইতে পারল না নিখিলেশ! চোখ বুজিয়ে ফেলল। মনে মনে বলল—হে সূর্য, হে সহস্র কিরণ, আজ এক মুহূর্তের জন্য রাহুগ্রস্ত হয়ে অন্ধকার করে দিতে পারো না সব। শুধু একটি মুহূর্তে!

তাতেও নিস্তার নেই। ছোঁয়াটা এই জলের ঠাণ্ডার মধ্যেও অদ্ভুত উষ্ণ। জীবন দাত্রীর গাঢ়তা তাতে। তেমনি উষ্ণ। আর আশ্চর্য হয়ে গেল নিখিলেশ। দেখতে অমন ঝাঁসির রাণী, ছোঁয়াটা কিন্তু আশ্চর্য নারী-নরম। আশ্চর্য নরম কুন্তলার গা।

মরে যেতে লাগল নিখিলেশ।

মরে যেতে যেতে এক সময় পায়ে ঠেকল ডাঙ্গা। একটু পরই হাত থেকে ছুটে গেল নরম স্বপ্ন। তাকে কোমর জলে ডাঙ্গা পাইয়ে দিয়ে নিখিলেশের চোখের সামনে ওপরে উঠে গেল মূর্তিমতী মৃত্যু। বেশ-বাস ঠিক করতে করতে। জল ঝরিয়ে ফেলতে, কাপড়-জামা থেকে। ওপরে উঠে কাপড়-জামা নিংড়োতে লাগল কুন্তলা।

আস্তে আস্তে নিখিলেশও উঠে এলো ওপরে।

না একটু লজ্জিত, না একটু অপ্রস্তুত, কুন্তলা বলল—কী ভানই করতে পারো লেশ, আমি তো ভাবলুম গেলেই বুঝি ডুবে।—এখন

উপায় ? এনেছি তো মোটে তোমার এক সেট জামা-কাপড়। আমি পরি কি ? সার্ট পরে সং সাজবো নাকি শেষে !

—সে কি ? পুঁটলীতে আমার জামা-কাপড় নাকি ? কি আশ্চর্য ! আমাকে ডুবিয়ে মারতে তৈরী হয়েই এসেছিলে ! সাংঘাতিক মেয়ে তো তুমি ! —সত্যিকার অবাক চোখে চাইল নিখিলেশ।

এইবার গম্ভীর হয়ে গেল কুন্তলা—তা একটু সাংঘাতিক বটে ! ডুবিয়ে মারতুম না ঠিকই। সাঁতার না জানলে নাকানি চোবানি খাওয়াতুম নিশ্চয় ! সাঁতার যাতে শেখো। অকম্মাকে মানুষ করতে হবে না !

কিংকর্তব্য অল্প অল্প দুলছে নৌকোর সঙ্গে মাঝি। পাড়ের কাছে এসে।

কুন্তলা বলল—পুঁটলিটা দিয়ে যাও তো মাঝি !—বলেই কি যেন খুঁজতে লাগল আঁতি পাঁতি। হাতড়াতে লাগল সর্বাঙ্গের ভিজে জামা কাপড়।

—কি হারালে ? —শুধোল নিখিলেশ।

—তোমাকে ডোবাবো বলে চাবটা নিজে নিয়েছিলুম ক্যাশ বাক্সর। মনে আছে ?

হেসে ফেলল নিখিলেশ—ওরে বাবা—ওয়েল প্ল্যানড্ মারডার ! কী ডাকাত মেয়েছেলে রে বাবা ! খুব বেঁচে গেছি যা হোক !.... নমস্কার তোমাকে ! আর বেরোচ্ছি না তোমার সাথে। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে আজ।

চোখের কোণে তাকিয়ে জলপরী বলল—সেটা তোমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। করে আমার ইচ্ছের ওপর। বুঝলে হাঁদারাম ! লেশ তো একেবারেই 'লেস', বুদ্ধি 'লেস' !

একবার চোখ বুজতেও বলল না নিখিলেশকে। গঙ্গার ঘাটে যে অবলীলায় কাপড় বদলায় মেয়েরা, তারো চেয়ে সহজে শাড়ী বদলাল কুন্তলা। শাড়ী বদলে ধুতি। ওপর অঙ্গে পরবার পাওয়া গেল না কিছু। শাড়ীর জায়গায় ধুতি পরা যায়, ব্লাউজের স্থলে সত্যি আর গেঞ্জী শার্ট পরা যায় না। নিচের অঙ্গেও জুটলো না অন্তর্বাস।

শাড়ী নিংড়োন জল দিয়ে দিয়ে পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলল। চাবি পাওয়া গেল শাড়ীর আঁচলে বাঁধা। জল ঝরানো নিংড়োন ব্লাউজটাকে লম্বালম্বি গামছার ভঙ্গীতে ধরে হাত দুটো পিঠের পিছনে নিয়ে গেল কুন্তলা। মাথাটা চিতিয়ে ফটাস ফটাস আওয়াজ করে দুহাতে ধরা ব্লাউজটাকে জলসিক্ত চুলের ওপর বাড়ি মারতে লাগল। চুলকে নির্জলা করে যে ভাবে মেয়েরা।

নিখিলেশই পরামর্শ দিল—নৌকো আর ভিজে জামা কাপড় নিয়ে ঘাটে যাই আমি। বসে থাকো তুমি পাড়ে। রোদ পোহাও। আমি গিয়ে রিকশা পাঠিয়ে দিই।

এক চাপড়া ঘাসের ওপর জাঁকিয়ে বসেছে তখন কুন্তলা।

পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল কুন্তলা। জনমানবহীন নদীতীর। কাটা ফসলের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে অপরিচ্ছন্ন মাঠের মুখ।

—তার চেয়ে এক কাজ করো নিখিলেশ। আমি বসি! চট করে একটা কাপড় জামা কিনে নিয়ে এসো আমার। দেখি তোমার রুচি!

ভিজে চুল থেকে টপ টপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে তখনও। ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চিজেল কাট সেই মুখে কপাল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে এক এক ফোঁটা। চিরন্তনী ঈভের মুখে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে কল্পান্ত-কাল। তারপর পিছলে পড়ে যাচ্ছে।—স্থির অচঞ্চল বসে রইল কুন্তলা।

সত্যি আর বাড়ী পর্যন্ত যাওয়া দরকার হল না। ঘাটেই পাট ব্যবসায়ী পাটোয়ার কালীচরণ সাধুখাঁর সঙ্গে দেখা। গোটা পনেরো পাওয়া গেল।

শান্তিপুরী শাড়ী নিল একখানা, শাদা খোলের। পাড়ে হরিৎ ফুলের উৎসব। ব্লাউজও শাদা রংয়ের ওপর সাদা মাটা কাজ। হাতে আর গলায়।

ফিরে গিয়ে বলল কুন্তলাকে—দুটো পরীক্ষা দিতে পারলাম না এক সঙ্গে একই দিনে। সাঁতারের দিয়েছি। পাশ করেছি কিনা জানি না। রুচির পরীক্ষাটায় জুৎসই করতে পারলাম না। বুঝতেই পারছো—এথির অভাবে। বলো তো আর একদিন দিই।

সবটাই কি তাকে সাঁতারের পরীক্ষা নেওয়া! আর তার জন্যে এই বিস্তৃত আয়োজন! এ তো বড়ো সাংঘাতিক। তাকে বললেই হতো, সাঁতরে যেতে হবে ওপারে। অবশ্যই, কাল দু-দুবার সাঁতার জানে কিনা এই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল কুন্তলা। আর দুবারই চাপা পড়ে গিয়েছিল। হয়তো কুন্তলা ধরে নিয়েছিল—সাঁতার জানে না নিখিলেশ আর তাই এই পরীক্ষা।

আজই আসার পথে কুন্তলা তাকে বলেছে—অত কি ভাবছো? ভাববার সময় পাবে বিষয়ও পাবে। হয়তো আজই পেয়ে যেতে পারো। এই তবে সেই ভাবনা!

এটা কি সাঁতারের পরীক্ষা, না, নিখিলেশ কেড়ে খেতে পারে কিনা তার! আজই এই কথাও বলেছে কুন্তলা। হাতের কাছে এগিয়ে দিল কেউ, খেলে। কেড়ে না খেলে পাওয়া যায়?

—না, ভাবনার প্রচুর উপাদান জুটিয়ে দিয়েছে আজ কুন্তলা। জীবনে ভাব-ভাবনা কিছুই ছিল না। ভাবুক করে তুলল তাকে।

রিকশায় বসে বসে ভাবছিল নিখিলেশ। লক্ষ্য ছিল না কুন্তলার মুখে। থাকলে দেখতে পেতো, আজকের আকাশের মতোই পাৎলা মেঘের আস্তরণ সেখানে হাসির।

কুন্তলা খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলো—ভাববার বিষয় পেলে লেশ!

কুন্তলাকে বিস্মিত করে দিয়ে নিখিলেশ বললো—তোমার কতো চুল, তাই ভাবছিলাম।

কুন্তলা অবাক হওয়াটা লুকিয়ে ফেললো। বললো—তাই নাকি! আর কিছু? ডুবিয়ে মারছিলাম তার কথা ভাবছো না?

রিকশা থেকে নামতেই প্রিয়র চোখে বিস্ময় আবিষ্কার করতে কষ্ট হলো না দুজনের কারো।

অদ্ভুত পোষাক কুন্তলার। উপর অঙ্গে ব্লাউজ আনকোরা নতুন। চুলের ওপর হাওয়া নয়, অত্যাচার চালিয়েছে জল। গুছিতে গুছিতে

অগোছালো। দড়ির মতো মুড়ে মুড়ে আছে। টস টস করে জল ঝরছে। সিঁথি উল্টে পাল্টে বাঁকাচোরা। অদৃশ্যও।

বিপর্যস্ত অবিন্যাস শরীরে কাপড় চোপড়ে সর্বত্র। ঝড় বয়ে গেছে যেন। কুন্তলার একার নয়, নিখিলেশেরও জামা কাপড় ভিজে।

প্রিয়র চোখে জিজ্ঞাসা, অবাক হয়ে রইল। তাই দেখে গম্ভীর হেসে বললো কুন্তলা—ময়লা কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে এলাম। মলিন বসনের সঙ্গে মলিন অহঙ্কারও ছেড়ে এলাম। ডুবিয়ে দিয়ে এলাম ঘূর্ণীর জলে। দিনের কাজে ধূলো লেগে অনেক দাগে দাগী হয়েছিল দেখিস নি!

সারাদিন কাজের ফাঁকে নিভৃতি খুঁজেছে নিখিলেশ। একান্তে চেয়েছে প্রিয়কে। প্রিয় তার এবং কতক পরিমাণে সে প্রিয়র, মনের বোঝা নামিয়ে হাল্কা হওয়ার পাত্র। পথের ধারের চটি। কাঁধের বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নেবার জায়গা।

কিন্তু প্রিয়কে চাই একান্তে। কুন্তলার শ্রুতির আওতায় নয় নিশ্চয়ই। সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না।

পাওয়া গেল মধ্যাহ্নের পর। শারীরিক ক্লান্তিতে না মানসিক অবসাদে জানা গেল না। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর কুন্তলা শুয়ে পড়লো। পশ্চিমের জানলা দিয়ে ফাল্গুনী হাওয়ায় সওয়ার হয়ে এলো মিঠে রোদ। দেহে মনে হাত বুলোতে লাগল স্নেহের—। আরাম দিতে লাগল অবসাদে।

রিকশা থেকে নেমে পর্যন্ত চিন্তিত দেখাচ্ছিল কুন্তলাকে। কথাবার্তা বলেনি বিশেষ।

কুন্তলা শুয়ে পড়লে প্রিয় গিয়ে বসল শিয়রে। হাত বুলোতে লাগল, মাথায়, চুলে। টিপে দিতে লাগল কপাল। কুন্তলা মুখে বলল—'মাথা টিপতে হবে না, খেয়ে নিগে তুই, বেলা গেছে—। বেশ বোঝা গেল, আরাম পাচ্ছে সে। কপালের দুপাশের শিরা দুটো দপদপ করছিল। বোঝাই যাচ্ছিল—প্রবল মাথা ধরেছে তার।

অল্পকালের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল কুন্তলা।

যতক্ষণ না ঘুমোল, একটা চিন্তা ঘুর ঘুর করতে লাগল মাথায়—গুবরে পোকার মতো বোঁ বোঁ আওয়াজ করে। চিন্তাটা এই—

মাকড়সা জাল পাতে যখন, তখন সে জানে না নিরীহ পোকারাও ধরা পড়বে এতে। জাল পাততে না চাইলেও তার স্বভাব তাকে দিয়ে জাল পাতায়। নিজের অজানতে কখন আপনি আপনি তন্তু রচনা করে বসে থাকে ঊর্ণনাভ। তার খাদ্য অখাদ্য দুরকমের পোকা এসেই ধরা পড়ে তখন। তার ইচ্ছায়, ইচ্ছার অভাবেও।

ঊর্ণনাভ এক কাজ করতে পারে, সেইটুকুই মাত্র তার হাতে আছে। নিরীহ পোকাটাকে না খাওয়া। কিন্তু জালের সুতোয় সুতোয় হাত পা জড়িয়ে গেছে যার তাকে মুক্ত করে দিতে পারে না। মাকড়সা তাকে না খেলেও জালে জড়িয়ে ছটফট করতে করতে না খেয়ে মরবে সে।

প্রিয়কে কাছে পেয়ে চুপি চুপি কথা বলতে লাগল নিখিলেশ। তার চুপি চুপি কথা বলাটা ঝি চাকর-বাকরদের চোখে বেমানান না ঠেকে সেইজন্যে উপেনকে ডেকে প্রাণবল্লভকে ডেকে বলে দিল নিখিলেশ। উপেনের হাতে কাঁসার থালা গেলাস ধোবার সময় কাংসকণ্ঠে না চেঁচায়, নোড়াটা শিলের ওপর মাথা কোটা বন্ধ রাখুক খানিকক্ষণ! ইত্যাদি! কারণ, দিদিমণি ঘুমোচ্ছে।

প্রিয়র হাতে স্লিপ কাগজ। হিসেবের ইকড়ি মিকড়ি তাতে। ক্যাশ কাউন্টারের নিচে দাঁড়িয়ে প্রিয়। নিখিলেশের সামনে হিসেবের খাতা, হাতে মুখ শুকনো কলমের ভান।

কেউ ঘরে ঢুকলেই প্রিয় বলে ওঠে—মাও লেখো ডালচিনি চার আনা! তেজপাতা লিখেছ চার পয়সা? জিরে লেখো—

—তোমার যতো কথা! ডুবিয়ে মারতে চাইবে কেন? তাতে দিদির স্বার্থ কি? মনে কোরো না কিছু নিখিলদা, একটা কথা বলি তোমায়।

তুমি আমি পরগাছা হুজনেই। হুটো আঙুল দিয়ে ধরে—ব্যাস উপড়ে ফেললেই হোলো। আটকাচ্ছে কে?

—বলে আলতো ভাবে অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী এক করে পরগাছা উৎপাটন ক্রিয়াটা মুদ্রা করে দেখাল। বলে চলল প্রিয়—

—তার দরকার কি? মুখের হুটো কথা। মাত্তর হুটো। 'পথ ছাখো'। ব্যস। পরের বেলাই তোলো হাঁড়ির বদলে ছোট্ট হাঁড়িতে রান্না চাপাবে পান্নু ঠাকুর।—তা নয়, অন্য কিছু—

বলে প্রিয় যেন হাসলো, মনে হোলো নিখিলেশের।

নিখিলেশ বললো—অন্য কিছু! কি সে অন্য-কিছু?

প্রিয় বলল, ঠোঁট উলটে —কী জানি।

নিখিলেশ বলল ঃ জানো তুমি। অন্য কিছুটা কি, তা তুমি জানো, বলছ না!

প্রিয় বলল—ডুবিয়ে মারা নয় এইটেই জানি। অন্য কিছু। এইটুকুই বলতে পারি।

নিখিলেশ বলল, আবেগের বশে যে সে প্রিয়র হাত চেপে ধরেছে, সে-খেয়াল নেই। —বলতেই হবে তোমাকে। চালাকি পেয়েছো?

হাত ছাড়াবার চেষ্টা না করেই প্রিয় বলল ঃ ভ্যালা মুশকিল। আমি কি জানি তার! তা হলে কি নিজেও লাফিয়ে পড়ে দিদি? এ তো সহজ কথা। এটা বোঝা তো কঠিন নয়। সেই কথাই বলছিলাম।

—না-না-মোটেই তা নয়। শীগ্গির বলো—কি ভেবে বলেছ?

—বলছিলাম, আমার মনে হয় দিদিও ডুবতে চায়। নিখিলেশ-কলসী গলায় বেঁধে ডুবে মরতে চায় দিদি। কালিদয়। কলঙ্ক সাগরে ডুবে মরতে চায় দিদি—

বলতে বলতেই এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো—আমার স্লিপ তুমি নিচ্ছ কেন? হিসেব মেলাতে পারছ না, পারছ না—। ডান বাঁ করেছে কেউ। তাই মিলছে না ডাইনে বাঁয়ে—

দরজায় দাঁড়িয়ে আলোক।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল—নিখিলবাবু, দু-নৌকোয় চেপে চলেছেন। মন স্থির করে একটাকে ধরুন, একটাকে ছাড়ুন। নইলে—ঠাকুর বিসর্জনের মতো,—দুদিকে দুটো সরে যাবে। মাঝখানের ফাঁকে প'ড়ে ডুবে মরবেন আপনি।

নিখিলেশ গম্ভীর হয়ে গেল। জবাব দিল : এ সব কি বলছেন আপনি? এ সবের মানে কি আলোক বাবু?

ঠোঁট বাঁকিয়ে শ্লেষটাকে দ্বিগুণ করে জবাব দিল আলোক—মানে না-বোঝার মতো বোকা বা ছেলেমানুষ কোনোটাই নন আপনি। বেশ বুঝছেন আমি কি বলছি! আগুন নিয়ে খেলা করছেন।—আর একটু সরল করে বলি, বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার আজ। এইবার ক্লিয়ার হল তো!

আর ঘাঁটাবার সাহস হল না। আর উপায়ও রইল না তার। সগু ঘুম ভাঙা ফোলা ফোলা চোখে ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে কুন্তলা।

—আলোক বাবু কতোক্ষণ!

সে রাত্রে ঘুমকে চোখের পাতায় ভিড়িয়ে আনতে বেশ বেগ পেতে হল নিখিলেশকে। বেগ পেতে হল, সময়ও লাগল ঢের—

ভিতরের ঘরে যে দুজন শুয়ে, ওরাই বুঝি আগুন। ওরাই বুঝি দু নৌকো! এতে কি হাত আছে তার! প্রকৃতি তাকে নিয়ে পুতুল খেলছে। তার ভালো মন্দ তো তার নিজের বশে নেই! স্রোতের ফুল—ভেসে ভেসে চলেছে স্রোতের মর্জি মতো—

সব চিন্তা আস্তে আস্তে পথ ছেড়ে দিল একটি চিন্তাকে। কুন্তলার এই সর্বনেশে বিলাস কেন? তবে কি প্রিয়র বিশ্লেষণই ঠিক। প্রিয়র বিশ্লেষণ না আলোকের শ্লেষ! কোনটা ঠিক?

তারো ওপরে ভেসে উঠল একটি নারী মূর্তি। ভিজে কাপড় গায়ে লেপ্টে বসেছে—শরীরের কনটুর স্পষ্টতর। কি উদ্ধত আর সুগঠিত দেহ সৌষ্ঠব। কী কঠিন বাঁধুনি। যৌবনের লতা দিয়ে কে যেন একটি

পুষ্ট শরীর বেঁধে রেখেছে—চেপে চেপে কেটে কেটে বসে গেছে—মাংস পিণ্ডকে উঁচু নিচু রেখার সুষমা দিয়ে।

কুন্তলার চুলের জট আজকাল রোজই ছাড়িয়ে দেয় প্রিয়। চিন্তার জট জুটিয়ে নিয়ে জটিল হয়ে পড়ে কুন্তলা নিজেই। সে জটিলতা ছায়া ফেলে যায় মুখের রেখায় রেখায় কুটিল হয়ে থাকে মুখের রেখা, কুঁচকে থাকে ভ্রূ—

অতীতের কথা মনে পড়ে তার। অতীতে বর্তমানে টানা পোড়েনে ময়ূরকণ্ঠী রং বোনা চলতে থাকে। বুনে চলে তার মন। অতীতের সবুজ আর বর্তমানের লাল। সতীনাথকে মনে পড়ে যায় তার। মনে পড়ে রোজই। সর্বদাই। তার পক্ষে তো নয়ই, কারো পক্ষেই সতীনাথকে ভোলা সম্ভব নয়।

কী যেন দিনরাত ভাবে আজকাল কুন্তলা। প্রায়ই চিন্তিত, চুপচাপ। কথা বলা ছেড়েই দিয়েছে সে।

আড়ালে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করে প্রিয়কে—কী হোলো বলো তো! মানুষটা হাসতে ভুলে গেল? কথাও কয় না। কেমন যেন চুপচাপ ঝিম মেরে গেছে—। সেই হাসিখুসী হৈ হৈ বাজ মেয়ে!

বেশ গম্ভীর হয়েই বলে প্রিয়—অসুখ করেছে দিদির। জানো না?

চিন্তিত হয় নিখিলেশ—অসুখ! কই জানি নে তো! কী অসুখ? ও তাই এতো চুপচাপ! মেয়েদের কোন অসুখ বুঝি?

গাম্ভীর্যের মাত্রা কমতি না করেই বলে প্রিয়—না, এ অসুখ ছেলেদেরও হয়। ছেলেদের হলে তারা হৈ হৈ করে চেঁচামেচি করে, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর মেয়েরা! অসুখ যতো জোর, ততো চুপ, ততো চেপে যায়।

নিখিলেশ বোধ হয় বুঝতে পারে কথাটা। তবু বাজিয়ে নেয় একবার—কি রকম! সে আবার কি ব্যারাম?

প্রিয় বলে—তুমিও ডাক্তার দেখাও, তোমারও হয়েছে মনে হচ্ছে

আমার। ক্ষয়-রোগ এক রকমের। ছোঁয়াচে মানে চোখ-ওঠার মতন।
চোখে চোখে দেখলেও এ অসুখ হয়—

নিখিলেশ বলে—তোমার হার্টটাও এগজামিন করানো উচিত।
শুধু কি তোমার? তোমার, আলোকবাবুর। আলোকবাবুও মাঝে
মাঝে আসেন যে! আসেন, থাকেন! চোখে চোখ পড়ে তোমার—।
হার্টে ক্ষয় রোগ—হার্ট ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া সাংঘাতিক ক্ষতি কারক।

বিরাট একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে প্রিয়। বলে—গরীব দুঃখীকে নিয়ে
ঠাট্টা করতে নেই, জানো না?

শুক্রবার দিনই জামা দুটো ডেলিভারি দিল ফিটওয়েল। গিয়ে
নিয়ে এলো নিখিলেশই। দরকার হলে টুকিটাকি ঠিক করে দেবার
সর্তসাপেক্ষে—

কুন্তলা বলল ঃ পরো তো, দেখি—কেমন হলো!

নিখিলেশ পরতে পরতে বললো—আমার গায়ে—?

কুন্তলা নিখিলেশকে নিরীক্ষণ করে দেখলো বার কয়েক। পা থেকে
মাথা। মাথা থেকে পা। কথা বলল না।

খানিক পর বলল—কাচতে দিয়ে দাও। ভালো করে কাচে যেন,
বলে দিও—

তিনদিন পর কুন্তলা বলল, জামা দুটো নিখিলেশরই। অবাক হবার
পালা এলো দুজনেরই। নিখিলেশ অবাক হল দুই কারণে। জামা করে
দিল তাকে কুন্তলা। কেন? দিলই যদি তো এতো ভালো জামা কেন?
দ্বিতীয় কারণ—মাপ দেবার সময় পা থেকে মাথা বার কয়েক দেখে দু
ইঞ্চি লম্বায় বড়ো—এই ভান করল কেন? এটা বোঝা কিন্তু খুব সহজ
ছিল। একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারত নিখিলেশ। দোকানীর কাছে
ধরা দিতে চায়নি কুন্তলা। যদি কেউ চিনতে পেরে থাকে তাদের কাছে
সত্যিকার পরিচয় চাপা থাক না। বাহ্যিক বাড়াবাড়িতে দরকার কি!

কুন্তলা অবাক হল আর এক কারণে—

নিখিলেশ বলল—তুমি দিলে, মাথা পেতে নিলাম। ভবিষ্যতে এভাবে আর অপমান না করলেই খুশী হবো।

কুন্তলা বলল—অপমান? আমার এখানে আছো, একটি পয়সা নাও না হাতে ধরে। আমিও হাতে করে দিতে ভরসা পাই নে। তোমার অতীতটা কোন সময়েই ভুলে যাই না। তোমারও তো জামা দরকার। —না লেশ, অপমান তোমায় করতে চাই নি। সে সাহস বা ইচ্ছে কোনটাই আমার নেই।

নিখিলেশ বলল—এক পয়সা রোজগার করি না। মুরোদ নেই। এতো ভালো জামা সাজে না আমার!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুন্তলা বলল—ঠিকই। দাসপাড়া রোডের দাসদের বাড়ীর ছেলেকে অর্ডিনারী আদ্দি পপলিনে মানায় না।

কুন্তলার মানব জমীনে নিখিলেশ-মূল আরো গভীরে পৌঁছল!

এই হয়। আঘাতের সময় মনে থাকে না আঘাত করছি। প্রত্যাঘাত আসতে পারে। মনে হয়, উচিত কাজ করছি। আমি কি ভীরু দুর্বল! চুপ করে, মুখ বুজে সহ্য করে যাবো! কেন? আমি কি মানুষ নই?

তারপর দেখা যায় নিজের বুকে এসে বাজছে বেশী। আঘাত যাকে করলাম, সে হয়তো সশব্দে ফেরত দিল না। অনেক সময়েই দেয় না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হল ফেরতই দিল না। চুপ করে রইল। কিন্তু চুপ করে থেকেই কঠিন প্রত্যাঘাত করল আহত। সহ্য করাটাই আঘাত। প্রত্যাঘাত হয় আরো কঠিন, আঘাতপ্রাপ্ত যদি চোখের জলে ফেরত দেয়।

নিখিলেশের কথার উত্তরে দু-একটা কথা বলেছিল কুন্তলা। দু-একটাই মাত্র। সোজাসুজি তাকিয়েছিল। সে চোখে নীরব প্রত্যাঘাত ছিল।

সারা বিকেল সুযোগ খুঁজেছে নিখিলেশ কিছু বলার। দোকানের কাজে লোকেরা ভিড় করে এসেছে। নিভৃতির সম্ভাবনা হারিয়ে গিয়েছে।

গোটা সাড়ে সাতেকের সময় সুযোগ এলো। ফাঁকা হয়ে গেল ঘর। সাময়িক।

মন্থর পায়ে মাঝখানের হল ঘরটা পার হচ্ছিল কুন্তলা। উদ্দেশ্যহীন ভাবে। যাচ্ছিল নিজের শোবার ঘরের দিকে।

কাউন্টারের সিংহাসন মাঝ বরাবর। নিখিলেশ আস্তে বলল—খুব ব্যস্ত নাকি? একটা কথা ছিল।

সন্ধ্যার পর মেয়েদের চোখে এক রকমের স্বপ্ন নামে। বিয়ে হয়েছে যাদের স্বামীর চোখে সে-মেয়েরা তাকায় সেই স্বপ্নালস দৃষ্টিতে। বিয়ে যাদের হয় নি, পুরুষের চোখে তারা তাকায় সেই স্বপ্ন-দেখা চোখে।

তার চেয়ে বলা ভালো স্বপ্ন-খোঁজা চোখে।

মুখ না তুলে নিজের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অল্প উঁচুতে চাইতে গেলে চোখে এমনিতেই এক রকমের বিহ্বলতা নামে। কুন্তলা চোখ তুলে তাকালো। মদালস হয়ে গেল দৃষ্টি। ইচ্ছে না থাকলেও আপনি হয়ে গেল।

—আচ্ছা নিখিলেশ, খাঁচা ভালো, না আকাশ?

কুন্তলা কিছু গম্ভীর। নিজের প্রশ্ন গুলিয়ে গেল নিখিলেশের। বলল—অ্যাঁ? হ্যাঁ। এক কথায় উত্তর দেয়া মুস্কিল। তবে মনে হয়, খাঁচার মধ্যে আকাশটাকে ঢোকাতে পারলে খাঁচাই ভালো। আকাশটাকে মানে তার বিশালতাকে।

—কেন?

তরল হবার চেষ্টা করছিল নিখিলেশ। সেইটে বজায় রেখে দিল। বলল—মুখের কাছে অনায়াসে খাওয়াটা পাওয়া যায়। ফরফর করাও যায়। শেখানো বুলি শোনানো যায় মালিককে। শুনিয়ে খুশী করা যায়। এক মুঠি দানা বেশী পাওয়া যায়। মন্দ কি!

খুশী হল না কুন্তলা। বলল—প্রিয়কেও জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন। সেও বলেছিল, খাঁচাই ভালো। কেন বলো তো, তোমরা সকলেই খাঁচা ভালোবাসো কেন? মুখের কাছে তৈরী খাবার পাওয়াটাই কি বড়ো কথা?

নিখিলেশ চোখে চোখ রাখতে সাহস পাচ্ছিল না। আরো দুর্বল হয়ে পড়বার ভয়ে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখার লোভে চোখে চোখে তাকালো কুন্তলার।

মাথার সামনের দিকটা আঁচড়ানো। হাত খোঁপা গড়া। সামনের চুলে ঢেউ ফুটে আছে ছোটো ছোটো। পেট্রোমাক্সের আলো ঠিক নিচেটায় অন্ধকার গুহা রচনা করে রেখেছে। পাশ থেকে আলো এসে পড়েছে কুন্তলার মুখে চোখে চুলে। তারাভরা আকাশের তলায় নদীর বিস্তৃতি ভয়ঙ্করই লাগে। ছোট ছোট ঢেউয়ে তারার ঝিকিমিকি ছায়া ফেলে। আলো আঁধারের সে এক ভালোলাগাময় বিভীষিকা।

হাল্কা রঙের ব্লাউজ। রঙটাকে বোধ হয় 'ফণ' কলার বলে। সবুজ ভেলভেট পাড়, সাদা খোলের পাতলা শাড়ী। প্রতিমার মতো মুখ। মুখের আদল তেমনি ছেনি কোঁদা। আলো পড়েছে এক পাশে। আর এক পাশে তাই ঘোর অন্ধকার। ঠিক কেমন জানেন! মানব চরিত্রের রহস্যের মতো। আমি বাইরে থেকে আপনাকে যেমন বুঝি। খানিকটা বোধ হয় খুব ভালো চিনি আপনার চরিত্রের, বাকিটা একটুও চিনি না। মনে করি সবটাই চিনি।

নিখিলেশ বলল—খাবার পাওয়াটা খুব ছোট কথা নয়। তাও আবার বিনা আয়াসে। না খেলে বাঁচব কি করে? প্রাণ-পাখীই তো খাঁচা ছাড়া!

বাঁ কনুইটা কাউণ্টারে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল কুন্তলা। ওই ভঙ্গীতে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। নিখিলেশ বলল—তুমি ওভাবে দাঁড়িয়ে! একটু সবুর করো, নেমে আসছি। তুমি নিচে দাঁড়িয়ে আমি টঙে চড়ে; খারাপ লাগছে।

কুন্তলা শুধু বলল—না।—কি বলছিলে?

—বলছিলাম কি—বলে নিখিলেশ সবে সুরু করেছে দরজায় পায়ের আওয়াজ উঠল। দুজনেরই নজর গেল দরজায়।

নিখিলেশ বলে উঠল—মিস্টার চৌধুরী, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। আমারও খুব বেশী দোষ নেই। আপনি বোধ হয় ইতিমধ্যে এদিকে আসেন নি আর। রোজ খোঁজ করেছি আমি। একেবারে রোজ, একটি দিনও বাদ দিই নি।

অবাক হল বসন্ত। চোখ দুটো আয়ত হয়ে গেল তার। কুন্তলা সামনে দাঁড়িয়ে। চন্দ্রাবলীর নামটা উচ্চারণ না করে বলল—কই ও তো বলে নি—

নিখিলেশ জানত, চন্দ্রার কাছে কেউই যায় এটা বসন্ত চায় না। অবাকের চেয়ে তাই বিরক্ত হল বেশী। তার খোঁজ নিতে নিখিলেশ চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করেছে রোজ। বসন্ত হয়তো তাই ভেবেছে। বাড়ী গিয়ে নির্যাতন করবে চন্দ্রাকে। মেরেই বসবে হয়তো। দুর্ভাবনা হল নিখিলেশের।

নিখিলেশ বলল —আমি যাই নি তো। কেষ্টাকে পাঠিয়ে খবর নিতুম। কাজেই ও জানত না, খবরটা কে চাইতো।

খুব খুশী দেখাল বসন্তকে—ও, তাই বলুন।

—এই যে আপনার টাকা পনেরোটা। —বলে কাউণ্টার থেকে নেমে এল নিখিলেশ।

কুন্তলার মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে বসন্ত বলল—মোটেই আমি ও জন্যে আসি নি। আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট ছিল।

কুন্তলা ভিতরের ঘরে চলে গেল।

হাতসুদ্ধ টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বসন্ত বলল—ওটা ফেরত দিতে হবে না। আমার নাম জানেন তো—বসন্ত চৌধুরী! অমনি টাকা দেবার লোক নই! ওটা আপনার পাওনা হয়েছে।

—পাওনা? আমার? কি বাবদ?

আসল খুশীর কারণটা সত্যি বলতে পারল না বসন্ত। বলল—গুরু দক্ষিণা ওটা—

নিখিলেশ বলল—ভারী রহস্যের ব্যাপার তো! খুলে বলুন।··· চালাকি রাখুন, ধরুন টাকা। —বলে আবার প্রসারিত করল হাত।

বসন্ত বলল—আবার বলছি, আমার নাম বসন্ত চৌধুরী। ব্যবসা করে খাই—তাও পাটের। অমনি টাকা দেবার লোক আমি থোড়াই। শুনুন, একখানা গাড়ী কিনতে চাই। আপনার য়্যাডভাইস নিতে এসেছি। এটা হচ্ছে কনসালটেশান ফী।

হেসে ফেলল নিখিলেশ—ওরে কেষ্টা, উপেনকে বলতো—ছাখ তো—চপ কাটলেট কি আছে! 'কারি' আছে নাকি?…বসুন, বসন্ত বাবু।…হুঁ তারপর! একবার বলছেন কনসালটেশন ফী একবার বলছেন গুরু দক্ষিণা। ব্যাপারটা কি?

বসন্ত বলল—ছুটোই। গাড়ীটা কিনব কিনা, কতো দাম দেয়া যায়। তারই কনসালটেশন।

—সেকেণ্ড হ্যাণ্ড?

হো হো করে হাসতে হাসতে বলল বসন্ত—গাড়ী নারী কোনটাই ফাস্ট হ্যাণ্ড নয় আমার। ওই ভালো। দামে সস্তা। সস্তা বলে মমতা কম। ইচ্ছে না হলে, আর—ভালো না লাগলে বিদেয় করো লাথি মেরে। হায় আফশোস হবে না। এটা কি কম সুবিধের কথা।

আশ্চর্য না হলেও ব্যথিত হল নিখিলেশ। বসন্তকে যতটুকু চেনে তাতে আশ্চর্য হবার ছিল না। বসন্তরা এমনই—

নিখিলেশ বলল—তা তো ঠিকই—

বলার সঙ্গে সঙ্গে গুরগুর করে উঠল বুকটা। চন্দ্রা কেমন আছে কে জানে! এক পাড়ায় থেকেও খবর নেবার উপায় নেই। বাইরে থেকে খবর নিতে হয়, তাতে জানা যায় ভালো আছে সে। কিন্তু বাইরের চামড়া-মাংসটা ভালো আর নীরোগ থাকাই কি সব! সেটা কতোটুকু? চামড়া মাংসের খাঁচায় বন্দী স্পর্শকাতর, ছোট্ট ভীরু যে পাখীটা। তার খবর কি? সেটা যে এবেলা ওবেলা মরে!

কেষ্টা প্লেটে করে এনে ইতস্ততঃ করতে যাচ্ছিল, কার সামনে রাখবে। নিখিলেশ ইঙ্গিত করতেই কেষ্টা বসন্তর সামনে রাখল।

নিখিলেশ বলল—তারপর! কি গাড়ী? কি মেশিন?

বসন্ত বলল—তাতো বুঝলাম, এটা কি হোলো? সুদ নাকি?

চপে এক কামড় বসিয়ে বেশ তৃপ্তি পেল বসন্ত বোঝা গেল—এই বুঝি পাপা চপ। বাঃ কী সুন্দর টেস্ট, আর সাইজেও কত বড়ো। দাম কতো?

—কতো আবার? চার আনা—

—আর এই বুঝি কুন্তলীন কাটলেট?…নাইস, ফাইন, ফাস কেলাস, কী টেস্ট—

নিখিলেশ দেখল, চপটা এক কামড়ের বেশী এগোয় নি। লোভ সামলাতে না পেরে চপ শেষ হবার আগেই কাটলেটে আর এক কামড় মেরে বসে আছে বসন্ত।

প্রশ্নটা মনে করিয়ে বসন্তকে লোভের জগৎ থেকে গ্যারাজে এনে ফেলল নিখিলেশ—কি মেশিন বললেন না তো!

কথা বলতে অনিচ্ছার ফাঁকে ফাঁকে বসন্ত বলল—উলসী। উলসী মেশিন কেমন?

দুবার ভুল উচ্চারণ লক্ষ্য করে করে শুনল নিখিলেশ—উলসলী? উলসলী বোধহয় ইংলিশ মেশিনের সেরার দলের একটা! কি মডেল?

—মডেল? জানি নে তো—

—কোন সালের মডেল জানেন? কতো হর্স?

এতো গুলো নেতিবাচক জবাবকে এড়াবার দরকার হল বসন্তর বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কারের। বসন্ত বলল—অতোই যদি জানব বুঝব, আপনার কাছে আসব কেন তাহলে!….কবে দেখবেন গাড়ীটা?

নিখিলেশ বলল —আপনার যেদিন সুবিধে!

—কাল? কালকে আনতে বলি?

—বেশ তো, বেলাবেলি আনতে বলুন, যাতে নেড়ে চেড়ে দেখা যায়।

বসন্ত চলে যেতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো কুন্তলা।

হাতের মুঠো আলগা করে হাসতে হাসতে বলল নিখিলেশ—লাভ হল পনেরোটা টাকা। আমার মতো অকম্মারও রোজগার হল কিছু।

তারপর কি মনে করে, খুশী মনে টাকা ক'টা বাড়িয়ে ধরল নিখিলেশ। বলল—নাও, ধরো।

গম্ভীর হয়ে গেল কুন্তলা। হাত পেতে টাকা ক'টা নিল। বলল—আরো লাগবে—

অবাক হল নিখিলেশ—মানে?

—মানে—বিল তো নিজেই মিটিয়েছ তুমি। জামা তৈরীর বিল, ধুতির দাম। কতো হয়েছিল, মনে নেই? এর চেয়ে বেশী নিশ্চয়ই—

হাত থেকে একরকম নোট দুখানা ছিনিয়েই নিল নিখিলেশ—কে রেখেছে তোমার নাম কুন্তলা। তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল কুটিলা। মনিব না হলে তোমায় কি ডাকতুম জানো, ডাকতুম জিলিপি বলে।··· তোমাকে জামা কাপড়ের দাম ফেরত দিই নি। তোমায় দিয়েছিলাম আমার প্রথম উপার্জন। একটা গান আছে জানো? ওই ওরা গায় শুনেছি। আমার মল্লিকা বনে যখন প্রথম ধরেছে কলি, তোমারি লাগিয়া তখনই বন্ধু বেঁধেছিনু অঞ্জলি।

প্রিয়র বিশ্লেষণটা ভুলতে পারে না নিখিলেশ। মিলিয়ে দেখতে গেলে হয়তো খানিক মেলে খানিক মেলে না। প্রিয়র চেয়ে রূপে খাটো কুন্তলা। ময়াল সাপের ভয়াল আকর্ষণ, আকৃষ্ট কি টের পায়? তা হলে এগোবে কেন শিকার?

কুন্তলা বলে—জীবনটা একটা পথ চলা, একটা স্রোত। থেমে থাকা নয়। যেই মুহূর্তে কুয়োয় বা জলায় আটকা পড়ে সে, জল ঘোলা হতে থাকে তার। আর সেই আটকা পড়া জলে জন্মাতে থাকে শ্যাওলা আর দাম। শ্যাওলা আর দামই হচ্ছে জলের পায়ের বেড়ি। একবার পায়ে এই বেড়ি পরলে জল আর জল থাকল না। কাদা হয়ে গেল। কোথায় গেল তার পথ চলা কোথায় গেল চলার আনন্দ। ছিল জল ছিল স্রোত পায়ে ছিল নূপুর, কী দুরবস্থা হয়ে গেল তার। অবশ্যই একটা কারণও আছে এর। জলের নজর বড়ো ছোট, বড়ো নিচু। নিচে থেকে নিচে আরো নিচে তার ছোটা, তস্য নিচে তার দৃষ্টি।

কুন্তলা থামলে নিখিলেশ শুধোয়—কতোদূর পড়েছ তুমি জিলিপি?

কুন্তলা বলে —লিপিশিক্ষার ওপাশে নয়। ইস্কুলে পড়ি নি বেশী।

ছনিয়া জোড়া যে পাঠশালা, প্রকৃতির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে পাঠ, সেই স্কুলে পড়েছি। পাঠ নিয়েছি তার কাছে। শুধু চোখ খুলে চলা। পরীক্ষা পাশের ঠুলি পরে নয়। চোখের ছপাশে ঠুলি। এ পড়ব না ও পড়ব না। পরীক্ষা পাশের কাজে লাগবে না ও। তা নয়। সব পড়া —বাল্যশিক্ষা থেকে বিদ্যাসুন্দর। একটাকে বাদ দিয়ে শুধুই আর-একটা নয়।

নিখিলেশ বলে —বেটাছেলে হয়ে জন্মাতে যদি, কি কেলেঙ্কারী হত বল দেখি!

হেসে ফেলে কুন্তলা—কেলেঙ্কারী হত, না! কেলেঙ্কারীই বটে!

তারপর গম্ভীর হয়ে যায়, বলে—না কেলেঙ্কারী করতুম না কিছু। শুধু বদ্ধ জায়গায় আটক থাকতুম না কোন কিছুর লোভেই। টাকা না, বড়ো চাকরী নয়। জায়গা বদলি করে বেড়াতুম, নতুন নতুন জিনিস শিখতুম রোজ—

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে ভাবে নিখিলেশ। এসব কুন্তলার গভীর মনের চিন্তা। সন্দেহ থাকে না তাতে। মেয়ে হয়ে জন্মেই বেড়ি পরে নি পায়ে। আটকে থাকে নি বদ্ধ জায়গায়। ছেলে হলে না জানি কি হত।

এ সব কি তাকে শোনাবার জন্যে বলে কুন্তলা! বদ্ধ হয়ে আছে সে কুয়োর ব্যাঙ। তারও উচিত ছুটে বেরিয়ে পড়া। এই কি বলতে চায় কুন্তলা! এও কি গলাধাক্কা এক রকমের! উপদেশের তৈরী গলাধাক্কা!

বুদ্ধি মূলধন খাটিয়ে যে সব ব্যবসা, দালালী তাদের অন্যতম। দালালী যাদের জীবিকা প্রায়ই দেখা যায় তারা পয়সাওলা লোক।

বসন্ত চৌধুরীর প্রাণের মায়া তাই বোধ হয় এত বেশী।

হাত ধরে ধরে ড্রাইভিং শিখিয়েছে নিখিলেশ। টুক টুক করে চালাতে না পারে তা নয়। কিন্তু সাহসের বড্ডো অভাব। এই ম'ল এই ম'ল ভয় সর্বদা। দালালীর পয়সা সমেত প্রাণটা বুঝি যায়!

ড্রাইভার আছে একটা। উঠিয়ে দেবার ইচ্ছা পুরো মাত্রায়। প্রথম

প্রথম রাখা দরকার স্টিআরিং ভালো করে রপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত। এ পরামর্শ নিখিলেশই দিয়েছে। গাড়ীটা দেখা শোনা, পরিষ্কার-ঝরিষ্কার করা। আজ গলা ব্যথা, কাল খুসখুসে কাসি, পরশু পেট কামড়ানো—এ তো হাত-ফেরতা গাড়ীর দৈনন্দিন ব্যারাম। তাকে সচল রাখতে গেলে তার এ সব বায়নায় কান দিতে হবে তো! এই সব ছোটখাটো ব্যারামের জন্যে টুকটাক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের নামই তো ড্রাইভার। গেরস্থ বাড়িতে একই ব্যক্তি ড্রাইভার-কাম-ক্লিনার-কাম-মেকানিক। গৃহিণী সচিব সখী যেমন একাধারে তিনটে! গৃহিণী ড্রাইভার। স্টিআরিং-এর চাকায় বসে সংসার চালান। মেকানিক সচিব। উপদেশ দেন পরামর্শ দেন। আর সখী-আদরে গা চুলকে দেন পুঁছে দেন ক্লিনার।

মাস ছয় হয়ে গেল। রাস্তার পাশে গাছ খানা ডোবা রাস্তার মাঝখানেই নাকি উঠে যায়। আর প্রাণপণ শক্তিতে স্টিআরিং মুঠো করে ধরে বসন্ত। উল্টো দিকে মোচড় মারার জন্য তৈরী হয়ে থাকে! স্পিড নেমে আসে পনেরো থেকে পাঁচে।

পুষ্পক রথ নিয়ে সেদিনও এসে হাজির হল বসন্ত। মাঝে মাঝেই আসে। বসে। বিনি পয়সায় চপ কাটলেট খেতে লজ্জা নেই বসন্তর। খায়।

বসন্ত বলল—গাড়ীটার একটা খদ্দের দেখে দাও না দাস! বেচে দেই—

নিখিলেশ হেসে বলল—সখ মিটে গেল? এরই মধ্যে—

বসন্ত যেন লজ্জা পেল। বলল—না, সখ ঠিক মিটে যায় নি। তবে কি জানো! ড্রাইভার পোষাতে পারছি না আর। বড়ো খরচ।

এতে যেন নতুন করে লজ্জা পেল বসন্ত। দৈন্যের একটা গন্ধ উঁকি মারছে। সেটাকে যুক্তির জামা পরিয়ে দিল চট করে। বলল—ঠিক তাও নয়। কি জানো, সব জায়গায় ড্রাইভার নিয়ে যাওয়াও তো চলে না। মুশকিল আছে। বোঝোই তো!

বুঝল না নিখিলেশ। বুঝবে কি! উত্তরপাড়ার পথই যদি চিনে থাকে

কালীচরণের ড্রাইভার! তার বিচারে নিষিদ্ধতর জায়গা খুঁজে পেল না নিখিলেশ। যেখানে ড্রাইভার নিয়ে যাওয়া যায় না।

নিখিলেশ বলল—তা তো বটেই! তবে, খদ্দের! কই, এখানে? কলকাতা হলে—।....আচ্ছা দেখি—

বসন্ত বলল—হর্নটা খারাপ হয়ে গেছে জানো তো—

নিখিলেশ মনে মনে বলল—যা আওয়াজ ঝরঝরে গাড়ীর। হর্নের প্রয়োজন নেই আর।

খদ্দের পাওয়া গেল। বসন্ত চৌধুরী বড়োলোকির সাধে কিনেছিল, কালীচরণ পাটোয়ারি বুদ্ধিতে বেচে দিল। মেরামতের পেছনে কিছু খরচ হয়েছিল। সব পুষিয়ে নিয়েও লাভ থাকল বসন্তর। এ ক'মাসের চড়াটাই বিনি পয়সায় হয়ে গেল তার।

ড্রাইভার সমেত কিনে নিল কুন্তলা। কুন্তলার গাড়ী কেনার আসল কারণ যখন জানতে পেলো বসন্ত, হায় হায় করতে লাগল সে। গাড়ী স্টেশনে ভাড়া খাটবে। অবসর সময়ে বেড়াতেও বেরোন চলবে।

হোটেল বাড়ীর উত্তরে লাগোয়া জমিতে ছাপরা তুলিয়ে নিল। টিনের গ্যারেজ।

হোটেলেও অনেক লোকের প্রয়োজন কুন্তলার। যে গাড়ী পোঁছে সে কি আর বাড়ী-ঘর-দোর টেবিল চেয়ার পুঁছতে পারে না! গাড়ী যে চালায় হোটেল চালাতে পুরোপুরি না পারলেও সে কি সাহায্য করতেও পারে না! গাড়ীতে স্টিআরিং-এ বসলে কিপ টু দি লেফ্‌ট। বাঁয়ে ঘেঁষে। বামপন্থী। হোটেল চালানোতেও তাই। খরচের হালে বসে বামপন্থী হও। আয়ের দিকে বাঁয়ে চেপে। ডান দিকে ঘেঁষে চালালেই য়্যাকসিডেন্ট! একজন বাড়তি লোকের খোরাক গোলে হরিবোলে চলে যাবে, হোটেলের ঐ রান্নাতেই। এক মুঠো চালও বাড়তি নিতে হবে না তার জন্যে।

বহাল হল মোহন পাল।

কুন্তলা বলল—আমি কিন্তু ঐ দস্যু মোহনের হাতে ড্রাইভিং শিখব

না। ওর চেহারাটা যমদূত যমদূত পানা। জানো লেশ, আর জন্মে ও নিশ্চয়ই ডাকাত ছিল।

হেসে বলল নিখিলেশ—আর জন্মে নয় এই জন্মেই—

ছেলেমানুষী ভয়ে নিখিলেশের কাছে সরে এল কুন্তলা। নিজের দুমুঠোর মধ্যে নিখিলেশের বাহুটা ধরে বললে—ওমা তাই নাকি? তুমি কি করে জানলে?…কী সব্বনাশ! জানলেই যদি তো রাখলে কেন?…ও বাবা, কি হবে!

কৌতুক অনুভব করছিল নিখিলেশ। কুন্তলাও তাহলে ভয় পায়। ভয় পেলে কুন্তলাও শরণ নেয় কারো। কালে ভদ্রে হলেও ভদ্র কোনো লোকের শরণ নেয় সেও। মাধবীলতা কিনা সহকার শাখার আশ্রয় চাইই।—তারা দুটো চোখের কোণায়, ঐ দিকের চাকর ঠাকুরের শোবার ঘরের দিকে। কল্পনায় বিরাজ করছে যেখানে মোহন পাল। জবাব না পেয়ে ঠেলা মেরে আবার জিজ্ঞেস করল কুন্তলা—বলো না! বলছ না যে?

নিখিলেশ গোবেচারার মতো মুখ করে বলল—কি বলব? কোন কথাটার জবাব?

ঢিপ ঢিপ শব্দ শোনা যাচ্ছে কুন্তলার বুকের। নিখিলেশের মনে হল, ভান-ভণিতা নয়। সত্যিকার খানিকটা ভয় পেয়েছে কুন্তলার স্বাভাবিক নির্ভীকতা। কুন্তলা বলল—সব—সব ক'টা প্রশ্নের।

নিখিলেশ বলল—ওর হাতের চেটোটা দেখে ফেলেছিলাম একদিন, ও চালাচ্ছিল। পাশে ছিলাম আমি। ইঞ্জিনটার ট্রায়াল নিচ্ছিলাম যেদিন। দেখি কি—বলে ইচ্ছে করে চুপ করে গেল নিখিলেশ।

কুন্তলা বলল—হাতের তেলোয় আবার কি দেখলে? বরং বলো, কাছাকাছি বসেছিলে। কোমরে কোমরে লেগে যেতে টের পেলে, ওর কোমরে ইয়া বড়া এক ছোরা। কিম্বা একটা পিস্তল।

উপভোগ করছিল নিখিলেশ। তার নিজের আবিষ্কার-করা একটা উপলব্ধি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিল সে। বয়স্ক যারা, কি মন্দ কি

মেয়েমানুষ—একটি ছেলেমানুষ বাস করে তাদের মধ্যেও। মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসে সেটি! যে ছেলেমানুষটি ভয় পায়, অল্পে খুশী হয়।

নিখিলেশ বলল, হেসে হেসেই—তা হয়তো ছিল, টের পাই নি। তবে ওর হস্তরেখায় লেখা আছে ডাকাতির কথা।

এতোক্ষণে সম্ভবতঃ খেয়াল হল কুন্তলার। বাহু ছেড়ে দিল নিখিলেশের—কি রকম? কি রকম?

নিজের করতল মেলে ধরে নিখিলেশ বলল—এই এখানটা না—ওরও ঠিক এই রকম—

—তা, এ চিহ্নটা কি ডাকাতদের হাতে থাকে?

—থাকে না! এই যে আমার হাতে রয়েছে।

—তুমি কি ডাকাত নাকি!

—নই?—মতলব করেছি দুজনে মিলে যা করবার করে, টাকা কড়ি নিয়ে—ব্যস। তুড়ি দিয়ে বুঝিয়ে দিল কথাটা নিখিলেশ—সেই জন্যেই তো ওকে রাখা। বুঝেছ এবার?

কাজেই, স্টিআরিংএ বসিয়ে কুন্তলার ডান হাতে ডান হাত আর বাঁ হাতে বাঁ হাত ধরতে 'কিন্তু' হল না নিখিলেশের।

সত্যিকারের স্টিআরিংএ বসার আগে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছিল—ড্রাইভিং শিখবে নাকি তুমি? সত্যি? কোন দুঃখে?

কুন্তলা বলেছিল ঃ অন্য লোকে চালাবে আমি চলব। এ রকম তো চলি নি কোনদিন! তুমি চালক আমি চালিত। চালক মানে চালাক। কুষ্ঠীতে লেখে নি আমার! মোটর চালাতে শিখব দুঃখে নয় সুখে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবার যে সুখ। দাঁড় ছেড়ে শিকল ছিঁড়ে উড়তে পারার যে সুখ। সেই সুখে শিখব মোটর চালানো।

নিখিলেশ বলল—কবিতা-টবিতা লিখতে নাকি জিলিপি?

—লিখি নি, কিন্তু লিখতে পারি না ভেবো না। দরকার হলে প্র্যাকটিস করে নেবো। —তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে কুন্তলা—প্রথম পদ্য লিখব কিসের, জানো? তোমার বিয়ের—

কালীচরণকে হাতে ধরে শিখিয়েছে আর কুন্তলাকেও শেখাচ্ছে। তফাৎ আকাশ পাতাল। এবারে অন্যমনস্ক হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সেবারে তা ছিলই না। তা হলেও এই দুই ছাত্রের মেধার পরিমানে অনেক তফাৎ। কালীচরণ যেমন ভীতু তেমনি মেধাহীন। আর কুন্তলা যেমন ডেআরিং তেমনি বুদ্ধিমতী। শুধু মোটর চালানোয় কেন, জীবনের সব ক্ষেত্রেই—এ তো দেখতেই পাচ্ছে নিখিলেশ।

প্রথম দিন দিনশেষে নিখিলেশের সুমতি পরাস্ত হল দুর্মতির কাছে। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসার আগে পর্যন্ত।

সুমতি বলল—চেষ্টা করলে কি আরো একটু ছোঁয়াচ বাঁচানো যেত না!

কুমতি বলল—উঃ—মেয়েদের শরীর অতো নরম!

সুমতি—কেন—খুব সাধুপুরুষ নও তুমি! এর আগে মেয়েদের শরীরের আওতায় কোন দিন আসো নি বলতে চাও?

কুমতি —আসবো না কেন। এসেছি! কিন্তু শরীর এতো নরম হয় জানতুম না।

সুমতি—ওটা সব পুরুষ-শেয়ালের এক রা। তাদের কাছে এই হিসেবে নরম কথাটা নতুন কথার সমার্থক! আমার জানা আছে।.... তা যাই হোক, আগুনের মালসা ওরা। গায়ে লেগেছে তোমার লালসার হাত। হাতে গরম গরম লাগছে। বেশীক্ষণ রাখলে পুড়ে ছাই ছাই হবে তোমার হাতই। কিচ্ছু হবে না আগুনের। একটুখানি চামসা গন্ধ উড়ে যাবে আকাশে। আগুনের কোন ক্ষতিই হবে না। খানিকক্ষণের জন্য আকাশ পানে উঠে যাবে লকলকে জিভ গোটা কতো—

কুমতি—আমি কি করব? আমি কি সরে সরে যাই নি প্রথম? হাওয়ার সওয়ার হয়ে আগুনই তো তেড়ে তেড়ে এসেছে! তুমিই বলো!

সুমতি—ওটা তোমার গুপ্ত মনের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি! আসল ব্যাপার নয়।

কুমতি রেগে গিয়ে বলল—বেশ করেছি। ঘেঁষে বসেছি বেশ করেছি। আরো করবো। পুরুষ আমি। কাপুরুষ হবার সাধ নেই।

পরের দিন। বেলা সাড়ে-তিনটে চারটে। শীত নামছে আস্তে আস্তে।

মাইল চারেক কি তারো বেশী দূরে। মেঠো রাস্তা। কি ধূলো, কি ধূলো! সামনে অন্য গাড়ী নেই। নিজের গাড়ীর ধূলোই পিছন থেকে সামনে ধেয়ে আসছে প্রচুর পরিমানে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ী থামিয়ে দাঁড়াল কুন্তলা। টান মেরে রুমাল খুলে ফেলল মাথার। রঙীন রুমাল, নকল রেশমের —দূর দূর আমি কি বউ নাকি কারো, যে ঘোমটা—

দুষ্টু হেসে নিখিলেশ বলল—বধু নয়—বঁধু—

কুন্তলা বলল। তফাৎ? আমি তো জানি প্রথমটা বাঙালদের উচ্চারণ। চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করতে পারে না যারা। দ্বিতীয়টা এদিশী।

নিখিলেশ বলল—হায়রে বিদুষী, এটাও জানো না। বধু মানে বউ আর বঁধু মানে মেয়ে বন্ধু।

কুন্তলা বলল—ও সব চালাকি বুঝি না মনে করো! চন্দ্রবিন্দু সমেত ডাকতে ডাকতে অমাবস্যা যখন আসবে—ব্যস বিন্দু সমেত চাঁদ উধাও। অমাবস্যায় চাঁদ আসবে কোত্থেকে চাঁদও নেই তার সওয়ারী বিন্দুও তাহলে থাকবে না। ব্যস বাঙালে উচ্চারণ। ঠিক বুঝি ও সব—বঁধু শেষটায় বধু হয়ে যাবে।

কুন্তলা এই কথা বলতে নিখিলেশ খোঁপাটা ধরে টান মারল আচমকা ইস, দেখেছো, বুড়ী হয়ে গেছ একেবারে—

কপট কোপে তাকালো কুন্তলা—ওটা কি হোলো? আমি এখন আর্শী পাই কোথায় এই মাঠের মধ্যে? আর চিরুনী!....বুড়ী মানে! চালাকি। আমি বুড়ী হবো কোন দুঃখে?

নিখিলেশ বলল—তা আমি কি করব, এই ছাখো! বলে এক

মুঠো চুল সামনে এনে দেখাল—এই ছাখো, ধূলো লেগেছে কি না? আমি কি মিথ্যে বলছি?

—ছাড়ো—বলে আস্তে ছাড়িয়ে নিল কুন্তলা। আমার চোখে ধূলো দিয়ে তো চুলে ধূলো দেখিয়ে দিলে। কিন্তু ওর চোখে কোন ধূলো দেবে?

সামনেই পথের ডান দিকে এক খেজুর গাছ। তলায় কাস্তে হাতে এক চাষী। অবাক হয়ে কি দেখছে বলা কঠিন। স্ত্রীলোক দেখছে, দেখছে স্ত্রীলোকের রূপ যৌবন! না, স্ত্রীলোকের হাতে গাড়ীর হাল। তিনটে ই কৌতূহলের, তিনটেই বিস্ময়ের।

চুলটা জড়িয়ে নিয়ে বোতাম টিপল কুন্তলা। ঘোঁ ঘোঁ করে উঠল সেলফ স্টার্টার বাঘের মতন কিন্তু স্টার্ট নিল না ইঞ্জিন।

নিখিলেশ অসহায়ের সুরে বলল—আর্শী চাইলে, চিরুনী চাইলে!

গিয়ারের পোজিশানটা আর একবার পরখ করে নিয়ে আবার বোতাম টিপল কুন্তলা। ঘর ঘর করে উঠল সেলফ। ইঞ্জিনও স্টার্ট নিল। গিয়ার দিয়ে ক্লাচ দিতেই এক ঝাঁকুনিতে চার গজ এগিয়ে গেল গাড়ী, প্রথম ধাক্কাতেই।

নিখিলেশ বলল—কি হলো ওটা। এক ধাক্কাতেই, ব্যস, পাঁচ গজ। আস্তে আস্তে উঠবে তো! আস্তে আস্তে এগোবে তো!

কুন্তলা বলল—এই তো শিখলুম তোমার কাছে এই মাত্র! আমার কি দোষ!

—কই। আমার স্টার্ট ওবকম আনাড়ির মতো মোটেই নয়! সে ছিল আঠারো বছর আগে—যখন স্টিআরিং প্রথম ধরেছিলুম—

স্টিআরিংএ পরিপূর্ণ মনোযোগ রেখে কুন্তলা থতিয়ে থতিয়ে বলল—ভেবে ছাখো ভাল করে। তোমার স্টার্টটাও হঠাৎ হয়েছে কি না! এই একটু আগে—

নিখিলেশ হয়তো বুঝল। সে বুঝল কি বুঝল না সে কথা কুন্তলাকে বুঝতে না দিয়ে প্রসঙ্গের স্টিআরিং ঘুরিয়ে দিল—আর্শী খুঁজলে চিরুনী খুঁজলে সেগুলো চাই নে আর?....আরে, আরে—ও কি হচ্ছে—চরকার

মতো ঘোরাচ্ছ কেন স্টিআরিং ? মাতালের মতো টলতে টলতে চলছে যে—

ডান হাত বাড়িয়ে স্টিআরিং ডান দিকে বেশ খানিকটা ঘুরিয়ে দিয়ে বাঁ হাতে হ্যাণ্ড ব্রেক টেনে দিল নিখিলেশ। কি মনে করে য়্যাকসিলারেটার থেকে পা তুলে নিল কুন্তলাও, চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন।

নিখিলেশ বলল—আনাড়ির হাতে পড়ে জানটা গিয়েছিল আর কি!

কুন্তলা বলল—আনাড়ির নয়, নারীর। অনেকে শুনেছি মেয়েদের হাতে মরতে চায়, তুমি চাও না ?—বলে ড্যাশবোর্ডের পকেট হাতড়াতে লাগল।

নিখিলেশ বলল—কি, খুঁজছ কি ? কি খুঁজছ ওখানে। মুখ পালিশ করবে নাকি ?

সেখানে ছিল সিমনিজ, শ্যাময় লেদারের টুকরো—

নিখিলেশের নিস্পৃহতায় জুৎ পেল না কুন্তলা। শ্যাময় লেদার রেখে দিয়ে ঢুঁড়তে লাগল অন্য পকেট!

নিখিলেশ বলল—কি, খুঁজছ কি ?

কুন্তলা বলল—চিরুনী ছিল একটা। নিশ্চয়ই ছেলেদের। ওটা কাজে লাগাতে পারব না। কিন্তু আর্শিটা ?

—ও, এই কথা!—চিরুনীটা আছে। আর্শিটা বোধ হয় নেই। দেখি জোগাড় করে আনতে পারি কিনা ?

বোঝবার কথা নয় এ ইঙ্গিত। বুঝল না কুন্তলা। বলল—কই চিরুনিই বা কই ?

দু হাতের পোঁছা দুটো উল্টে চার আর চার আটটা আঙুল পাশাপাশি রেখে নিখিলেশ বলল—আট দাঁড়ার চিরুনি। হবে না এতে ?

চোখের কোণে তাকাল কুন্তলা—হুঁ। তারপর আয়না ?

দুটো চোখ যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে পরিপূর্ণ চোখে তাকালো নিখিলেশ—ছাখো তো দেখতে পাও কিনা নিজেকে ?

গম্ভীর হয়ে গেল কুন্তলা। বলল—চালাও। তুমি বোসো স্টিআরিংএ—

সে রাত্রে সুমতি বলল—অতো বড় সাহসের কাজটা করলে? হাত দিলে চুলে?

কুমতি বলল—চুলে জীবন নেই। আসল মানুষ নয় ওটা। ওটা নিষ্প্রাণ। স্পর্শশক্তি নেই ওর—

—ওটা কিন্তু আসল মন্দিরে ওঠার নকল সোপান। জীবন্ত মানুষটার ছায়া ওটা, কায়ার সঙ্গে লেপ্টে থাকে—

—মন্দির-সোপান-আসল-নকল! অতো শতো বুঝি নে বাপু, যাও!

—তারপর কি রকম গম্ভীর হয়ে গেল, লক্ষ্য করেছিলে!

—ওটা ভয়ের ব্যাপার নয়, অভয়ের। তাও জানো না। হেসে উড়িয়ে দেবার হাসি নেই তখন। সবটাই সীরিঅস! উঃ চুলটা কি নরম, রেশমের বল যেন একটা। আর কি-রকম যেন তীব্র তীক্ষ্ণ মিষ্টি গন্ধ! এই বুঝি কস্তুরী মৃগ!...এর আগের মেয়েরা কেউ এই রকম করে আলেয়ার দপদপানিতে জ্বলে নিভে ডাকে নি তো!...জলায় নিয়ে গিয়ে গলাজলে ডুবিয়ে মারবে নাকি?

সুমতি বললে—ধী-রে রজনী ধী-রে—

বলা বাহুল্য, এর পর থেকে গম্ভীর হয়ে গেল কুন্তলা। অনেক সুতো ছাড়া হয়েছে আর ছাড়া ঠিক নয়। এই যদি হয় কুন্তলার মনের ভাব ও ভাবনা তাহলে এ মৌনতার অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু সুতো ছাড়ার ইচ্ছা বা স্পৃহা কোনটাই তার ছিল কিনা, তাই বা কে জানে! মানুষের মন হচ্ছে উলের গুলির মতো। একটা প্রান্ত খুঁজে পাওয়াই মুশ্‌কিল। পেলেও জটের পর জট ছাড়াতে ছাড়াতেই ধৈর্য কাবার। মেয়েদের মনের উলের বল তো আরো জটিল। ওর জট যেন আর ছাড়তেই চায় না।

কুন্তলার মনের গহনে কি করে নামা যায়? কি করে জানা যায় কি আছে ওর মনে? এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে রইল নিখিলেশ।

কুন্তলা যদি মৌন, নিখিলেশ চিন্তা মগ্ন।

চুপচাপ দুজনেই।

প্রিয় আর আলোক বেঁচে থাকার সূর্যালোকে হেসে খেলে বাঁচতে চায়। এদের চুপচাপ দেখে তারাও আসে ঝিমিয়ে, হাসতে ভয় পায় সঙ্কুচিত হয় উঁচু গলায় কথা বলতে।

কেন জানে না নিখিলেশ, মোহন ড্রাইভারকে নিয়েই বেরোয় আজকাল কুন্তলা। নিখিলেশের সঙ্গ বোধ হয় ভয়ঙ্কর। বিপত্তিকর না হলেও আপত্তিকর এতে আর সন্দেহ কি! বাইরে বেড়াতে যেতে এড়ায় তাকে কুন্তলা। এ সত্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সন্দেহের মেঘছায়া নেই এতে।

হোটেলের মধ্যে কথাবার্তা না হয় তা নয়। সে কথাবার্তা নয়, মন নেই সেখানে। বরং বলা ভালো কথাবার্তাই সেটা। কথার বিনিময়ে বার্তার আদান-প্রদান।

মোহনের কাছে শুনেছে নিখিলেশ, স্টিআরিং-এ হাত এসেছে কুন্তলার। মোটামুটি মন্দ নয়! সাতদিনের শিক্ষার্থীর পক্ষে ভালোই—

তারপর একদিন নিখিলেশ জিজ্ঞেস করে কুন্তলাকে—একটা কথা বলছিলাম। ক্যাশের কাজে হাতী ঘোড়া নেই বিশেষ! আর একটি লোক দেখে শুনে নিলে নিস্তার পাই আমি। নরেশবাবুর বয়স অনেক হয়েছে—

ভাবের অভাব হয়েছে বলেই বোধ হয় ভাববাচ্যে কথা বলে আজকাল নিখিলেশ। নিখিলেশ স্থির জানত—মুক্তি দেবে তাকে কুন্তলা। বলবে —তা বেশ তো। বলে ফাইনান্স পোর্টফোলিও নেবে নিজের হাতেই। কেন যেতে চায় জানতেও চাইবে না।

মানুষ যা ভাবে তা কি হয়? কখনও সখনও না হয়, তা নয়,

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। তাহলে মানুষ ভুলে যাবে যে, অতিমানুষ কেউ আছেন কোথাও। পুতুল খেলার সুতো হাতে নিয়ে।

কুন্তলা দ্বিতীয়া চাঁদের হাসি হাসে। বলে—খুব অসুবিধে হচ্ছে কি? কিসের সেটা বললেই হয়? সেটা দূর করার চেষ্টা করি।

নিখিলেশ বলে—না, আমার হয়তো হচ্ছে না, কিন্তু—

এবারের হাসি প্রশস্ততর কুন্তলার—কিন্তু কি? আমার অসুবিধে? সেটা আমার বোঝার কথা, তোমার নয়। আমার অসুবিধে হলে অবশ্যই সেটা বুঝিয়ে দেবো। দেরী করব না। আমার অসুবিধে কোথায়? ক্যাশিআর পাচ্ছি বিনি মাইনেয়—

আবার গুলিয়ে গেল সব নিখিলেশের। তবে?

কখনও শোনায় বদ্ধ জলার কথা। জল যেখানে অচল, বন্ধ চারদিকের দেয়ালে দেয়ালে। শোনায় মুক্তির মন্ত্র। আবার এ যে দেখি বন্দীর বন্দনা—

দুত্তোর। অতো ভাবতে পারে না সে। ভাবতে শেখে নি, ভাবতে চায় নি সে! তাহলে তো তার জীবনের রাস্তা অন্য রকমই হত। একটানা উৎরাই হত না। চড়াইও থাকতো মাঝে মাঝে।

প্রিয়র সঙ্গে ভাব জমায় তার ইন্ধন পাওয়া প্রমত্ত যৌবন। নিখিলেশ নিজে জানে না, কেন তার মনের সার্চ লাইট মুখ ফেরালো প্রিয়র দিকে। সন্ধানী আলো কি অনুসন্ধান করে ফিরছে। খুঁজে ফিরছে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড—অবতরণ ক্ষেত্র। যেখানে তার মনের মোনো প্লেন মাটির নাগাল পেতে পারে। ভেসে বেড়াতে হয় না আর বায়ুতে। বায়ুভূতো নিরাশ্রয় হয়ে।

নিখিলেশ বলে—শকুন্তলা আছেন, আছেন প্রিয় সখী প্রিয়ংবদা। অনসূয়া কই? আর রাজা দুষ্মন্তই বা কই?

প্রিয় বলে—তুমি একটি হাঁদা-দাদা। কিসসু হবে না তোমার। রাজা দুষ্মন্ত তো তুমিই ছিলে। কোন দুশমন দুশমনি করলো বুঝতে পারলে না। যুদ্ধ না করে সরে দাঁড়ালে। কেন দাঁড়ালে বলতে পারো? অত্যন্ত বোকা তুমি, বুঝলে।

নিখিলেশ বলে—আমি কি করতে পারি আমাকে কেউ যদি না-চায়—

ফুঁসে ওঠে প্রিয়—না-চায়, না, নাচায়। তা মেয়েছেলে নাচাবে না বেটাছেলেকে—এও কি হয়? বেটাছেলে তুমি নাচতেই জন্মেছ!

নিখিলেশ বলে—টকী প্রায় সাইলেণ্ট ছবি হয়ে এসেছে দেখতে পাও না?

প্রিয় মুখ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে—সাধে কি তুমি হাঁদা? কথা কওয়াতে পারো না? মুখ ফিরিয়ে নিতে পারো না তোমার মুখের দিকে? তা যদি না পারো জেনে রেখে দাও এই শেষ ফেরা। ফেরারী হওয়া এর পর—

তারপর যেন নিজের মনে মনে বলে—কতো বড়ো শিকার। এক ঢিলে দুই পাখী মারতে পারতে। একটুও বুদ্ধি যদি থাকতো তোমার! আচ্ছা, ভালোবাসা কাকে বলে একটুও জানো না তুমি, না? জানো না তার ধরণ-ধারণ?

জেনে কাজ নেই তার। কাজ নেই তার এক ঢিলে দুই পাখী মেরে। কুন্তলার একটা কথা মনে লেগেছে তার—সেই যে সেই বদ্ধ জলার উদাহরণ। মাঝে মাঝে এ কথাটাও ভেবে দেখে সে। এটাও ভাবনা হয় তার, কথাটা চিন্তা করা সোজা। কিন্তু কাজে লাগানো বড়োই কঠিন। নিশ্চিন্ততার হাত থেকে ঝাঁপিয়ে-পড়া নিশ্চিত অনাহারের বুকে।

রাস্তায় বেরিয়ে দ্বিতীয় দিনের ঐ ঘটনার পর থেকে নিজেকে বিচার করতে মন দিয়েছে কুন্তলা। নিজের মনের গভীরে ডুবুরি নামিয়ে।

সতীনাথকে বড়ো বেশী মনে পড়ছে কুন্তলার। আজকাল প্রায় দিন-রাত্রির চিন্তা হয়ে উঠেছে। মনের জানালার খড়খড়িতে উঁকি দিচ্ছে ভীরু এক জোড়া চোখ। তাকে সরিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকছে সতীনাথ। আসা-যাওয়া চলেছে দুজনের। এক সঙ্গে নয়। পালা করে। একজন না থাকলে চুপি চুপি এসে ঢুকছে আর একজন। সতীনাথের থাকা

উচিত ছিল বলিষ্ঠতা। কিন্তু কেন জানি মনের জোর হারিয়েছে সে। একজন মেয়ের মতো নরম। তেমনি হরিণ-সুন্দর হরিণ-ভীরু চোখ। আর একজন বলিষ্ঠ 'রোবাস্ট' জবরদস্ত। হয়তো এর তুলনায় চোয়াড়ে। জবরদস্তি তার সব কাজে।

কিন্তু আবার কি বদ্ধ জলায় আটকে পড়ছে সে! তাই তো পড়ছে। হোটেলের চার দেয়ালের কূপে মণ্ডূক হতে চলেছে না তো! একটা দেয়াল টাকাকড়ির, একটা দেয়াল প্রতিষ্ঠার, একটা হয়তো স্বাধীন জীবনের সাফল্য। আর একটা? আর একটা দেয়াল কিসের?

ভাবতে ভয় পেলো কুন্তলা। সে দেয়ালটা যে রূপ নিয়ে মনের চোখে উঠে দাঁড়াল, সেই রূপটা ভেবে ভয় পেলো। না, না—এ পথ তার পথ নয়। সে দেয়ালটা নিখিলেশের মতো দেখতে।

নিজের মনকে নিদারুণ নির্যাতন করতে লাগল কুন্তলা। শিব গড়তে বাঁদর গড়ে বসে আছে সে!

সত্যিই শিব গড়তে বাঁদর-গড়া। তা নয় তো কি? সে চেয়েছিল নিখিলেশের শুভ কামনা। বড়োলোকের ছেলে। আজই না হয় কিছু নেই কিন্তু কথাবার্তায় চাল-চলনে এখনও দাসেদের বাড়ী চিনতে পারা যায়। চেহারায় বড়লোকের ছাপ নির্ভুল পড়তে পারা যায়। কী চেয়েছিল কুন্তলা? পড়ে আছে খারাপ সংসর্গে, চেয়েছিল সেখান থেকে উদ্ধার করে আনতে। কি মানুষ, কোথায় পড়ে আছে! নর্দমা থেকে উঠিয়ে আনতে হবে। তার জন্যে খানিক নিচে নেমেও গিয়েছিল কুন্তলা। যে অন্যত্র মুগ্ধ, তার মোহ কাটাতে হলে মোহিনী হতে হবে নিজেকেও। নস্যির নেশা ছাড়াতে সিগারেট খাওয়া। নিজের দিকে টেনে এনে তারপর তাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া। চৌরাস্তার মোড়ে আনা ভুলিয়ে ভালিয়ে। সেই পর্যন্ত আনতে হবে তাকে ভুলিয়ে—দরকার হলে মেসমেরাইজ করে। আনতেই হবে কানাগলি থেকে বের করে।

তাই করতে গিয়েছিল কুন্তলা। সুরুতে তার উদ্দেশ্য তা-ই ছিল। কিন্তু—

একদিন আবিষ্কার করল নিখিলেশের চেহারাটি বেশ সুন্দর। তার রীতনীত চমৎকার। যেমন ভদ্র তেমনি নির্লোভ। সব চেয়ে সুন্দর তার চোখ। তারও চেয়ে সুন্দর তার মিষ্টি ব্যবহার।

তারপর আবিষ্কার করল—দিনরাত্রিই সে নিখিলেশের কথা ভাবছে। তার কুশল-মঙ্গল সুখ-সুবিধাই নয় শুধু, যেন আরো কিছু। অন্য একটা রূপে যেন মাঝে মাঝে ভাবছে তাকে—টোপর-পরা রূপে। এর বিশ্লেষণে কুন্তলা নিজের মনকে এই সান্ত্বনাই দিয়েছে যে, চৌপর দিন চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্যই কুন্তলার চিন্তার সিংহাসনে বুঝি বসে আছে নিখিলেশ।

কিন্তু না—। তা হলে মাঝে মাঝে ওরকম আচরণ করল কেন সে নিজে। তবে কি—তবে কি মনের ভিতে সিঁদ কেটে ঢুকে পড়েছে নিখিলেশের সৌন্দর্য! মেসমেরাইজ করতে গিয়ে নিজেই সম্মোহিত হয়ে পড়েছে সে!

এ খেলা বুঝি একলা খেলা যায় না। অপরকে খেলাতে গেলে নিজেকেও বুঝি খেলতে হয়! সার্কাসের ক্লাউন রঙ মাখে ঢং করে! মনে হয় একটুও খেলা জানে না। ভান করে খেলার অভিনয় করে। কিন্তু আসলে সব চেয়ে ভালো খেলোয়াড় তো সেই।

ক্লাউন হতে গিয়ে কুন্তলা আবিষ্কার করে বসল—বেশ ভালো করেই খেলা দেখিয়ে বসে আছে সে—

দূরের ডাক শুনতে পাচ্ছে আবার নিখিলেশ। বাধাবন্ধনহীন মেঘ যেমন করে ডাকে মানুষকে। হাতছানি দিয়ে ডেকে ডেকে নিয়ে যায়। মানুষের মন জানে মেঘের বুকে আছে বজ্র, আছে বিদ্যুতের দাহ! তবু মানুষের মন চিরকাল সওয়ার হয়েছে মেঘের পিঠে। কবি অকবি সকলেই। হয়তো ওরি মধ্যে সান্ত্বনা পেয়েছে মানুষের মন। এই ভেবে যে, খোঁচা খারলে জল পাওয়া যায় ঐ বজ্র বিদ্যুৎ ভরা মেঘের বুকেই।

কোনো কিছুতে বাঁধা পড়া স্বভাব নয় নিখিলেশের। পড়ে নি আজো

পর্যন্ত। ভবিষ্যতে পড়বার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। খাবার জুটলেই হল। সুখাদ্য-কুখাদ্যর বিচার নাই। সু আর কু বিশেষণ দুটো অভিধানে পাওয়া যায়। তার বেশী তাৎপর্য তার কাছে নেই। প্রেম আর ভালোবাসার মতন। খুব বেশী অর্থ নেই। কাছে পেলে ভালোবাসতে আপত্তি নেই। ভালোবাসা যে অর্থে বাসা বাঁধা সেই অর্থে সে রাজী নয়। মেয়েদের সঙ্গ তাকে আনন্দ না দিয়ে নিরানন্দ দেয় না ঠিকই। কিন্তু সে আনন্দ অনিকেত হওয়া চাই। সেই একই মেয়ের সঙ্গ একই আনন্দের গোলপাতা দিয়ে ছাউনি দিতে পারবে না সে তার ভালবাসার। দুজনের মন জানাজানির চোরা বালিতে এক সঙ্গে বাস করার প্রতিজ্ঞা আর অঙ্গীকারের বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে। ওসব যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম টম বড়ো গুরুগম্ভীর! আর গুরুগম্ভীর বলেই শূন্য-গর্ভ অর্থহীন। সাউণ্ডস্ মাচ বলেই ধরে নিতে হবে ভেসল নিশ্চয় এমটি!

এই এক সমতলে এসে কুন্তলার কথাগুলো তার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হয়। ঐ যে সেই বদ্ধ জলা-টলা।

দাস পাড়া বোডের বাড়ীতে ভালো মন্দ খাবার জুটতো। বড়োলোকের ছেলেদের আদেখলের মতো গোগ্রাসে গেলার অভ্যাস রপ্ত হয় না। তারও হয় নি। ধাপে ধাপে নয় এক বারেই অনেক ধাপ টপকে ফেলে দিলেন তাকে ভগবান। এই খাবারের ব্যাপারে। দাস পাড়া রোডের বাড়ীর প্রাচুর্য থেকে চন্দ্রাবলীর একতলায়। এই একতলা বাসগৃহের ব্যাপারে যেমন, খাদ্য তালিকার ব্যাপারেও তাই। চন্দ্রাবলীর গৃহে খাদ্যই ছিল না তার আবার তালিকা। সকাল বেলা মুড়ি আর ফুলুরীতে তার ক্ষিদে লজ্জা পেতো। তাই বলে হাসি মিলিয়ে যায় নি তার। ঐ দিয়ে পেট ভরতে শিখতে বেশী দিন সময় লাগে নি! সে জানতো চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে। সানন্দে মেনে নিয়েছিল তা।

দূরের ডাক শুনে দূরের পথে পা বাড়িয়েই তো আছে সে। এই হিসেবে সে অতিথি। তিথির বেশী স্থায়িত্ব নয় তার স্থিতির।

কোনোখানেই। দাসপাড়া রোড। চন্দ্রাবলীর বাড়ী। মণিমালার ঘর। হয়তো এই দুনিয়ার সরাইখানাতেও।

দূরের ডাকের গুরু গুরু শুনেছে সে। কুন্তলার মুখের গাম্ভীর্যের রেখায় শর্ট হ্যাণ্ডে লেখা তা। কুন্তলার কমভাষণের মধ্যে অহরহ সেই দূরের ডাকের মেঘের গুর গুর।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে সম্প্রতি। কুন্তলা যখন বলল—বিনি মাইনের ক্যাশিআর পেয়েছে সে। এইটে বোঝা-ই সোজা হয় নি তার কাছে! দূরে ঠেলে দেয়া বোঝে। বোঝে কাছে টানা। এই দুটো সে তার আগেকার বান্ধবীদের কাছে দেখে শিখেছে। তারা খোলাখুলি বলে দিত—সরে পড়ো এইবার দাদা। কেউ দাদা কেউ বলত চাঁদ। খোলাখুলি কোলে টেনে নিত, কথার কোলাকুলি দিয়ে সম্ভাষণ জানিয়ে। তারা ছিল দিনরাত অভিনয় করে ক্লান্ত। তাই নিখিল দাদার কাছে আসার আগে খুলে আসত মুখোস। অভিনয়ের আঙ্গিক।

কুন্তলা গম্ভীর। মাঝে মাঝে দেখা যায় তার চপলা হাসির চাপল্য। মেঘ ডাকে, পাশে পাশে তার, বিদ্যুৎ চমকায়। সে বিদ্যুতে আঁলোর চেয়ে রহস্য বেশী!

বিনি পয়সার ক্যাশিআর হয়ে সে যে বিন্দুমাত্র কাজে লাগছে পৃথিবীর—এই বোধটুকুই তার পায়ে বেড়ি পরাল। এতোদিনে তবু একটুও কাজে লাগল সে। এই প্রথম তবু ছাই ফেলার কাজ।

এইভাবে যখন তার মন যাওয়া থাকার দুই সীমান্তের মধ্যে দোদুল দুলছে—সেই সময় এক কাণ্ড ঘটল। দুই দিগন্তের মধ্যে দুললেও যাওয়ার পক্ষেই 'ভরবেগ' ভারী হয়ে উঠছিল। ঘটনাটি ঘটল সেই সময়।

এমন কিছু নয়, যাকে ঘটনা বলা চলে।

সারাদিনের ক্যাশ কুন্তলাকে তুলে দিতে গিয়েছিল—রাত তখন এমন বেশী নয়।

ভিতরের ঘরে কথা হচ্ছিল তখন, কুন্তলা আর প্রিয়তে।

ঢুকতে গিয়ে ঢুকতে পারে নি নিখিলেশ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল দোরগোড়ায়! তারপর ফিরে আসতেই হয়েছিল তখনকার মতো।

—আমি বলছি প্রিয়, আগেকার জীবন দেখতে আসছে কে? জানতেই বা আসছে কে? নতুন করে সুরু কর তুই। ঘর সংসার পাত—

—পাতা উচিত কি না সে হিসেব পরে। পাতবো কি দিয়ে? খেলাঘরের রান্নাপাটি খেলতেও খেলনার হাতা খুন্তি বেড়ি দরকার! আমার যে তাও নেই—

কুন্তলা বোধ হয় হাসল। বলল—তোর নেই তো আমার বুঝি আছে?

প্রিয়র মুখ দেখা গেল না। রেডিওর নাটক—টেলিভিশনের নয়। কল্পনা করা যেতে পারে—ব্যথায় ম্লান হয়ে গেল প্রিয়র মুখ। বলল—দিদি আমি গরীব—তার ওপর—। কি একটা কথা চেপে গেল প্রিয়। একটু থেমে আবার বলল—যার অনেক আছে, হায় হায় করে সেই! একটা নয় দিদি! খেলার পুতুল তোমার একটা নয়! দুটো! তাই তুমি অমন ঠাট্টাটা করতে পারলে।

কুন্তলা এবার শব্দ করেই হেসে উঠল—দুটো ছেড়ে একটাও আমার কিনা, জানি না। কোনটা যদি থেকেও থাকে—ওরা সব শখের পায়রা। ধান খাবে খুঁটে খুঁটে আমাব ক্ষেতের, রাত কাটাবে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে। তোর রূপ আছে বয়স আছে। আমি ওদের খুব চিনি রে খুব চিনি।··· সে কথা থাক। তুই ঘর সংসার কর প্রিয়। খোকা হোক তোর। আমায় শুধু সেই ময়দার তালটা চটকাতে দিস মাঝে মাঝে। আমার ঐটুকুতেই চলবে—আর কিছু চাই না—

এরপর আর দাঁড়াতে পারা যায় না সেখানে। চলে এসেছিল নিখিলেশ। দুটো কথা তার মনের কানে নীলের বাজনার মতো বেজে চলেছিল। ওরা সব শখের পায়রা। খুঁটে খুঁটে ধান খাবে আমার ক্ষেতের। আর ময়দার তালটা মাঝে মাঝে চটকাতে দিস আমাকে—

নিখিলেশের মনে হয়, যেই মুহূর্তে মাতৃজঠর থেকে জন্ম হয় একটি

মেয়ে-শিশুর, তারি সঙ্গে অদেখা যমজ জন্মায় আর একটি শিশু। কামনা শিশু। মাতৃত্বের কামনা। মেয়ে আর তার মাতৃত্বের কামনা জন্মায় একই সঙ্গে। ছেলেবেলা থেকেই মেয়ে মাত্রই মা হতে চায়।

কুন্তলারও সেই চিরন্তন মা হবার আকুতি। অন্য অনেক বিষয়ে কুন্তলা অসাধারণ। এ বিষয়ে নয়। তার আপত্তি বন্ধু নির্বাচনে। শখের পায়রা নয় এমন বন্ধু পেলে হয়তো তার আপত্তি থাকবে না।

স্বপ্ন দেখছিল নিখিলেশ।

কুন্তলার কোলে ছেলে। সদ্যোজাত না হলেও ময়দার তালটার বয়স মাস দুয়েকের বেশী নয়। প্রাণভরে চটকাচ্ছে তার শরীর—নিজের হাতের সুখে। চটকাচ্ছে তার মন—মানুষের ছাঁচে ঢালবার প্রস্তুতিতে। যাতে তার ছেলে মানুষ হয়। কুন্তলার হাতের কাছে পড়ে—জওহরলালের জীবন চরিত। অর্থাৎ ঐটেই পড়ছিল সে।

হাসছিল দুজনেই। কুন্তলার চোখে জল মুখে হাসি।—হবে না? হবে না আমাদের ছেলে এই রকম কীর্তিমান? এই রকম দশজনের একজন।

নিখিলেশ বলছিল—কেন হবে না? তৈরী করতে পারলে কেন হবে না। কিন্তু তৈরী তো করে মায়েরা। মায়ের কোল, কোল তো নয় খোল। ছাঁচের খোল—

আরও জল ঝরছিল কুন্তলার চোখে।—পারব না? পারব—খুব পারব। দশটা নয় পাঁচটা নয় একটাই তো! এইটে নিয়েই পড়ে থাকব। ভুলে যাবো সংসার। সোনা মণি, আমার খোকন। আমার সোনা, আমার মণি, আমার খোকন।

বলে তালটাকে আরো চটকাতে লাগল কুন্তলা। ময়দার তালটা কেঁদে উঠল বেদনায়। আর আশ্চর্য! খুব লেগেছে বোধ হয় তাই কেঁদেই চলল।

এক আশ্চর্য অনুভবে ঘুম ভেঙে গেল নিখিলেশের। স্বপ্নটা এতো টাটকা তাজা মনে হচ্ছে, ও ঘরে গেলে বাচ্চাটাকে সত্যি দেখা যাবে।

দেখা যাবে কুন্তলার চোখে জল মুখে হাসি। খোলা চুল গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, বুকের পাশ দিয়ে এসে নেমেছে বঙ্কিম ঝরণায়। চুলের গুচ্ছেরও বুঝি মাতৃত্বের কামনা আছে। সেও বুঝি কাদার তালটার নরম ছুঁয়ে দেখতে এসেছে।

নিখিলেশ উঠে বসল বিছানায়। দু হাতের পোঁছা দিয়ে রগড়াতে লাগল দু চোখ স্বপ্ন মুছে ফেলার সম্ভাবনায়। ভোর হয়ে এসেছে। চোখের শুকতারা থেকে ঘুমের জড়তা মুছে ফেলতে শেষ রাতের আকাশও বুলোচ্ছে কুয়াশার হাত।

কিন্তু নিখিলেশ আর তো ঘুমোচ্ছে না। এই তো সে জেগে। কাছের লাইট পোস্টটা গিয়েছে নিভে। দূরের লাইটটা নিবু নিবু জ্বলছে। আকাশের শুকতারাটাও নেভবার পূর্বে দপদপ করছে যেন। সেই লাইটের সোজা একটা লাঠি বাঁকা হয়ে ঢুকেছে জানলা গলে। এই তো লাঠিটা ধরতে পারছে সে।

কিন্তু স্বপ্নের কান্না যে থামে না—

স্বপ্নের শিশু কেঁদেই চলেছে। একটানা নয় থেমে থেমে। স্বপ্নের ধোঁয়ার সাম্রাজ্য পার হয়ে বাস্তবের কঠিন ডাঙ্গায় কি করে আছড়ে পড়ল এসে কান্না।

আর এ কান্না তো ভেতরের দিক থেকে কুন্তলার ঘর থেকে আসছে না। বারাণ্ডা থেকে আসছে মনে হচ্ছে।

খেয়াল করে শুনতে লাগল নিখিলেশ। হলফ করে বলতে পারে সে তার চোখে এখন এই মুহূর্তে একটুও ঘুম নেই। ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীকে একসাথে ভিড়িয়ে চিমটি কেটে দেখল বাঁ বাহুতে। লাগছে তো!

আস্তে আস্তে বাইরের দিককার দরজার খিল তুলে ধরল সে। না, ভুল নেই। বারাণ্ডা থেকেই আসছে এই কান্না।

বেশ কুয়াশা পড়েছে। তা হলেও কয়েক গজ দূরে সাদা কাপড়ের পুঁটলিটা নজরে পড়ল তার। এক রকম দৌড়ে গিয়েই পুঁটলিটাকে কোলে তুলে নিল সে।

কেমন গা ছমছম করছিল। মনের একটা অদ্ভুত অনুভব রোমাঞ্চ তুলছিল সর্বাঙ্গে। এটা কি শীতের শিহরণ না মনের তরঙ্গের শির-শিরাণি! বুঝে ওঠার আগেই তার মনে হল, কুয়াশার ওড়নার আড়ালে কে যেন বাস্তব থেকে স্বপ্নে মিশিয়ে গেল। স্পষ্ট পায়ের আওয়াজ পেল সে। নরম বিড়াল পায়ের তুলোট আওয়াজ।

খানিক কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থেকে নরম পায়ের আওয়াজটা মনে হল তার নিজ মনেরই ভুল। তার নিজ পায়ের আওয়াজের প্রতিধ্বনি। কুয়াশার দেয়াল যেটা ফিরিয়ে দিয়েছে—

এ তো তার বাসনা নয়। কুন্তলার বাসনা বাস্তব পায়ে আওয়াজ তুলে কুয়াশার কল্পনায় মিলিয়ে গেল, মনে হল তার। আশ্চর্য তো!

চাদরে জড়িয়ে নিয়ে এলো নিখিলেশ। তুলতুলে নরম মাংসপিণ্ড। সপ্রাণ।

দেশলাই জ্বেলে ডেলাইট ধরালো নিখিলেশ। প্রয়োজন ছিল না। সূর্যের দেশলাই একটু পরেই দিনের আলো জ্বেলে দিয়েছিল। নিখিলেশের আগ্রহ শিশুর মুখে নতুন আলো দেখতে।

না, নেহাৎ দুমাসের নয়। একটু বেশী হবে হয়তো।

তন্ময় হয়ে দেখছিল সে। শিশু মুখের মুগ্ধ আবেশে। কোলের বন্দর পেয়েছে নিরাশ্রয় জাহাজ। বন্দরের আশ্রয় পেয়ে কান্না নেই আর। আলো দেখে দেখে হাত পা ছুঁড়ে চ্যালেঞ্জ করছে নকল আলোকে। কেরোসিনের আলোকে পাঞ্জা লড়তে চাইছে নতুন জাগা চোখের আলো। হাত পা ছোঁড়াটা সেই চ্যালেঞ্জ।

একবার মনে হল—কাপড়খানা আর তোয়ালেটা কি অশুচি, ফেলে দেবে নাকি? কাপড় তোয়ালে ফেলে দেবার প্রশ্নটাই মনে এলো তার। গোটা পিণ্ডটাকে ফেলে দেবার কথা মনেই এলো না। তারপরই মনে হল—অশুচি? অশুচি কি? পাপ ঢোকে নি যে-মনে, ছটা রিপুর একটাও ঢোকে নি যে রাজ্যে, পাঁচটা ইন্দ্রিয় যার কাছে কোন বিকারই আনে না, সে অশুচি। তার গায়ে যে জামা কাপড় জায়গা পেয়েছে সে

তো উত্তরীয়। সে তো উপবীত। সে তো পবিত্র। এর চেয়ে আরো পবিত্র জামা কাপড় আছে নাকি দুনিয়ায় ?

বাঁ কানে গরম হাওয়া লাগল। নিঃশ্বাস। কার যেন তপ্ত কামনা বা আকাঙ্ক্ষা নিঃশ্বাসকে উষ্ণতা দিয়েছে। বুঝল নিখিলেশ—কোন হতভাগী এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। প্রিয় কি কুন্তলা ! দুজনের যে কোনজন ! কে ? আন্দাজ করতে চেষ্টা করল নিখিলেশ। কুন্তলাই হবে বা !

পিছন ফিরল না সে ! যে হোক সে হোক। যায়-আসে না তার।

কুন্তলা বলল,অনেকটা নিজের মনেই—আশ্চর্য, পোনাহাটের মতো জায়গায় শেয়ালে টেনে নিয়ে যায় নি।

প্রিয় বলল—হয়তো এখখুনি ফেলে গেছে !

কুন্তলা বলল—হোলেই বা ! এক সেকেণ্ড এক সেকেণ্ডই সই। ওদের পক্ষে ঐ ঢের। এ শিশু ও পাড়ার—এতে তো আর ভুল নেই। যারা শুধু মেয়েমানুষ—শুধু মেয়ে, মা হওয়া যাদের বারণ, তাদের কোন হতভাগী মা হয়ে পড়েছে ! যতোক্ষণ না আমরা কেউ বেরোতাম, নইলে ভোর হোতো, ততক্ষণ ছেড়ে যেতে পারে নি হতভাগী। দুই কারণে। এক আমাদের হাতে না পড়া পর্যন্ত শেয়ালের হাতে তুলে দিতে পারে নি। আর, যতোক্ষণ কাছে পাওয়া যায় নাড়ী ছেঁড়া ধনকে।

আর পারল না প্রিয়। খাওয়ার টেবিলে এই সে প্রথম খাবার পেল। খাবার ! খাবার টেবিলে বসে কোনদিন খায় নি সে। এই সে খাবার পেল প্রথম। মুখের নয় মনের—

এসে জড়িয়ে ধরল বুকে।

কুন্তলার ক্ষুধা আছে সেটা নিজ কানে শুনেছে নিখিলেশ। কাল-রাত্রেই। তবু তার ক্ষুধাবোধ সমীচীনতার হিসেবের খাদে বয়। তাই বোধ হয় সে এসে শিশুকে বুকে টেনে নিতে পারল না।

নিখিলেশ সেই থেকে অবাক হয়ে ভাবছিল—নিজের পায়ের আওয়াজের প্রতিধ্বনি নয় ওটা তাহলে ! কারো সত্যিকার উপস্থিতি ছিল সেখানে ! কে সে ? কার পায়ের আওয়াজ !

তার সামনে এসে প্রিয় তুলে নিল কোলে। চোখ দেখল নিখিলেশের, মন দেখতে পেল না। মনটা এতোই আনমনা। গোটা উত্তরপাড়াটার পরিচিত মুখের আইডেন্টিফিকেশান প্যারেড চলেছিল তার মনের চোখের সামনে।

আস্তে আস্তে কাছে এল কুন্তলা। এসে পেটের কাছের তোয়ালে তুলে ধরল। ভিতরে একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন কাঁথা। তিন রঙের পাড়ের সুতোয় পরিচ্ছন্ন ফোঁড়। ধৈর্য সৌন্দর্য আর কামনার চমৎকার ডিজাইন প্রত্যেকটি ফোঁড়ে। ধৈর্যের সবুজ পাতার পাশে পাটকিলে রঙের সৌন্দর্যের ডাঁটিতে হাল্কা গোলাপী রঙের পদ্ম ফুটে আছে। পদ্ম ঠিকই—তাব রঙটাও ঠিকই হয়েছে। পদ্মটি পদ্মপাপড়ির মতোই নরম। কিন্তু ডাঁটির রঙটি হওয়া উচিত ছিল কামনার রং—ঘোর লাল।

কাঁথাখানার চুপিঠেই চার পাশে একটি শাড়ীর পাড় বসানো। সেইদিকে চোখ আটকে গেল কুন্তলার। মনে ঘোর প্যাঁচ না রেখে বলেই ফেলল কুন্তলা—

—মনে পড়ে নিখিলেশ, এই শাড়ীখানা পরে এসেছিলে তুমি! যখন চন্দ্রার বাড়ী থাকতে। এসেছিলে চপ কাটলেট কিনতে।

ক্রমশঃই অবাক হচ্ছিল নিখিলেশ। এতো অবাক যে একেবারে নির্বাক! শাড়ীর পাড় মনে থাকে না তার! কিন্তু শিশুমুখটি বাঁধানো কোন ফ্রেম দিয়ে, কার মুখের আদলের ফ্রেম সেটা—সেইটাই অবাক করছিল তাকে!

বুকের তোয়ালে ঠিক্ করে রাখতে গিয়ে, একটা কাগজের টুকরো খচমচ করে উঠল। হ্যাঁ, কাগজই!

কাগজ টুকরো টেনে বের করল কুন্তলাই। বাঁকা বাঁকা অপটু হাতের মেয়েলি অক্ষরে লেখা—আমি বাঁচাতে পারতাম না। যদি তুমি পারো। ছেড়ে যাচ্ছি, দু-মুঠো পেটের ভাত হাত-ছাড়া না হয় এই ভয়ে। তাতেও বাঁচতে পারবো কি না জানিনা। আশা করি চিনতে পারবে। না পারলেও ক্ষতি নেই—

এ চিঠি কাকে উদ্দেশ করে লেখা কে বলবে। মুখ চাওয়াচায়ি করে নিল সবাই। তবু, অনিবার্যভাবেই যেন নিশ্চিতও হয়ে গেল।

এ চিঠি নিখিলেশকে লেখা। তা ছাড়া আর কাকেই বা লেখা যেতে পারে।

বাঁকা চোখে তাকাল কুন্তলা। সরাসরি শুধোল—এর অর্থ কি নিখিলেশ ?

কুন্তলার জানার কথা নয় যে, তার আর প্রিয়র কাল রাত্রের আলোচনা অজানা নেই নিখিলেশের। নিখিলেশ দুজনেরই মনের মণি-কোঠায় গুপ্তধনের সন্ধান জানে। গুপ্তধন মানে কামনা। সব মানুষই কামনার মণি মানিক বয়ে নিয়ে চলেছে রাত্রিদিন। আঁতুড় থেকে শ্মশান পর্যন্ত, চিনির বলদেব মতো বয়ে মরা। কিন্তু তাই তার আনন্দ।

মনে মনে কৌতুক বোধ করল নিখিলেশ। কুন্তলার বাইরের গাম্ভীর্যের নারকোলের খোলের কাঠিন্য ভেদ করতে পেরেছে সে। বেশ তো দেখাই যাক না এর পরে বক্তব্য কি কুন্তলার ?

নিখিলেশ বলল—অর্থ যিনি লিখেছেন তিনিই জানেন। আমি কি করে জানবো ?

—কাকে লেখা বলে মনে হয় ? তোমাকে, আমাকে, না—

—আমাকেই মনে হয়।—বলল নিখিলেশ।

—হুঁ—বাঘের মতো হুম করে চুপ হয়ে গেল কুন্তলা।

একটা তীর ফসকালো। আর একটা ছুঁড়লো মজা দেখার আনন্দে। নিখিলেশ বললো—তা হলে ?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু তাকালো দুজনেই—নিখিলেশের মুখে।

কুন্তলা বলল—তাহলে কি। কি জানতে চাও ?

নিখিলেশ বলল—মানে একে নিয়ে কি হবে। জায়গা হবে এর ?

কুন্তলা বলল—তোমার ইচ্ছাটা কি, শুনি। রাখার, না—

নিখিলেশ বলল—আমি নিজেই পরগাছা, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার

আবার দাম ! আমার নিজেরই সময় হয়েছে যাবার। বানের জল এলো, চলে যাক ঘরের জল নিয়ে এবার।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দ রইল ঘর। কেউ হাতড়াতে লাগল তূণীর, নতুন তীরের সন্ধানে! কেউ কিছু ভাবতে লাগল। শুধু হাত পা ছুঁড়ে নির্ভাবনার নিশান তুলে ধরল নতুন প্রভাত। মুখের বৈদান্তিক হাসিতে নির্ভয় নির্ভরের স্বাক্ষর নিয়ে।

প্রিয়র দু হাতে ধরা ছিল শিশু। তার ভাঁজ করা দুহাতের ওপর তোয়ালে জড়ানো ময়দার তাল। এতোক্ষণ একটাও কথা বলে নি প্রিয়। বলবার শক্তি ছিল না। দুচোখে এবার বর্ষা নামল বলে। কেন কে জানে—ছলছল করে এলো তার চোখ।

মনের ভাব চোখে ছায়া ফেলে চলেছে বুঝতে পেরে দুম করে শিশুকে নামিয়ে দিল প্রিয়। নামিয়ে রাখল সেই টেবিলে। সেইখানটিতেই, যেখান থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল।

দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে পাশের ঘরে ছুটে চলে গেল।

প্রিয়র এই ভাবান্তর লক্ষ্য না করার মতো মুহূর্ত্ত নয়। খেয়াল হল দুজনেরই।

শিশুকে তুলে নিল কুন্তলা। আদর করার জন্য মুখের কাছে মুখ নিতেই মিষ্টি গন্ধে আকৃষ্ট হল। শিশুর মুখ শুঁকে পরখ করতে লাগল বারবার।

—ওর মা ওর কাছে ছিল অল্প আগেই। হয়তো তুমি তুলে আনার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। মুখে ক্ষীরের গন্ধ।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ উভয়েই।

নিখিলেশ ভাবছিল—চন্দ্রার খবর নিতে হবে। আজই। চিঠিলেখা চিরকুটখানা মাটিতে পড়ে ছিল। কাপড়ের ভাঁজের সঙ্গে কাগজের টুকরোটাতেও আর ইস্ত্রির লেশ ছিল না। চট্‌কে গেছে। নিখিলেশ মাটি থেকে তুলে নিল সেটা। পড়ে দেখল বারবার। চন্দ্রা লেখাপড়া জানে কিনা তাই জানবার অবকাশ হয় নি, তার হস্তাক্ষর চিনবে কি! বিষয়-বস্তুটি বুঝে দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

শিশুকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল কুন্তলা। যেখানে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে প্রিয় কাঁদছিল।

ভোরের আলো ফুটে উঠলেও কুয়াশার ফলে যথেষ্ট আলো হয়নি।

ডেলাইট নিভিয়ে দিল নিখিলেশ। দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। কি করবে বুঝতে পারছিল না—

কুন্তলা প্রিয়র পাশে মাংসের ডেলাটাকে ফেলে দিয়ে বলল—নে, ধর—

কান্না ছেড়ে শিশুটাকে ধরল না প্রিয়। যেমন কাঁদছিল কাঁদতেই লাগল।

আবার বলল—নে ধর, বাঁচা এটাকে। কোত্থেকে কোন আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল এসে জুটল। মেরে তো আর ফেলতে পারি না।

এটা যে কুন্তলার মুখের বাক্য, এ কথাটা প্রিয়র চেয়ে বেশী কে জানে আর! মুখ তুলল না তবু প্রিয়। ফোঁপানি থেমে গেল।

আলুথালু শুয়ে ছিল প্রিয়। এটা মেয়েদের ঘর, পুরুষ এঘরে ঢোকে না। ঢুকলে সাড়ম্বরে ঢোকে। কথা বলতে বলতে বা গলা খাঁকারির শঙ্খ ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। প্রিয়র জামাকাপড়ের বিন্যাস-হীনতা প্রিয়কে সজাগ করে তুলল না!

যেমন ছিল শুয়ে রইল তেমনই।

পায়ের গোছার তলায় কাপড় সায়া নামিয়ে দিতে লাগল কুন্তলা। আঁচল তুলে দিল পিঠের ওপর। আঙুলের সাহায্যে বিন্যাস আনতে লাগল বাসি খোঁপার বর্ণহীন অচিকণ চুলে। মাথায় পিঠে বিলোতে লাগল দশ আঙুলের ডগায় সান্ত্বনা।

বলতে লাগল—ওরে, উপোসী শিশুকে দেখে তোর বুকের উপোসী মা কেঁদে উঠেছে। এটুকু আমি কেন নিখিলেশও বুঝতে পেরেছে। তোর বুকের উপোসী মা চোখের জল ফেলছে, বুকে ঝরাচ্ছে ক্ষীর। ছাখ, বাচ্চার বোধ হয় খিদে পেয়েছে। তুই একটু ঠাণ্ডা কর, আমি বোতল আনতে দিই। —বলে কুন্তলা শিশুকে ওখানে ফেলে রেখেই চলে গেল!

প্রথমে আপত্তি পরে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল শিশু।

কিছু পরে ওঘর থেকে কান্না আর শোনা গেল না।

নামকরণের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নিখিলেশকে—এতো নাম থাকতে সত্যকাম কেন? অর্থ কি এ নামের?

নিখিলেশ হেসে বলত—নামের কি কোন মানে হয় নাকি আবার। এমনি। কতোকগুলো মিষ্টি শুনতে অক্ষর পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছি।

কুন্তলা ছেলেকে আদর করতে করতে বলত—তবু! 'সত্য' নামটাই বা মনে এলো কেন?

—ওর অস্তিত্বটা মিথ্যে হয়ে যেতে যেতে সত্য হয়ে গিয়েছে, এই বোধ হয় কারণ।

—সত্যর পরে চরণ শরণ নাথ হরি যা চলতি, তা না হয়ে কাম হলো কেন?

জবালার নামটা বের করার উদ্দেশ্যে বারে বারেই খোঁচা মারতে লাগল কুন্তলা।

নিখিলেশ বলতে লাগল—ওগুলো পুরোন হয়ে গেছে! সত্যকাম নামটা বেশ নতুন। তা ছাড়া নামের আবার মানে হয় নাকি! গোলাপ একটু বিশৃঙ্খল হলেই গোপাল? পাগল হতেই বা কতোক্ষণ?

—কোন নামেরই কি মানে নেই? এই যেমন প্রিয়র নামটা—প্রিয়ংবদা! ওর মুখে তেতো বা টক কথা শুনেছ কখনও।

নিখিলেশ বলত—ও নামটা তোমার রাখা। সুন্দর মানানসই। মিথ্যে নেই একটুও। তারপর হেসে ফেলে বলত—আর একটা নাম মিলে গেছে খুব। রাগ না করলে বলি।

কুন্তলা মনে মনে ভেবে নিল, আলোকের কথা বলবে নিশ্চয়। বললে—শুনে দেখি তো আগে।

নিখিলেশ বলল—তোমার নামটা। তোমার মা বাবার দূরে দেখার চোখে জোর ছিল, মানতেই হবে। নাম রেখেছে কুন্তলা—

মাস কয়েক আগেকার ভয়টা কোনরকমে চাপা পড়ে গিয়েছিল কুন্তলার। ওপর তলায় উঠে এলো আবার। মোটরের কোটরে বসে নিখিলেশের সীমান্ত অতিক্রম। দু-তিন মাস কেটে গেছে তারপর। প্রথম দিকে প্রায় কথাই বলত না কুন্তলা।

কিন্তু কাছাকাছি থেকে কথা না বলে থাকা যায় না। তা ছাড়া নিখিলেশ চলে যেতে চেয়েছে অনেকবার। যতোবারই চেয়েছে ততোবারই নকল দূরত্বের লম্বাটা খাটো হয়ে হয়ে এসেছে। কাছে চলে এসেছে নিখিলেশ। আনতেও হয়েছে কাছে টেনে। কুন্তলা ভেবেছে—আশ্রয়ে ক্ষতি কি ? প্রশ্রয় না দিলেই হল। হৃদয়ের কাছাকাছি রাখতে ক্ষতি নেই, বুকের কাছে আসার সাহস না পায়। একটু স্নেহ ভালবাসা না দিলে বিপথ থেকে ঠিক রাস্তায় আনা যাবে কি করে ? অন্তঃপুরে তো আছেই—অন্তরপুরে ঠাঁই দেবো না, ব্যস ! মিষ্টি কথার ট্যাক্স নেই নিশ্চয় !

নিখিলেশ এই দুটো মাস ভেবেছে অন্যরকম ! এর আগেও সে অন্য মেয়েদের দেখেছে। তারা সুলভ তারা সহজলভ্য। তাদের পেতে বুদ্ধি ধৈর্য ভালোবাসার পরিমাণ কোনটারই পরীক্ষা দিতে হয় না। পাওয়া গিয়েছে তাদের বিনা পরিশ্রমে। তাদের পাওয়া যায় কিনা সে কথা ভেবে দেখে নি নিখিলেশ। নিখিলেশের ব্যবহারের মিষ্টি, নিখিলেশের মনের ঔদার্যই পেয়েছে তারা ! ব্যাপারটা এখানে অন্য রকম !

উঠতে পারে না বলেই মানুষ গৌরীশৃঙ্গে ওঠার আগে পর্যন্ত থামে না। বারবার চেষ্টা করে। বারবার মরে। দক্ষিণ মেরুতে বসাতে চায় বসতি। জয়ের আনন্দ মানুষের জন্মগত। জয়ের নেশায় মানুষ পাগল। অজিতকে তার জয় করা চাইই।

সেই নেশা জেগেছে নিখিলেশের মতো ভবঘুরের মনেও। কবে কতোদিন আগে এখান থেকে পাড়ি জমাতো নিখিলেশ, ঠিক আছে তার ? দুর্গম তাকে ডাকে, দুরান্ত তাকে হাতছানি দেয়, দিগন্ত বলে—আয়। স্পীডের নেশা তার রক্তে। সেই স্পীড হারিয়ে এখানে সে স্থাণু, স্থবির—

সেই জয়ের নেশার মাতলামীতে প্রিয়র উপদেশ পঞ্চরঙের কাজ

করে। ওদিকে ফেরানো কুন্তলার মুখ এদিকে ফেরাতেই হবে। বিমুখকে সুমুখে আনতে হবে।

মানুষ সব সহ্য করতে পারে—পারে না পরাজয় সহ্য করতে। পরাজয়ের জ্বালা নিখিলেশের এখানে থাকা-কে দীর্ঘতর করে তুলেছিল।

কুন্তলা নিজের ওপর থেকে সার্চলাইটটা নিখিলেশের ওপর ঘুরিয়ে দিল। বলল—আমার নাম তো শকুন্তলা। শকুন কই এখানে?… আচ্ছা, তোমার নামটা কে রেখেছিল? এটার বিষয়ে সম্বন্ধে কিছু বলো। সকলের নামেরই তো পিণ্ডি চটকালে—

হো হো করে হাসতে লাগল নিখিলেশ—এটা এক্কেবারে পাকা। কারেক্ট! নিখিলেশ নয়—নিখিল লেস। সৃষ্টিছাড়া। আমার মতো সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত জীব আর পাবে না। একেবারে নিখিল-লেস।

এমনি করে নিখিলেশের শিকড় এমনভাবে মাটিতে গেঁথে গেল যে নিখিলেশ নিজেই তা টের পেল না। টের পেত না পাবার দরকারও হত না যদি না ঝড় উঠত আকাশে।

তুফান আলীর আড়গড়ার কাছে দেখা। হবি তো হ নিখিলেশের সঙ্গেই।

বেলা ন' দশটা।

হাতে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ। পরনে ট্রাউজার নয়—ধুতি। টেপ কলার আমেরিকান কাফ শার্ট। গলার বোতামে নকল হীরে। সিঁথি প্রায় মাঝ বরাবর। বয়সের হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে চুল। সিঁথির দুপাশে পাকও ধরেছে কিছু কিছু। আভিজাত্য ঠাঁই বদল করে বাসা বেঁধেছে রুক্ষতায়। মুখের ওপর ভাঁজে ভাঁজে তা লেখা। ভ্রূ দুটো ধনুক হয়ে আছে। সোজা হতে জানেই না যেন। চোখের দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্যের শর যোজনা করা। মর্তবাসীদের উদ্ধার করার জন্য মর্ত্যে আগমন। এমনি একখানা ভাব। নাকটা কুঁচকোন। হ্যাঁ, আভিজাত্য বাসা বেঁধে আছে আরো জায়গায়। পায়ের স্টকিংএ, বার্নিশ করা পামশুতে—

নিখিলেশ ভাবছিল—ভাগ্যিস মুখশ্রী আছে। নাকটা উন্নতই। এবং ঢপে সুন্দর। চোখও দুটিও বড়ো বড়ো। নইলে কি কুৎসিতই লাগত লোকটাকে। রঙটি পোড় খাওয়া হলেও আজও চড়া।

লোকটি সুদর্শন, কিন্তু সুমন নয়। সুচরিত বলেও মনে হয় না। পোষাকে তারই স্বাক্ষর যেন। মধ্যযুগীয় মাইফেলি বাবুগিরির ধ্বংসাবশেষ সাজে সজ্জায় লেগে।

তুফান আলীর আড়গড়ায় এসে পথটা দুদিকে দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দু দিকে কেন, তিন দিকে। উত্তর পাড়ায় যাও, দক্ষিণ পাড়ায় যাও, ভদ্রলোক বড়লোকদের পাড়া পেরিয়ে নদীর ঘাটে যাও। জীবন যেখানে নদীর মতো সর্বদা পরিবর্তনশীল।

পথিক এখানে এসেই মুশকিলে পড়ে। বিশেষ করে পুরুষ পথিক। মেয়েদের যা হোক বাড়ী ঘর দিকবিদিক জানাই থাকে। তারা থমকায় না। উত্তর পাড়ায় যেতে হলে সিধেই যায়।

রাত্রি বেলা তুফান আলীর আড়গড়ার সামনের পথের মোড় তাই রীতিমতো গোলমেলে।

লোকটি অচেনা। সেও এসে ত্রিধায় পড়েছে। তাও কিনা দিন দুপুরে।

নিখিলেশ যদি জানত তাহলে দেখতে পেত এই দ্বিধা শুধু রাস্তায় নয়। এই দ্বিধা লোকটার জীবনেও।

বাজার করে ফিরছলি নিখিলেশ। বাজার ছিল মাথায় ও হাতে। উপেন গিয়েছিল এগিয়ে। বাজার উপেনের মাথায় থাকলেও, নিখিলেশের মাথায় ছিল কুন্তলাকে চমকে দেবার চিন্তা। চমকে দিয়ে খুশী করতে পারার সম্ভাবনা।

উপেনের হাতে মাছের থলিতে গোটা ছয় তপসে মাছ। এ সময়ে দুর্লভ তো বটেই, পোনাহাটের বাজারে দুর্ঘটও।

কুন্তলা ভালোবাসে তপসে মাছ।

তেমাথায় এসে বাকি দুটো পথের কোন পথে যাবে দ্বিধায় পড়ে

গিয়েছিল লোকটা। আর সেই সময়েই বাজার সেরে নিখিলেশ এসে পৌঁছল সেখানে।

ভদ্রলোক সিঁটকোন নাকেই জিজ্ঞেস করলেন।—পান্থপাদপ কোন দিকে হে ছোকরা?

চোখমুখের ভাবখানা এই যে, নিখিলেশ যেন তার চাকর।

শহর বাজারে অচেনা চেহারা এলেই স্থায়ী বাসিন্দারা তার গতিবিধি লক্ষ্য করে থাকে। খানিকটা কৌতূহলেই।

পুরোন আমলের বাবুগিরি মোড়া লোকটাকে দেখছিল নিখিলেশ।

নিখিলেশ ব্যঙ্গের সুর মেশালো—এই যে এই দিকে স্যর, আসুন স্যর—আমিও ওদিকেই যাবো।

নিখিলেশ ভাবছিল—বেশ সৌখীন গার্ড তো!

জানত না—লোকটা গার্ড না হলেও পাহারাদার।

পান্থপাদপে আজ কুন্তলার জন্য দুটো বিষয় নিয়ে পেঁ ছিল নিখিলেশ। বিস্ময়ের আর ভালোবাসার।

কুন্তলার মুখের চেহারাটা আনন্দে বিরক্তিতে কেমন হবে ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল নিখিলেশ।

দূর থেকে সাইনবোর্ডটা পড়ে ফেললেন। আর নিখিলেশকে পিছনে ফেলেই এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

পায়ের বার্নিশ করা পাম্পশুতে রোম বিজয়ের দৃপ্ত খট খট আওয়াজ।

নিখিলেশও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল।

মাঝখানের হলটায় কেউ ছিল না।

এ পাশ থেকে ও পাশে চলে যাচ্ছিল প্রিয়। হাতে দুধের বোতল। বোতলের কাচটা নিজের গালে ঠেকিয়ে তাপের মাত্রা পরখ করছিল প্রিয়।

হলের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক। তেমনি সিঁটকোন নাকে বললেন—এই ঝি, তোমাদের মালিককে ডেকে দাও তো! ঐ যে ঐ শকুন্তলা—কোথায় তিনি?

ঝি কথাটা শুনেই অপমানে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল প্রিয়র মুখ চোখ। ক্ষণমাত্র দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভিতরের ঘর থেকে নিজ কানেই শুনে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে এল কুন্তলা। কে রে জানোয়ারটা! কুন্তলার কোলে ছেলে!

এসেই অবাক!

কুন্তলার মুখ থেকে নিজের অজানতেই বেবিয়ে এলো —ও তুমি—আপনি? আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। এমন উঁচুদরের কুলীন ভদ্রলোকটি কে!

ভদ্রলোক বললেন —ক্যান—ক্যান—অপরাধটা হল কোথায়?

কুন্তলা বলল —অতি উঁচুবংশের ভদ্রলোকেরা অপরাধ করে বুঝতেও পারেন না। তেলে জলে চামড়া তাদের এমনই পুরু। যাক, সে আপনি বুঝবেন না।···আগমন কি হেতু সেইটে শুনে কৃতার্থ হই—

হাতের ব্যাগ টেবিলে নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক বললেন—কি জন্যে আবার? আচ্ছা সে সব পরে হবে 'খন—

বিরক্তি ঘৃণা রাগ, সব একসঙ্গে ভিড় করেছে ভদ্রলোকের চোখে মুখে। বুঝতে কষ্ট হয় না। ভদ্রলোক বলে চললেন—এটা আবার কেটা। অ্যাঁ?···কি সব ব্যাপার! এ যে দেখছি অনেক কিছু!···অনেক উন্নতিই হয়েছে তোমার।

কুন্তলাও রাগে ফেটে পড়ছে। ভদ্রলোকের পিছনে দাঁড়িয়ে এটুকু বুঝতে বাকি থাকে না নিখিলেশের। ঘটনাটা বুঝতে পারছে না সে। কুন্তলা তাকায় নিখিলেশের মুখে।

এগিয়ে আসে নিখিলেশ—কি মশাই? কে মশাই আপনি? কি চাই আপনার? বড়ো যে লম্বা চওড়া কথা বলছেন!

উত্তর দেবার দরকার মনে করলেন না ভদ্রলোক। ফিরে তাকাবারও নয়। কুন্তলার মুখের রা-ও কেড়ে নিয়েছে কে যেন! কেড়ে নিয়েছে দ্বিতীয় রিপু।

ভদ্রলোকের প্রজাপতি গোঁফের তলায় সব-বোদ্ধা হাসি। চোখে

দারুণ ঘৃণা।—ও, বুঝলাম! বলার মতো নয়।···তা যাক। দুনিয়ায় অনেক কিছুই ক্ষমা ঘেন্না করে নিতে হয়।···সইতে হয় অনেক কিছু—

ততোক্ষণে ভদ্রলোক নিজেই চেয়ার টেনে নিয়েছেন। কোঁচার ডগাটা বার কয় ঝেড়ে নিলেন। ফুলের মতো ফুটে আছে ডগাটা। খানিকটা ছেড়ে বাঁ পকেটে গুঁজে রাখলেন। পকেট থেকে ডাঁটির মাথায় ফুলের মতো দুলতে লাগল কোঁচা।

হাতের তেলো দুটো ঘষে মনের ওপরকার আলগা ধুলো ঝেড়ে ফেললেন। ভ্রমর কৃষ্ণ ভুরু দুটো কুঁচকে একত্র হয়ে গেল।

মাটিকে সম্বোধন করে বলে চললেন—এতোটা শুনিনি বাইরে থেকে। আরো আগে চলে এলেই ভালো হত।···কিন্তু তাই বলে এতোদূর ?—আচ্ছা—

হঠাৎ হিমবাহ এসে জমিয়ে দিয়ে গেছে গৃহস্থ সকলকে। পাথরের পরীর মতো, যে যার দাঁড়িয়ে। দুরন্ত স্পীডে মনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে। দোরগোড়ায় প্রিয়, মেঝেতে দাঁড়িয়ে নিখিলেশ। ভদ্রলোকের আর কুন্তলার মনে ছটা রিপুর দ্বিতীয়টা তুফান তুলে চলল উল্টো পাল্টা প্রবাহে।

জলের আভাস দেখা দিল কুন্তলার চোখে। আর কারো চোখে পড়ল না সেটা।

চুষে টেনে শুকনো নিপ্‌লে রস না পেয়ে কেঁদে উঠল সত্যকাম।

কুন্তলা প্রিয়র দিকে তাকিয়ে দুহাতে ধরা শিশুকে এগিয়ে ধরল। প্রিয় এসে তোয়ালে জড়ানো পঙ্কজ নিজের কোলে নিয়ে নিল। ডান হাতে দুধের বোতল।

ঘর ছেড়ে চলে গেল প্রিয়। কান ফেলে রেখে গেল এঘরে।

বেরিয়ে গেল নিখিলেশও। এঘরে ফেলে রেখে গেল কৌতূহল।

হতাশা এসে দুই হাঁটুতে বাড়ি মারল কুন্তলার। একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। আস্তে আস্তে টেনে টেনে নিচু সুরে বলল—এতো দূর পালিয়ে

এলাম তবু নিষ্কৃতি দেবে না! দুনিয়ার কোন্ ঠাঁই শকুনের চোখ পড়বে না বলতে পারো?

প্রিয় ও নিখিলেশ ঘর ছেড়ে গেলেও কুন্তলার কামনা-করা নিরিবিলি স্থায়ী হল না। বেলা তখন দশটা। লোকজন আসতে সুরু করেছে।

প্রাণবল্লভ উপেনরা আনাগোনা করতে লাগল। আগন্তুকের মনের চিন্তার মতন। সেখানে নানান সুপকার নানান চিন্তার পাক করে চলেছে। নানান রকমের গন্ধ উঠছে তা থেকে। সন্দেহের কষায় থেকে ঘৃণার তেতো, পুরোন স্মৃতির মধুর থেকে সেই স্মৃতির টকে যাওয়া অম্ল পর্যন্ত।

খাঁড়ার মতো দেখতে প্রশ্নের চিহ্ন। সকলের মনের সন্দেহের দুয়ারে সেই প্রশ্নের চিহ্নের মতোই খাড়া হয়ে রইল ভদ্রলোক। খাঁড়ার মতো যে কোন মুহূর্তে নেমে আসতে পারে। কারো সুখের ওপর কারো বুকের ওপর। কারো ভাতের থালার ওপর। এর উপস্থিতি কারো পক্ষে শুভ নয়, শুভ হতে পারে না। ভদ্রলোকের ভ্রূকুটিতে এটা পরিষ্কার লেখা! তার প্রবেশের নাটকীয়তা থেকে তা স্পষ্ট।

পুরো দিনটা থেকে সমস্ত ওলট পালট করে সন্ধ্যেবেলা চলে গেলেন তিনি। মাঝে মাঝে কুন্তলার সঙ্গে দেখা হল তার। কথা হল, কথা হল না। তবে সব যেন বিকল হয়ে গেল।

স্নান করলেম না ভদ্রলোক। সেটা সেরে এসেছিলেন কিনা বোঝা গেল না। খেলেন মুখ নিচু করে।

চিৎপাত হয়ে না জিরিয়ে খাওয়ার পর চেয়ারে বসে ঢুললেন। বিকেলের দিকে এক সময় ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়ালেন। বিদায় না নিয়ে চলে গেলেন স্টেশনের পথে।

পরদিন থেকে কুন্তলার চেহারা দেখবার মতো হল কিনা জানি না। মনের চেহারা অনুভব করবার মতো হল। মুখে হাসি চোখে জল।

নিখিলেশের মনে হল এতোদিনে ঠিক ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে সে।

কুন্তলার হাসির এপিডেমিকের ছোঁয়াচ লাগল তার মুখে ?

জীবনে ভালোবাসার স্বাদ পায় নি। নারী সঙ্গ পেয়েছে হয়তো। তাও বিনা পরিশ্রমে। ভালোবাসা সেখানে ছিল গরহাজির। যে আকর্ষণ সাপকে রজ্জু বানায়, ঝড়ের নদীকে সাঁতরে পার করায়, পঙ্গুকে করায় গিরি লঙ্ঘন, সে আকর্ষণ থাকে দুর্গমের দুরন্ত দূরে। যে অপ্রাপনীয় যাকে পাওয়া যায় না, তাকে পাওয়ার চেষ্টার নাম ভালোবাসা। সেই চেষ্টার পথের দুধারে মুক্তোবিন্দু থাকে স্বেদের আর অশ্রুর। আসলে এই ঘাম আর নির্ঘুম রাত্রির চোখের জলের নামই ভালোবাসা।

ভালোবাসা পাশে শুয়ে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যায় না। যে ভালোবাসা সর্বদা হারাই হারাই ভয়ের গিরিগুহায় বাস না করে, শোবার ঘরের চার দেওয়ালের গৃহগুহার মধ্যে যাকে পাওয়া যায় তার নাম দেহ লালসা। বড়ো জোর ভালোলাগার আবীরে ক্ষণ লাল। তার নাম ভালোবাসা নয়।

কাশ্মীরে পথের দুধারে হাতের নাগালে আঙুর আপেল। সেখানে তাদের দাম নেই। আমাদের এখানে বাক্সবন্দী, তোয়াজের তুলোয় তার বাস। অসম্ভব দাম, অসম্ভব মূল্য। দুষ্প্রাপ্য বলেই তো।

এই ভালোবাসার স্বাদ পেল নিখিলেশ, কুন্তলার সংস্পর্শে এসে। এতোদিনে নিখিলেশ স্বরূপ চিনল প্রেমের।

আর মনে মনে এক রকম সংকল্পই করে বসল, কুন্তলাকে জয় সে করবেই।

কুন্তলা একদিন তাকে বলল —কিছু ভেবেছ নিখিলেশ ?

মুখে হাসি ছিল তার। তাই বুঝতে পারে নি নিখিলেশ। বলল— কিসের ?

—ভবিষ্যতের কথা। কি করতে চাও, না-চাও—এই সবের বিষয় ভেবেছ কিছু ?

নেশাটা জমে এসেছে সবে, পানপাত্র পড়ে চুরমার।

খানিকক্ষণের মধ্যেও একটা জবাব জুগিয়ে দিতে পারল না নিখিলেশের বুদ্ধি।

হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করল কুন্তলা।—বয়েস কতো আর! সমস্ত জীবনটাই পড়ে আছে সামনে! সারা জীবনটা হোটেলের খাতা লিখে পরের লাভ ক্ষতি খতিয়েই কাটবে না নিশ্চয়। একটা কিছু করতে হবে তো!

নিখিলেশের একটা উত্তর মনে এলেও বলল না। ইচ্ছে হয়েছিল বলে—ভবিষ্যতের কথা ভেবে পথ চলি নি আজো।

মুখে বলল —আমার কেমন জানি মনে হয়, বেশী দিন বাঁচব না আমি, তাই—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে জের টেনে নিল কুন্তলা —যদি নাই বাঁচো ছোট্ট জীবনটুকুতে যাট বছরের সবটুকু দিয়ে যেতে হবে তো! তাই তো কাজ করা চাই আরো বেশী আরো জোর—

সূর্যাস্তের অল্প বাকি ছিল তখন। আকাশের কলজে ফেটে গিয়ে তাজা রক্ত ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে সূর্যাস্তের রঙ নিখিলেশের সুকুমার মুখে পড়ে লাল হয়ে উঠেছিল।

নিখিলেশ বুঝলে—সূর্যাস্ত নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে গেল পশ্চিম আকাশে। সূর্য যাবে আকাশ থেকে। আর নিখিলেশ? তারও যাবার নোটিস টাঙিয়ে দিয়ে গেল একই সঙ্গে। আজকের সূর্যাস্তটা যেন তারই নোটিস।

আর একদিন।

ভগবানের তৈরী অন্ধকারকে চ্যালেঞ্জ করে ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে আলো। কিন্তু সত্যি কি ভগবানের সৃষ্টিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডাকা যায়। তুড়ি মেরে গুড়ানো যায় বিধির বিধান! যায় না।

কুন্তলা বলল —চলো নিখিলেশ, চলে যাই কোথাও?

নিখিলেশের মন লাফিয়ে উঠল! কি চমৎকার প্রস্তাব! তাই বুঝি

বারে বারেই বলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। বলে জীবিকা অর্জনের কথা পরের মুখ চেয়ে না থাকতে হয়! ইতিমধ্যে একদিন খোঁটাও দিয়েছে—ছি নিখিলেশ ছি! মেয়েছেলের রোজগার খেতে লজ্জা হয় না তোমার! আমি হলে তো—…! তাই বুঝি কুন্তলা চায় নিখিলেশ গৌরবের ভাত রোজগার করুক।

নিখিলেশের মনে অনেক কিছু আসছিল বলেই চট করে উত্তর দিতে পারে নি।

বিশেষ সময় না দিয়েই কুন্তলা জের টানে আগের কথার —এখানে আর থাকা চলবে না! সময় ঘনিয়ে এসেছে। পাততাড়ি গুটোতে হবে বোধ হয় শীগগির। তা ছাড়া, আমি তো হাঁড়ি কালো করিনি কোথাও। এখানেই যা অনেকদিন হয়ে গেল—

চুপ করে ছিল নিখিলেশ। শেষ হয় নি কুন্তলার বলা।

—চলো চলে যাই। তুমি কোথাও আমি কোথাও। রোজগার পাতি কিছু হল না তো তোমার। তা নইলে না হয়—

বলা বাহুল্য পাহাড়ের চূড়ো থেকে ধুপ করে পড়ে গিয়েছিল নিখিলেশ। বলল—চলে যেতে হবে কেন? কি হল এখানে?

কুন্তলা বলল—কোন কালে এক জায়গায় থাকি নি তো বেশী দিন। এই আমার নিয়ম। এই আমার ভালো লাগে।

ইচ্ছে করেই কথাটা বলেছিল কুন্তলা। ব্রতই ছিল তার—আগুন জ্বালানোর। ছলে বলে কৌশলে সেই কাজটা করতে চেয়েছিল। ভদ্রলোকের ছেলে অসৎ সংসর্গে পড়ে পাঁকে ডুবে যাচ্ছে। টেনে তুলতে হবে, মানুষ করতে হবে। কথা ক'টা বলেই কুন্তলা আবার গম্ভীর হয়ে গেল আগের মতো।

আরামের কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়ল নিখিলেশের মন। মনে মনে কাজের সন্ধানে আকাশ পাতাল হাতড়ে ফিরতে লাগল সে। মোটর ড্রাইভিং ছাড়া জানা নেই কিছু আর। কিন্তু এ কাজটা মোটেই পছন্দ নয়। এই স্টিআরিং-এ বসেই সে এই আনন্দের নরকে এসে পৌঁছেছে।

ট্রাম, ট্রেন বাঁধা রাস্তার গাড়ী। চলার স্বাধীনতা নেই। পথ বেছে নিতে পারে না। লাইন বেঁধে দিয়ে গেছেন মহামতি মহাজনেরা, সেই পথেই চলতে হয়। বাঁধা রাস্তায় চলে বলেই খারাপ জায়গায় নিয়ে যেতে পারে না ট্রাম ট্রেন। যাত্রীরা ড্রাইভারের হাতে জীবন যৌবন ধন মান সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে।

মোটরগাড়ী ফিকস্‌ড ট্র্যাকের গাড়ী নয়। চলার পথ তার স্টিআরিংয়ের মর্জিতে তৈরী হয়। এতে তার সুবিধা আছে, স্বাধীনতা আছে পথ বেছে নেওয়ার। স্বাধীনতা যার আছে সে স্বর্গের পথ যেমন বেছে নিতে পারে, নরকের পথও তার কাছে তেমন সুগম। কিন্তু স্বর্গের পথ হল সাধনার পথ। সেখানে ঠেলাঠেলি ভিড় নেই। ভিড় যতো কিছু নরকের সিং-দরজায়।

এ তার নিজের জীবন দিয়ে যাচাই করা সত্য। আজকের এই অপমানের জীবনের মূলে মোটরগাড়ীকেই দায়ী মনে হল তার।

স্পিডের নেশা নিখিলেশের রক্তে। স্টিআরিং-এ বসে যতো পারত স্পিড দিত সে। কতোদিন গতির মাত্রা বিনয়ের হোয়াইট হর্সের মত্ততা ঘুচিয়ে দিয়েছে। হাওয়ায় বুলোচ্ছে ঠাণ্ডা ঘুম পাড়ানো হাত। স্পিডের মাতলামো লাল চোখ মেলে ধরেছে বিনয়ের—কিরে, কচ্ছিস কি? আর চাপিস না য়্যাকসিলারেটার—

তার নিজের জীবনটাই গতিহীন হয়ে পড়েছিল। স্পিড আনতে হবে তাতেও। এ ভালোই হল। এ কুন্তলা ভালোই করেছে। শাপে বর হয়েছে—

বর কথাটা মনের কানে খট করে লেগে রইল। বর হতে গেলে কষ্ট করতে হবে। রোজগার করতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর একদিন উঁচু মাথা নিয়ে বরবেশে কুন্তলার কাছে এসে দাঁড়াবে। —এসেছি আমি, এই গ্যাখো—কোথায় ঠেকেছে আমার মাথা! 'না' বলতে পারবে না কুন্তলা সেদিন।

একটা শুধু ভয়। ইতিমধ্যে বিয়ে করে না বসে কুন্তলা। আলোক-

বাবুকে পাত্তা দেবে না। কিন্তু ঐ ধূমকেতু! ঐ উল্কা! কে ও? কাঁপিয়ে দিয়ে গেল দালান, নড়িয়ে দিয়ে গেল ভিত।

ঐ উল্কা—কুন্তলার যৌবনের ভালোবাসার জন। এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না আদৌ। তার নাটকীয় আসা আর ফিল্মের ডিজলভের মতন মিশিয়ে যাওয়া। লোকটা কিন্তু কম ইতর নয়। সত্যকামকে মনে করেছে কুন্তলার ছেলে। তাই নিয়ে বাঁকা বাঁকা কথাও বলে গেল অঢেল। দূর দূর। লোকটা ছোটলোক। ওব মতন লোককে প্রশ্রয় দেবে কুন্তলার মতো মেয়ে! হতেই পারে না—

আর কুন্তলা তাকে নিজের মনের মতো করে মানুষ করতে কি না করেছে। কতো নাকানি চোবানি খাইয়েছে। সে কি পথের লোক ধবে করতে যাবে কুন্তলা! নিখিলেশ নরম কাদার তাল। কঠিন মনের কঠিন ছাঁচ কুন্তলার। সেই ছাঁচের শেপ দিয়ে নিচ্ছে তাকে।

এইবার ঠেলে দিল মহাশূন্যে। জ্বলন্ত আগুনের গোলার মতো মহাকাশে দুরন্ত স্পিডে ছিটকে পড়ল। বাতাস আর বাতাসহীনতার ঘষা লেগে আগুন ধরে গেল তার দেহে মনে। সেকেণ্ডে হাজার মাইল স্পিডে চলতে লাগল সে। জ্বলতে জ্বলতে!

মহাব্যোমে উঁচু নিচু নেই। উঁচু থেকে নিচুতে পড়তে লাগল এ কথা বলা চলে না। নিচু থেকে উঁচুতে উঠতে লাগল—তাও নয়। শুধু চলতে লাগল। দুরন্ত স্পিডে। শুধু জ্বলতে লাগল। দুরন্ত দাহনে।

নিখিলেশ আজ কক্ষচ্যুত উল্কা। কুন্তলা—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মুক্ত। কুন্তলার নিজ হাতে জ্বালা চিতাবহ্নি বুকে নিয়ে, জ্বলন্ত—

যখন সে জ্বলছিল মুখের চেহারাটা নিশ্চয় সেটা বলে দিয়েছে পাঁচজনকে।

আলোক জিজ্ঞেস করেছে প্রিয়কে—ব্যাপার কি গো! মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায় কেন সোনার চাঁদ?

প্রিয় বলে—সোনার চাঁদ সোনার নয়, গিলটির। জলুস নেই আর

দিদি বলেছে—ঘাড়ে বসে খাবে কতোকাল আর! পথ ছাখো—সরে পড়ো এবার—

—তাই নাকি! — বলে উল্লাসের উত্তেজনায় নিজের ঊরুতে চড় মেরেছে আলোক। পিঠ চাপড়ে দিয়েছে প্রিয়র। বলেছে—থ্যাংক ইয়ু রাধানাথ।

মুখে চেয়ে থেকেছে প্রিয়। বুঝেছে—নিষ্কণ্টক হবার আনন্দ। মনে মনে জপেছে—পেকেছে তো বেল, কাক লাফাচ্ছে কেন অতো!

সবুর সয় নি আলোকের। সেই দিনই—। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর গোল হয়ে বসে গল্প হয় যেমন, তেমনি হচ্ছিল। কপট হতাশার সুরে আলোক বলে—পোনাহাটে ইয়ার্ড হচ্ছে জানেন মিস ঘোষ—

কুন্তলা বলল—সে তো আনন্দের খবর! তাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার কি আছে!

—মানে এখন তো ইয়ার্ড কনস্ট্রাকশানেব কাজ সুরু হবে। সাহেব-সুবো, অতিথি-অভ্যাগত, আমীর-ওমরাও, হোমরা-চোমরারা যাতায়াত করবে পোনাহাটে! হোটেল বলতে তো এই পান্থপাদপ! আমরা কি আর পাত্তা পাবো তখন! কোথায় আমীর-ওমরাও কোথায় আমরা তোমরা!

কুন্তলা বিরক্ত হয়ে চুপ করে রইল।

আলোক বলে চলল—শুধু কি তাই। রীতিমত ওয়ার্কশপ তৈরী হচ্ছে। সাইটের জরীপও হয়ে গেছে। এক হপ্তার মধ্যে ইট পাটকেল চূণ বালি সিমেণ্টে কাজ সুরু হয়ে যাবে—

সপ্তাখানেকের মধ্যে ইয়ার্ড কনস্ট্রাকশানের খবরটা সত্যি হয়ে চোখ কানের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখের সামনে ঘটতে লাগল সব। হোটেলে বসে দেখা যেতে লাগল। বন্ধ করা চোখে কানে ও সব ঘটনার ঘটন এসে ধাক্কা মারতে লাগল।

তুফানআলীর আড়গড়া থেকে সুরু করে দক্ষিণে অনেকটা জায়গা

জুড়ে কর্মব্যস্ততার তাণ্ডব সুরু হয়ে গেল। ইট কাঠ লোহা। চূণ বালি সিমেণ্ট। বাঁশ দড়ি তক্তা। লোহার রেল পএণ্টিং ফিশপ্লেট। কণ্ট্রাক্টর সাব কণ্ট্রাক্টর ঠিকেদার জন মজুব। উষর মরুতে ছায়াতরু লাগাবার সে এক সমারোহ। পান্থপাদপের দালান বাড়ীটা থেকে রেলের লাইন ছিল সামান্য দূরে। মাঝখানে কোথাও পোড়ো জমি, দু-একখানা কাঁচা বাড়ী। কোথাও দোকানঘর কোথাও খোলার চালা। দু আড়াই শো গজের বেশী দূর নয় কোথাও। সে সব দোকান বাড়ীরা নোটিস পেলো। সাইডিং লাইন বসবে শেড হবে। তোমরা উঠে যাও। ইঞ্জিনদের বিশ্রাম ঘর। টুকিটাকি মেরামতের ব্যবস্থা থাকবে। নিদেন নাট বোল্টু ঢিলে আলগা হলে ঠাকুরগাছি ইয়ার্ডে দৌড়তে না হয়। পুরোপুরি হাসপাতাল না হোক ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা থাকা চাই।

রোগা ইঞ্জিন রুগ্ন ইঞ্জিন জিরোবে খানিক। জিরোবে সারারাত। তার মাথায় ছাতার ব্যবস্থা। পোনাহাটের গেঁয়ো আবহাওয়ায় ছড়াবে সভ্যতা-কয়লার ধোঁয়া।

গেঁয়ো বর্বরতার বুকে চিমনির তুলি কালির আঁচড়ে সভ্যতার ছবি আঁকবে। কয়লার ধোঁয়া খেয়ে জাতে উঠুক পোনাহাট। ধোঁয়া না খেলে সভ্যতা সভ্যতাই নয়।

পান্থপাদপের নাক বরাবর আপিস জাতীয় বিল্ডিং হল গোটাকতো। ছোটো ছোটো ছাড়া ছাড়া। ইয়ার্ড মাস্টারের আপিস, লোকো আপিস, ফিটিং শপ। তাদের সামনে দিয়ে এসে পূবদিকে কোণাকুণি পাড়ি জমাবে সাইডিং। উত্তরপাড়ার উত্তর ঘেঁষে। ঘূর্ণী নদী অবধি না গেলেও কাছাকাছি গিয়ে টার্ণ টেবিল। উত্তর মুখো ইঞ্জিনকে দক্ষিণ মুখো করার ব্যবস্থা। গ্রাম মুখোকে শহর মুখো।

সাইডিং, পএণ্টিং, ওআটার ক্রেন, কয়লা বোঝাইর ব্যবস্থা।

ওআটার ক্রেন জল নেবে ঘূর্ণীর। ডিজেলে পাম্প চালিয়ে। কাজেই চল্লিশ ফুটী টার্ণ টেবিলের মতো তাকেও থাকতে হবে ঘূর্ণীর কাছাকাছি। ঘূর্ণীর পাড়ে বসবে ষোল ঘোড়ার চালিত পাম্প আর তার ঘর।

বাঁশ তক্তা কাতাদড়ি এসে পড়েছে। জনসাধারণ বুঝতে পারছে না এতোখানিটা জায়গা লাগবে কোন কাজে! ঘূর্ণী আর রেললাইন সমান্তরাল। এর মাঝামাঝি জায়গাটা সিকি মাইলের কম চওড়া নয়। সবটা জায়গা রিকুইজিশান করা হয়েছে। উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি তো মাইল খানেক।

জায়গাটার ব্লু-প্রিণ্ট দেখলে তবে টের পাওয়া যাবে। বিল্ডিংই বড়ো কম নয়। ছোট ছোট হলেও খান ছ সাত। কয়লা রাখবার বাঙ্কার, ইয়ার্ড,—একমাত্র তাতেই জায়গা লাগবে বড়ো কম নয়।

সবচেয়ে জায়গা জুড়বে সারি সারি কোণাকুণি কাটাকাটি রেললাইন। পএণ্টিং আর সাইডিং। সমান্তরাল ব্রড গেজের জোড়া জোড়া লাইন। একটা যেতে যেতে পাশেরটার সঙ্গে মিশে গেল। এমনি করে খানিক গিয়ে তারপর আবার। বত্রিশ জোড়া লাইন পড়েছে আজ। সেই অনুপাতে লেভেল ক্রসিং।

বাঁশ তক্তা কাতাদড়ি এসে পড়েছে। এসে পড়ছে চূণ বালি। টালি চেপেছে নৌকোয়। কেউ কোতরং থেকে, মগরাহাটের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে কেউ। এদের সকলের উদ্দেশ্যই মহান। পোনাহাটকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনা। সেই সঙ্গে নিজেরাও তরে যাওয়া।

তৈরী হয়েছে য়্যাজবেস্টসের একচালা দোচালা। কাঁচা মাল রাখবার, মানুষ থাকবার।

বাঁশ পোতা হচ্ছে, ভারা বাঁধা হচ্ছে। ধুলো উড়ছে, বালি উড়ছে। নির্মাণের মহড়ায়।

চুল উড়ছে নিখিলেশের ঐ সঙ্গে। নিজেকে নির্মাণের চেষ্টায়। ঘুরে বেড়ায় কনস্ট্রাকশানের সাইটে সাইটে। মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারে নি কোনদিন, আজও পারে না। সেটা তার অহঙ্কার। পেট ক্ষুধার্ত তবু চাইতে পারে না এক মুঠি দানা। তৃষ্ণার্ত ছাতি। মুখ ফুটে বলতে পারে না জল দাও। তৃষ্ণার্ত্ত বুক ছটফট করে তার, জানাতে পারে না প্রেম দাও।

আজও বলতে পারল না, কাজ দাও। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা মাথা খুঁড়ছে পিঞ্জরের দেয়ালে। টাটকা পোরা পাখীর মতো। তবু তার মুখ বাচাল হতে শিখল না।

কেউ ডেকে মিষ্টি কথায় কাজ করিয়ে নেয় টুকিটাকি। হিসেব লিখিয়ে নেয় কেউ। কেউ বলে—এই পাগলা, হাত লাগা দিকি। পয়সা দেবো। বলে—'মারে জুয়ান হেঁইও'র রশি ধরিয়ে দেয়। কেউ বলে—দড়িটা ধর দিকি নি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওইখেনে—। দু ইঞ্চি ডাইনে,—ঠিক হলো না। দু আঙুল পূবে। আর একটু—হ্যাঁ ঠোক ওখেনে পিন। নিখিলেশের হাতে কাঠের হাতুড়ি কাঠের পিনের মাথায় পড়ে ঠক-ঠক।

কিছু দেখে কুন্তলা নিজের চোখে। কিছু শোনে। কিছু দেখে অন্যের চোখে। কিছু দেখে মনের চোখে। কাঠের পিনের মাথায় কাঠের হাতুড়ির বাড়ি, অনেক সময়ে লোহার পিনের মাথায় লোহার—কুন্তলার বুকেই পড়ে। ব্যথায় মোচড় মেরে ওঠে বুক। চোখে জল এলেও কুন্তলা মুখে হাসির আঠা লাগায়। নিখিলেশের আগেকার থাকবার জায়গা ছিল উত্তরপাড়া। তার আজকের চলাফেরার ক্ষেত্রও উত্তরপাড়া চৌহদ্দাই। দূর তো কয়েক শো গজ। কিন্তু সত্যিকার দূরত্ব উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরুর। উত্তরপাড়ার অকম্মা মানুষ—কাজ নিয়ে মেতেছে আজ। বাইরের লোক দেখল তৈরী হচ্ছে রেল ইয়ার্ড। কুন্তলা দেখল তৈরী হচ্ছে মিনার। মনুষ্যত্বের।

সারাদিনের কুলীকে, সন্ধ্যাবেলায় নিখিলেশে রূপান্তর করে দেয় কুন্তলা। কথা দিয়ে হাসি ঠাট্টা দিয়ে। নিখিলেশের হাতের ফোস্কায় মনের মলম লাগায় কুন্তলা। মনের স্নেহ দিয়ে স্নেহপদার্থ রচনা করে লাগায় ফোস্কায়।

নিখিলেশ ভুলেই যায়, আই-এস-সি-টা বোকামি না করলে দিয়ে ফেলেছিল আর কি! সারাদিন ভুলে থাকে সে চূণ বালির রাসায়নিক নাম।

আত্মগর্বে খুশী হয়ে থাকে কুন্তলার অভিমান। মধু ঝরাবার জন্য খোঁচা মারে মৌচাকে।

বলে—কি গো নিখিলেশবাবু, কনট্রাকটারী পেলে ? পেলে খাইয়ে দেবে তো !

নিখিলেশ হাসে। লম্বা টান মেরে বলে—হ্যাঁ—। নিশ্চয়ই।

আর একদিন জিজ্ঞেস করে কুন্তলা—কবে আমরা উঠে যাচ্ছি এখান থেকে ?

হাঁ করে তাকায় নিখিলেশ—তুমি ? তুমি উঠে যাবে কেন ? আমি হা-ঘরে, বাউণ্ডুলে। দেশে দেশে আমার ঘর। আমি যেতে পারি—

কেমন এক চোখে তাকায় কুন্তলা। বলে—বলি নি একদিন ! তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই তোমার কাছে চলে যাবো।

দুটি পাতা বন্দী ঐ যে কুঁড়ি, যাকে বলে চোখ—মেয়েদের চোখের ঐ জোড়া কুঁড়িতে অনেক রকম রঙ। নিখিলেশ জানে। জেনেও বোঝে না। বিষ জেনে সেবন করলে বিষ কি ক্ষমা করবে ? ক্রিয়া করবে না ?

নিখিলেশ জব্দ, নিখিলেশ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

মনে মনে শিকার লাভের খুশীতে লাফিয়ে ওঠে কুন্তলা। ভালোবাসার চেয়ে জোরালো অস্ত্র নেই আর। কি বিরাট সম্ভাবনা নষ্ট হতে বসেছিল উত্তরপাড়ার খুপরী ঘরে। এ তার অহঙ্কার। সেই ঘুমন্ত সম্ভাবনাকে, হারিয়ে যাওয়া মহত্ত্বকে, ভালোবাসার ধূপদানীতে জ্বালিয়ে তুলেছে। মনের গুগগুল গন্ধ ছড়াচ্ছে আজ।

কুন্তলা বলে—বলো, কবে নিয়ে যাবে ? চুপ করে রইলে কেন ? ভয় পাচ্ছ ?

বাস্তবের সামনাসামনি পড়ে কঠিন আকার ধারণ করে নিখিলেশের মুখ। হাসি উবে যায়। বলে—তোমায় আমায় কি সম্পর্ক যে তুমি আমার কাছে যাবে !

শিকার জালে পড়েছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই আর। কুন্তলা বলে—আ-হা-হা ! ছিরি ভাখোনা কথার ? নারায়ণ শিলা সাক্ষী ছাড়া সম্পর্ক হতে নেই আর ? আর কোন সম্পর্কই সম্পর্ক নয়, না !

বধ হতে যেটুকু বাকি ছিল নিখিলেশ, নারায়ণ শিলার উল্লেখে তা

সম্পূর্ণ! নিখিলেশকে কিছু করতেই হবে। দাঁড়াতে হবেই নিজের পায়—এক নপুংসক মনের জড়ত্বকে পার্থসারথি বলেন—ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ—

আর সে তৃপ্তির আত্মপ্রসাদ রেখে রেখে অনুভোগ করে কুন্তলা।

চেয়ে চেয়েই কাজ পাওয়া যায় না। যে না চায়, মুখ ফুটে চাইতে পারে না, যে চাইতে শেখে নি, কাজ দেবে কে তাকে?

কাজ জুটল না নিখিলেশের। হতাশা জুটল। নিজেকে নির্মাণের আশা তাসের প্রাসাদের মতো ধুলোয় লুটোল। ইয়ার্ডের ধোঁয়ায় কালিতে ধুলোয় বালিতে উড়তে লাগল নিখিলেশের আশার ছাই! সেই সঙ্গে পঞ্চশরের ভস্মাবশেষ—

ইয়ার্ড তৈরী হয়ে গেছে। শুধু রাত্রেই নয় দিনের বেলাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিটি দেয় ইঞ্জিনেরা। স্টেশনের প্লাটফরমে নয়। নিজেদের বিশ্রামাগারে দাঁড়িয়ে। প্লাটফরমে আছে মেয়েদের বিশ্রামাগার, পুরুষের জন্য পাতা আছে লোহার বেঞ্চি—ছারপোকা বোঝাই ফাঁক ফাঁক কাঠের পাটাতন পাতা। গার্ডদের আছে রানিং রুম, ড্রাইভারদেরও আছে। ইঞ্জিনদেরই বুঝি থাকতে নেই কেবল।

মাথায় টিনের চালা। পায়ে রেলের লাইনের জোড়া জুতো। ঊর্ধ্ব অধঃ বন্ধ। বাদ বাকি আট দিক আর দিগন্ত খোলা। সেইখেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিটি মারে। বেঁটে বেঁটে চিমনি থেকে গল গল করে কাঁচা কয়লার কালো ধোঁয়া নিচু টিনের চালে প্রতিহত হয়। বাড়ি খেয়ে মাথা নিচু করে। ঝুলে থাকা টিনের চালের প্রান্তের হাত এড়িয়ে মহাকাশের ঠিকানায় পাড়ি জমায়। কয়েক গজ উড়তেই ব্যস বেপাত্তা। কোথায় বা কালি কোথায় কি! সত্তাই লোপ।

ইঞ্জিনের ঐ এক রোগ। লাইনের জুতো জোড়া ছাড়া এক পা-ও চলতে জানে না। হঠাৎ এই জুতো জোড়াটা চাকা-পা থেকে খুলে গেলে

সে এক এলাহি ব্যাপার—। ডাকো ক্রেন। তোলো লাইনের ওপরে—হেঁইও হো, হেঁইও হো!

আব্দুল খালেক পাকা ড্রাইভার। পরিষ্কার কামানো না থাকলে দেখা যেতো তার দাড়িও পাকা। মাথায় নীল রুমাল বাঁধা থাকে অষ্টপ্রহর। রুমাল নয়, নীল জিনের একটা টুকরো। সেটা খুলে ফেললে দেখা যাবে—কলপের গোড়ায় গোড়ায় আধ ইঞ্চি করে চুল সাদা হয়ে আছে। নীল জিনের ট্রাউজার। দু বুকে পকেট ওলা নীল ফুলশার্ট।

ড্রাইভার হিসেবে আব্দুল এতো পাকা যে দু পাঁট দিশীতেও সবুজ সিগনালের আলো লাল মনে হতো না।

একবার নতুন ফায়ারম্যান দিল। জোসেফ পেরিরা। চালাক-চতুর ছেলেটা। কাজ কম্মের ভাবগতিকও ভালো। ছেড়ে দিয়েছিল তার হাতে বরিশাল এক্সপ্রেস। হ্যাঁ, বেশ বড়ো ইঞ্জিন, ফোর-সিকস-জিরো টাইপ। জোড়া চাকা তিনটে, ছ ফুট সাত ইঞ্চি করে ডায়মিটার। দুশো কুড়ি পাউণ্ড প্রেশারের বয়লার। তিরাশি টন দশ হন্দব শুধু ইঞ্জিনটারই ওজন। জোড়া চাকা তিনটের ভিতের মাপই পনেরো ফুট। গোটা ইঞ্জিনটার উনত্রিশ ফুট ছ ইঞ্চি। না না সিলিণ্ডার চারটেই। তা হলে বুঝে ছাখো বরিশাল-কুইন ছোট নয় খুব—

বুড়ো আব্দুল খালেক গল্প বলছিল নিখিলেশকে। দুই কুইনের গল্প। ফরসি টানতে টানতে চোখ বুজে আসে তার। শেডের ছায়ায় ইজি চেয়ারে বসে আব্দুল। মাটিতে রাখা ফরসি। সটকার নল মুখে—অম্বুরী তামাকের গন্ধ আসছে তা থেকে।

পুরোন অতীতের অম্বুরী তামাকের সুগন্ধ চোখ না বুজলে উপভোগ করতে পারে না আব্দুল। আরো দেখেছে নিখিলেশ। অতীত মানেই সুগন্ধি—কে না জানে?

জোসেফ এলো শেডে ঠিক সময়েই। আমার থাকার কথা নয় তখন

শেডে। আমি ড্রাইভার। তৈরী ইঞ্জিন চালাই। শেডে গিয়ে পড়েছিলাম, সে অন্য ব্যাপার—

বলে চোখটা খুলে একটু হেসে আবার চোখ বোজে আব্দুল।

বলে—অতো আগে গিয়েছিলাম দেখতে—বরদাচার ব্রাউন কাজে এসেছে কিনা। যা ভেবেছি আসে নি। সে আর এক কুইনের ব্যাপার, বরিশাল নয় বসিরহাট। সে তুমি বুঝবে না। বুঝতে দেরী হল না— বসিরহাট কুইনের কাছে গেছে ব্রাউন।—জোসেফ এসে ডিউটি পাস দেখালো। ইঞ্জিনে উঠল! কাজ সুরু করল।···আমি আড়-চোখে তার কাজ কর্ম লক্ষ্য রাখতে লাগলাম।

স্টিম কম থাকে। কমই ছিল। ফায়ারও কম ছিল। জলের মাপ দেখে নিল ওআটার গেজে। জলের কক বন্ধ, ড্রেন কক খুললে—পরে ড্রেন কক বন্ধ জলের কক খুললে। গেজ গ্লাসে জলের লেভেল ফিরে এল। ওপরের কক বন্ধ, জলের কক খুলে ব্লো করেও নিল। ময়লা না থাকে কোথাও। আগুনটাকে মানে জ্বলন্ত কয়লাটাকে সমান করে দিল। উঁচু নিচু না থাকে। স্টিম বাড়তে লাগল। ফালতু ধোঁয়া না হয় বেশী। দরজাটা একটু খুলে রাখল, কয়লা মারবার সময়। এইবার ইনজেকটারটা ট্রাই করে নিল।

—ইনজেকটার কি খালেকজী—শুধোয় নিখিলেশ।

—ইনজেকটার? ইনজেকশান বোঝো না! চোখ খোলে খালেক।— এ কি? নোট নিচ্ছ তুমি? বা, বা—বেশ, বেশ! আগওয়ালা হবে নাকি? ও আমি দুদিনে বানিয়ে দেবো! একটুও শক্ত নয়। ইনজেকটার? ইনজেকটার হল—বয়লারে জল দেবার ব্যবস্থা। বেলচেয় করে তো চামচে চামচে কয়লা দিচ্ছ। তেণ্ডার জলটা আসছে কোত্থেকে?

নিখিলেশ বলে—ঐ যে একবার ট্যাঙ্কে বোঝাই করে দেওয়া হল। তারপর—কোন টিউবে করে টরে আসে নিশ্চয়।

খালেক হাসে—মনে হওয়া টওয়া নয়। কাজ চালাতে হবে। আগেকার দিনে ফীডপাম্প দিয়ে টেণ্ডার থেকে জল নেওয়া হত।

নিখিলেশ বলে—টেণ্ডার ?

—ঐ যে কয়লা জল ওলা পিছনের আদ্ধেকটা গো। জীবন সঙ্গিনী না কি যে বলে—এও তাই। ইঞ্জিন পিছু টেণ্ডার ঠিক করা আছে। উনিশ শো আটান্ন সাল এলে এই উপায়ে জল সরবরাহের একশো বছর হবে। ইঞ্জিন, ইঞ্জিনের কলকব্জা নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে। আমার মনে হয়, আব কিছু ইমপ্রুভমেণ্টের রাস্তা নেই। ইনজেকটার আছে অনেক বকমের। ওপরের গম্বুজ বা ডোম থেকে তাজা স্টিম নিয়ে। আর এক রকম আছে—ব্লাস্ট পাইপের তলার কাছাকাছি থেকে একজস্ট স্টিম নিয়ে। পুরোপুরি একজস্টের মরা স্টিমে কাজ চলে না। একটু তাজা স্টিম জোগান দিতে হয়।

আচ্ছা ঐ যে ছেলেমানুষেব মতো বললে বোঝাই করা ট্যাঙ্ক থেকে কোন টিউব ফিউব দিয়ে জল আসবে। বয়লারের নিজস্ব প্রেশার নেই ? আড়াই শো পাউণ্ড প্রেশারেই এসে এক্সপেরিমেণ্ট ঠেকেছে আজ। এর চেয়ে বেশী প্রেশারে ফায়দা নেই। সাড়ে চার শো পাউণ্ডের বয়লার তৈরী হয়েছে আগে। প্রেশার যতো বেশী তার প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ততো জোরদার করতে হবে তো! বয়লারের এই নিজস্ব চাপের ওপর যেতে পারলে তবে তো ঢোকার রাস্তা পাবে জল। কাজেই জল পোঁছে দেবার চাপ এর বেশী হওয়া চাই। তারই ব্যবস্থা ছিল আগে ফীড ওয়াটার পাম্প। আজকাল ইনজেকটার। একটা ক্রমশ সরু-হতে-থাকা চোঙের মধ্যে দিয়ে স্টিম আনা হল। ভালভ রইল, প্রয়োজন মতো স্টিমের যাওয়া আসা বন্ধ করার। এই স্টিম, সব কাজ সেরে মেইন ভালভ থেকে বেরিয়ে যাবার পথের একজস্ট স্টিমও হতে পারে। গম্বুজ থেকে আনা তাজা স্টিমও হতে পারে। এই সরু-হয়ে-আসা চোঙের মধ্যে আনা হয়, তার ভেলসিটি—কতোদূর পড়েছ দাস ?

—আজ্ঞে আই. এস-সি গুরুজী। পাশ করি নি। পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।

গুরুজী! ফুটফুটে এই হিন্দু ছেলেটি গুরুজী বলল তাকে!—খালেক

খাড়া হয়ে বসল তার ইজিচেয়ারে। তাকে তো আজকাল সম্মান করে না কেউ। তার এখানকার জীবন এখনকার অস্তিত্ব কলঙ্কের কালি মাখা।

মাথা থেকে নীল রুমালটা খুলে মুখটা মুছে ফেলল খালেক। শেডে ইঞ্জিন নেই, কালিও ছিল না তাই। কালি থাক না থাক, মাঝে মাঝেই মুখ মোছে খালেক। বোধ হয় কল্পিত কলঙ্ক মুছে মুছে ফেলে।

নিখিলেশের মুখের প্রতিটি রেখা খুঁটিয়ে পরখ করল খালেক। না, ঠাট্টা নেই, আছে জ্ঞান পিপাসা। জানবার আগ্রহ ছটফট করছে।

কলকে থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল না আর। ফরসিটাকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে কলকেয় ফুঁ দিতে লাগল। ছাইচাপা আগুনকে চাঙা করার চেষ্টায়।

আর একটা ছাইচাপা আগুনকে ফুঁ দিয়ে উস্কিয়ে তুলছিল ওস্তাদ। ঐ একই সঙ্গে।

আগুনটার নাম নিখিলেশ।

হাসতে হাসতে খালেক বলে—আই. এস-সি অবধি পড়েছ, ঘুরে বেড়াও ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে। বুঝতে পেরেছি—প্রেম দিওয়ানা হয়েছ তুমি।—

কি বলছিলাম! ভেলসিটি, না! বাংলা 'বেগ'। ঐ ছুঁচলো চোঙের মধ্যে দিয়ে স্টিমকে আনা হয়, শুধু তার ভেলসিটি বাড়াবার জন্য। এইখানে এসে, সেকেণ্ডে সতেরো শো ফুট—তার মানে ঘণ্টায় এগারো শো ষাট মাইল ভেলসিটি হয়ে যায় তার। একে তো নজল সরু, তার মধ্যে দিয়ে স্টিম ঐ দুরন্ত বেগে আসছে। এসে মিশল টিউবের মধ্যে, টেণ্ডার থেকে আসা ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শ পাচ্ছে। ঠাণ্ডার ছোঁয়া লাগলে স্টিম কনডেনসড হয়ে যায়। হঠাৎ কনডেনসড বা জল হয়ে যাওয়ায় আয়তন যায় অনেক কমে। তার অনিবার্য পরিণতি—ভ্যাকুআম সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু জানো তো জগতে কোথাও ভ্যাকুআম বা শূন্যতা থাকতে পারে না!

—হয়তো জীবনেও। বসিরহাট কুইন বেহাত হল যখন, ভেবে-ছিলাম এ-খালি আর ভরাট হবে না বুঝি—

যাক, যা বলছিলাম। ঐ পরিমাণ ভেলসিটির সঙ্গে যোগ দিল নতুন তৈরী ভ্যাকুআম। সোনার সঙ্গে সোহাগার সোহাগ যেন। আরো আছে—এর ওপর তিন নম্বর। জলের ওজন আর স্পিডের দরুণ মোমেন্টাম।—গালভরা বাংলা, ভরবেগ। এই তিনে মিলে নজলের ঐ স্টিম নিজের ওজনের বারোগুণ জল বয়লাবে চালান করে দেয়। কতো স্পিডে জানো? ঘণ্টায় নব্বুই মাইল।

কোনো কারণে, জল বেশী চলে গেলে তার জন্য ব্যবস্থা আছে। ওভার ফ্লো চেম্বাব। বাড়তি জল ধবে বাখার। ব্যাপারটা জটিল নয়। নজল থেকে বেরিয়ে টেণ্ডারের ঠাণ্ডা জল টেনে নিয়ে ফীড ওআটার ঢোকে ডেলিভারি টিউবে লং জাম্পে একটা ফাঁক ডিঙিয়ে। এইখানেই সে প্রয়োজনের বাড়তি জল ফেলে বেখে যায়। লং জাম্প ডিঙিয়ে দবকারী পরিমাণ জলই ডিলিভারি টিউবে যেতে পায়, বাড়তি জল ওভার ফ্লো চেম্বারে চলে যায়।

জোসেফ যে ভাবে সব কিছু দেখে শুনে চেক করে নিল, তাতে আমার চিন্তার কিছু রইল না। না, ভয় নেই জোসেফ পারবে। তবে বয়েসটা বড়োই কম—এই যা—

নিখিলেশ বলে—একটু বলে যান না। ইনজেকটার ট্রাই করে নিল। তাবপর—?

—ও,—নোট নিচ্ছিলে তুমি, না? তারপব? তাবপর স্মোক বক্সের দরজাটা ভালো টাইট করে আঁটা আছে কি না, দেখা। ইঞ্জিনের সামনেকার গোল ঢাকাখানা ঐ যে রাক্ষুসে বোল্টু দিয়ে আঁটা থাকে, ওটা দেখনাই নয়। ওটাব দবকার আছে। স্মোক বক্সের দরজা ঢিলে আলগা থাকলে ড্রাফটেব অসুবিধে হবে। ড্রাফট বোঝ সাকরেদ?

হাঁ করে থাকে নিখিলেশ—না তো—

—উনুন ধরাতে হাত-পাখা দিয়ে হাওয়া করতে হয় দেখেছো? ধরে গেলে আর দরকার হয় না, কেন? কয়লাটা হাওয়া ছাড়া জ্বলে না। কয়লা কেন কেউই। কয়লা পুড়লে তাপ সৃষ্টি হয় কেন জানো?

কয়লায় আগুন দিলে কয়লা থেকে নানা রকমের গ্যাস সৃষ্টি হয়। সেই গ্যাস হাওয়ার সঙ্গে মিশলে তাপ তৈরী হয়। এই হাওয়া-মিশোনর ব্যাপারটার নাম কমবাশচান। এরি জন্যে হাত পাখা ব্যবহার। কয়লা একবার ধরে গেলে হাত পাখা দরকার হয় না আর। উনুনের ওপর দিককার হাওয়া গরম। গরম হাওয়া হাল্কা। ক্রমাগত আকাশে উড়ে যাচ্ছে। উড়ে যেতে যেতে উনুনের মুখ দিয়ে আপনিই হাওয়া টেনে নিচ্ছে। অবিরাম হাওয়ার প্রবাহ চলেছে জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে দিয়ে। এক কয়লাকে জ্বালিয়ে দিয়ে। দুই, কয়লা থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসের সংস্পর্শে এসে তাপের সৃষ্টি ক'রে। এই কারণেই মিল ফ্যাকট্রীর চিমনি অতো উঁচ—। এই বয়লারের সামনে সোঁ সোঁ আওয়াজ হয়। চিমনি ওপর দিকে এতো জোরে হাওয়া টানে যে, কাগজের কুঁচি উড়িয়ে দিলে চোঁ চোঁ করে টেনে নেয় বয়লারের মুখ। লোকোমোটিভের চিমনি উঁচু করা সম্ভব হয় না। দরকাবও হয় না তাব। বয়লারের গোটা লম্বাটাই চিমনির কাজ করছে। যেখানে বয়লারের মুখে কয়লা মারা হচ্ছে সেখান থেকে চিমনি পর্যন্ত সবটাই চিমনি। এরই নাম ড্রাফট্। বায়ুপ্রবাহ। প্রতি একশো পাউণ্ড কয়লায় আশী পাউণ্ড কাববন, পাঁচ পাউণ্ড হাই-ড্রোজেন। বাকিটা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ছাই ইত্যাদি। এক পাউণ্ড কয়লা হিসেব করে পোড়াতে পারলে চৌদ্দ হাজার ইউনিট তাপ পাওয়া যায়।

নোট নেবার কিছু নেই। মোটামুটি চৌদ্দ হাজার সংখ্যাটা, গ্যাস ক'টার নাম লিখে নিল নিখিলেশ। এর মধ্যে অনেক কথাই জানা ছিল তার।

কুচকুচে কালো ধোঁয়া আর ধূসর রঙের ধোঁয়াব যে পার্থক্য তাও বুঝিয়ে দিল খালেক। ধোঁয়া যতো কালো, জানতে হবে ততো কারবন রেণু অক্সিজেনের সঙ্গে না মিশে কাজ না করে উড়ে পালাচ্ছে! কারবন মনক্সাইড, ডায়ক্সাইডের ক্ষতিকারিতা কেমিস্ট্রির পাতা থেকে জানা ছিল তার।

সেদিন বাড়ী ফিরল নিখিলেশ শিস দিতে দিতে।

কুন্তলা বলল—এতো খুশী যে! ব্যাপার কি? আর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা পেয়ে গেলে নাকি?

—চানটা করে আসি আগে, বলছি।

স্নান সেরে এসে নিখিলেশ বলল—একটা পেল্লায় দুনিয়া। জল, কয়লা, আগুন, স্টিম, অসংখ্য ঘড়ি, স্পীড—সে এক এলাহি ব্যাপার! নিজের গতরখানির ওজনই একশো পঁয়ত্রিশ টন তার ওপর অর্ধাঙ্গিনীর ওজন তো আছেই।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে থাকে কুন্তলা—অর্ধাঙ্গিনী? সে আবার কি?

নিখিলেশ বলে—অর্ধাঙ্গিনী নয়! জীবনে চলার পথে আগে থেকে অন্ন জল সংগ্রহ করে রাখে। ক্ষিদের সময় কয়লা, তেষ্টার সময় জল জুগিয়ে যায়। ইঞ্জিনের সঙ্গে তিন ইঞ্চি ব্যাস লিড স্ক্রুর গাঁটছড়া বাঁধা। জন্ম জন্মান্তরের জীবনসঙ্গিনী টেণ্ডার না থাকলে ইনজিনও নেই। জীবনসঙ্গিনী না থাকলে জীবনই নয়। বিশেষ যে জীবনসঙ্গিনী অন্ন জলের জোগানদার।

নিখিলেশের মুখের ভাব গম্ভীর। কুন্তলা তাই বলে হাসি বন্ধ করে না। এ হাসি আনন্দের। একটা বিষয়েও অন্তত সীরিআস সীরিআস দেখাচ্ছে নিখিলেশকে। কুন্তলার ভালোবাসার ভান ফল দিচ্ছে।

কুন্তলা বলে—থামলে কেন, বলে যাও! বেশ লাগছে শুনতে।

নিখিলেশ চুপ করে ছিল। নতুন করে সুরু করল—জানো, খালেককে গুরু ধরলাম আজ।

পরদিন সকাল সকালই বের হল নিখিলেশ। খালেকের আসার আগেই শেডে গিয়ে হাজির। খালেকের ছায়া হয়ে রইল নিখিলেশ। কি করে কোনটা খোলে, কি দেখে, কোনটা চেক করে—সব নজর করতে লাগল। হাত বাড়াবার আগে যন্ত্রপাতি এসে পড়তে লাগল হাতে। মুখ খোলার আগেই কাজ সারা—ভালো লাগল খালেকের। বড়ো চমৎকার। লেখাপড়া জানা সাকরেদের রকম সকমই আলাদা। আরো দেখেছে খালেক।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। আকাশের কলস রূপোর জল গড়িয়ে গড়িয়ে ফুরিয়ে এসেছে। এসে ঠেকেছে তলানির সোনার জলে। সেই ক্লান্ত বিকেলে ইজিচেয়ারের পাশে এসে বসল সাকরেদ।

আর এমন চমৎকার! বসেই কাজের কথা সুরু করল না। গল্প জমাতে চাইল। ব্যবহারে মুগ্ধ গুরুজী। বয়স শেষে সাকরেদের মতো সাকরেদ পাওয়া গেল একটা। দেবার যা কিছু উজাড় করে দিতে লাগল সব।

নিখিলেশ শুধোল—কালকের গল্পটা গুরুজী—শরীর গতিক ভালো তো!

চোখ বুজল খালেক। ফরসির নল চাইবার আগে হাতের মুঠোয় পেল। এগিয়ে দিল নিখিলেশ!

চোখ বুজে গালের কপালের রেখায় রেখায় হাসতে লাগল খালেক। নিঃশব্দে। তারপর বলতে লাগল—বিকেল দুটো পঁয়ত্রিশে ছাড়ত শিয়ালদা। ঘুঘুডাঙায় দাঁড়াবে না। একেবারে পয়লা স্টপ দত্তপুকুর। আধঘণ্টার কিছু বেশী। পার করলুম দত্তপুকুর। সামনের জানলা দিয়ে তাকিয়ে একপাশে জোসেফ আর একদিকে খোন্দকার। চমৎকার চালাচ্ছিল জোসেফ। এঁটুকু ছেলে—পথের সব কিছু মুখস্থ। কোথায় মোড়, কোথায় বাঁক। কালভার্ট কোথায়, কোথায় ব্রিজ। এমন কি কোথায় ক'টা লেভেল ক্রসিং তা পর্যন্ত—

নিখিলেশ বলল—একমাত্র লোকোমোটিভেরই তো স্টিআরিং নেই। তবে বাঁক মোড় লেভেল ক্রসিং জানতে হবে কেন? খালেক বলে—জাংশানে, লেভেল ক্রসিংয়ে আর বাঁকে স্পিড কমাতে হয়! নইলে দৌড়ের ঝোঁকে ইঞ্জিনটা সিধে চলে যেতে চায়। বাঁক মানে না। ব্রিজের ওপরও নজর না রাখলে ঐ একই ব্যাপার। ইঞ্জিনের মর্জি বোঝা দায়। জল খেতেই নেমে গেল হয়তো। পেটে অতো বড়ো আগুনটা! জ্বালা কম? জন্মে থেকে ক্ষিদে-তেষ্টার জ্বালায় বেচারা ঘণ্টায় ষাট সত্তর মাইল ছুটোছুটি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে! কোথায় অন্ন কোথায় জল। এক পেট কয়লা খেয়ে ক্ষিদেই বেড়ে যাচ্ছে নিবৃত্তি নেই। সেই কবে

জন্মেছিল! কেউ ভানবারটন কেউ সাদামটন কেউ পঞ্চাশ কেউ ষাট বছরের বুড়ো!—যাত্রীবা টের পায় নি স্পিড কমেছে। বড়ো বড়ো চোখে ফায়ারম্যান ড্রাইভার তাকিয়ে আছে দুপাশের ফোকর দিয়ে। কয়েক গজ দূরে ওৎ পেতে নেই তো কেউ! যার নখ আর দাঁত এত ধারালো যে এতোগুলো লোককে এক লহমায় কিমা বানিয়ে নিতে পারে।····কোনো ব্রিজে উঠতে, কোনো বাঁক ঘুরতে—লেভেল ক্রসিংয়ে ফায়ারম্যান ড্রাই-ভাররা প্রায় দমবন্ধ করে সামনে তাকিয়ে থাকে।—দূব আকাশে তাকালো খালেক। তারপর চোখ বুজলো। মানুষ দূব আকাশে তাকিয়ে অতীতকে দেখে আসে তারপর চোখ বোজে। আনন্দময় স্মৃতি হলে রোমন্থন করতে। বেদনাময় হলে ভুলে যেতে। আর, ভয়ংকর হলে ভয় পেয়ে।

খানিক পরে খালেকই বললো আবার—আমি তা করি নি। বেশী একসপার্ট হয়ে গিয়েছিলাম কিনা। নেক্স্ট স্টপ গোবরডাঙ্গা যখন ছাড়ালুম তখন আমি একপ্রকাব নিশ্চিন্তি। ইঞ্জিনের চিন্তার চেয়ে টেণ্ডারের চিন্তা জোর হয়েছে আমার। জীবনের চেয়ে জীবনসঙ্গিনীর। বরিশাল কুইনের চেয়ে বসিরহাট কুইনের। জানো তো দত্তপুকুরের অল্প আগে বারাসত। বারাসত বসিরহাট কথা দুটো বা জায়গা দুটো যেন যমজ। বসিরহাট কুইনের চিন্তা নিয়ে গাড়ীতে উঠেছি। মাথা তখন এতো গরম যে ওঠার আগে বদব বদর করি নি পর্যন্ত। বাপ দাদা ছিলেন মাঝি। জলের নৌকোব। আমিও মাঝিই—ডাঙার নৌকোর।—বাপ দাদা যাত্রা আরম্ভ করার আগে 'বদর' 'বদর' বলে গলুই নমস্কার করে পা দিতেন নৌকোয়। আমিও অন্য কোন পীরের নাম জানি নে। 'বদর' বদর' বলেই গাড়ীতে উঠি।—সেদিন আমার ভুল হল। পীর আড়াল পড়ে গেলেন এক রক্তমাংসের মেয়েমানুষের পিছনে।—বারাসত ছাড়িয়ে বসিরহাট মাথার মধ্যে দপদপানি তুলে দিলে। মাথা ছিঁড়ে পড়তে লাগল।—সিটে বসলুম।

নিখিলেশ বললো না কিছু। তার মনে হল ড্রাইভারের তো কই সীট দেখি না! পরে জিজ্ঞেস করে জেনেছিল দুপাশ থেকে বের করা দুফালি

লোহার পাত, ঐ দুটোই সীট। কোন কোন মেল এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনে সীট থাকে।

খালেক বলে যেতে লাগল—বসে, বিশ্বাস করো, ঝিমুনি এলো না। ঝিমঝিম করতে লাগল মাথা। অসহ্য যন্ত্রণা। রগ টিপে চোখ বুজে বসে রইলুম। বনগাঁয় উঠে দাঁড়ালুম, বনগাঁ ছাড়লুম। ছাড়লে আবার বসলুম।—এবার আমি আর পাচ্ছিলুম না। চোখ বুজে বসেছিলুম। ট্রেনের স্পীডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার চিন্তা চলেছে অমনি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল স্পীডে—

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করল—চোখ খুলে খুলে এক একবার স্পীডো-মিটার দেখে নিচ্ছিলেন বুঝি?

হাসল খালেক—চোখ খুলে স্পীডোমিটার না দেখলে স্পীড জানা যায় না বুঝি। এক একটা রেল কতো লম্বা! কটা রেল পার হচ্ছে মিনিটে! এই থেকে বোঝা যায় না? বিলেতের হিসেব বলে দিচ্ছি। ষাট ফুট লম্বা সেখানে রেল। অবশ্য পঁয়তাল্লিশ ফুটী রেলও পাওয়া যায়। একশো কুড়ি ফুটী রেলের এক্সপেরিমেণ্ট চলছে আজকাল। আমার মনে হয়, তাপে বৃদ্ধি আর ঠাণ্ডায় কমতি শুধু এই জন্যে—ঐ যে-কোএফিশিয়েণ্ট অব একসপানশান, তুমি তো আই. এস-সি অবধি পড়েছো—মাঝখানে ফাঁক রেখে এতো ছোটো লেংথের রেল বসানোর মানেই হয় না। এমন কি আমাদের গরম দেশেও! আমাদের দেশের রেল লম্বায় কতো? চোখ বুজে গাড়ীর স্পীড বলতে পারা চাই। বিলেতে মিনিটে বাইশ খানা রেল পার হলে গাড়ীর স্পীড হলো পনেরো। অথবা একচল্লিশ সেকেণ্ডে যটা রেল, তঁতো মাইল ঘণ্টায়। তেমনি ষাট গজ অন্তর টেলি-গ্রাফের পোস্ট। মিনিটে ত্রিশটা পোস্ট পার হলে ঘণ্টায় ষাট মাইল!

—যা বলছিলাম। স্পীড তখন পঁয়তাল্লিশ! ঐ স্পীডে-ও, চোখ তো আমার বোজা ঘড়িও তো দেখছি না। স্পীড জানলাম কি করে? রেল পার হচ্ছে খটাখট খটাখট—ঐ আওয়াজই যথেষ্ট।—ঐ পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে তখন আমি বসিরহাট কুইনের আর বরদাচারের বুকে ছুরি চালিয়ে

চলেছি।—সর্বনাশ চিন্তা করছি। অমঙ্গল প্ল্যান করে চলেছি। বরদাচার নয় বদাচার। বয়লারের আগুনের মতোই প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে মাথায়। জোসেফই চালাতে লাগল। স্টেশান এলে আমি উঠে দাঁড়াতে লাগলুম—এই অবধি!··এমনি করে দৌলৎপুরের আগে এসে বরিশাল কুইন আর দাঁড়ালো না। এমনি বরাত—দৌলৎপুরেও নয়।

—দৌলৎপুর তো ছোট্ট স্টেশান—

—কালিয়া বা নড়াইল লাইনের স্টিমারের যোগাযোগও কিনা! এক খুলনায় আর এক দৌলৎপুরে। কলকাতা থেকে খুলনা—কালিয়ার মাঝামাঝি স্টেশনে যেতে গেলে দৌলৎপুর অনিবার্য—

—কেন দাঁড়ালো না?

—দৌলৎপুরে আমার এক্সপ্রেস আর দাঁড়ালো না কোনদিন। খুলনায় গিয়ে না খোলা হয়ে দাঁড়ালো আমার দৌলতের পুরী। লাইনে বেরনো সেই আমার ইতি। দৌলতের পুরীর দুয়োর চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল দাস—আমার জীবনে।

কি যেন চিন্তা করে নিল ওস্তাদ। পরে বলল—দোষ আমার বা জোসেফ কারোরই নয়। দোষ সেই রাতের আর আমার বরাতের।···· বরাত মানো, দাস?

বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হল না নিখিলেশকে—মানি না আবার! তিনতলা থেকে ইয়ার্ডে পৌঁছে দেয়। কয়েক বছর তো এক লহমা তার কাছে। একশো মাইল তার স্পীড।

বলে ফেলেই নিজের কানে কেমন ঠেকল যেন। ভাগ্যের বিরুদ্ধে কোনদিন অভিযোগ ছিল না তো তার। এ নালিশ জাগিয়ে তুলেছে কুন্তলা। কুন্তলাই, কুন্তলা নয় কুন্তলার ভালোবাসাই তার নিরুদ্বিগ্ন মনে উদ্বেগের আমদানী করেছে। নইলে, খোলার চালায় থেকেও তো তার মনে অতৃপ্তির লেশমাত্র ছিল না।

কথাটার মোড় ফেরাবার জন্যেই নিখিলেশ শুধোল—আচ্ছা, একশো মাইল স্পীডের কোন ট্রেন আছে পৃথিবীতে ওস্তাদজী?

খালেক বলল —নব্বুই আছে শুনেছি। একটা লেকের পাড় ঘুরে যায়—একটা একটানা বাঁকু। কন্টিনিউআস কার্ভ। স্পীড কমায় না। নব্বুই মিনিট পর জিরোয়।—সে কথা থাক। স্পীডের সোঁ সোঁ আওয়াজে তুমি একটা কথা ডুবিয়ে দিতে চাইছ দাস। তিনতলা থেকে ইয়াডে নেমে এসেছ। কেন?

নিখিলেশ বলল—দেখেই তো বুঝতে পারছেন। অকম্মার ঢেঁকি আমি—কিচ্ছু হবে না আমার দ্বারা—

খালেক বলল—কে বলেছে তোমাকে? বারুদ আছে তোমার মধ্যে। আমি তোমায় জ্বালবো—শুধু দেশলাইর কাঠি একটি।—দৌলৎপুরে দাঁড়ালো না কেন। একশো পাঁচ মাইল চলে এসে বাকি পাঁচ মাইল আর চলল না।… ঠিক উল্টো বললাম—চললই। চলন তার থামল না। ব্রেক কাজ করল না। তার মানে, ট্রেন পাইপে অবস্ট্রাকশান। বাধা।

—ট্রেন পাইপ? অবস্ট্রাকশান? ব্রেক সিস্টেমটা ঠিক বুঝি না গুরুজী—

হো হো করে বেদনার হাসি হাসল গুরুজী। অট্টহাসির মতো শোনালো সেটা। তারপর গম্ভীর হয়ে এলো মুখের চেহারা। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল—হাঁটা শিখতে হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই আসে। চলাটা একটু একটু শিখতে হয়। দৌড়নো অবশ্যই শিখতে হয়। জীবনের রেসে দৌড়তে সবাই পারে না।—তারো চেয়ে বেশী দরকার ব্রেকের ব্যবহার জানা, ব্রেক কষতে শেখা। থামতে শেখা। আমি এটে পারি নি। বরিশাল এক্সপ্রেস থামাতে পারি নি। খোদা তাই একেবারে থামিয়ে দিয়েছেন। এইখেনে বসিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্রেকের ব্যবহার শিখি নি বলে—।

ব্রেক তিন রকমের। স্বয়ংক্রিয় ব্রেক চলে কমপ্রেসড এআরে। বাতাসকে চেপে চেপে কমপ্রেস করে একটা চৌবাচ্চায় ধরে রাখা হয়। ড্রাইভারের ব্রেক ভালভের সাহায্যে ট্রেণ পাইপে, সেই থেকে প্রত্যেক গাড়ীর অকজিলিআর রিজার্ভয়েরে এই কমপ্রেসড এয়ার জমা থাকে। এ ব্রেক—বেশী ভালো। এতো ভালোর দরকার নেই। তার চেয়ে কম

ভালো স্টিম ব্রেক। বয়লার প্রেশারে স্টিম ইঞ্জিনের ফুটপ্লেটের তলায় অপেক্ষা করে থাকে। একটা সিলিণ্ডারের মধ্যে একটা পিস্টন। সেই পিস্টনের পিছনে গিয়ে লুকিয়ে থাকে স্টিম। মুক্ত করে দিলে এই পিস্টন। ওপরে উঠে যায়। ট্রেন পাইপের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায় তার। ট্রেন পাইপে হাওয়া ঢুকিয়ে দেওয়া তো আছেই। এই ব্রেকও থাক।

হেসে ফেলল নিখিলেশ—বেশ! এক নম্বর বাদ গেল খুব ভালো বলে। তারপর দু নম্বরও। বলুন এখন সব চেয়ে খারাপ, তিন নম্বরের গল্প!

হাসল খালেকও—সব চেয়ে খারাপ হলে হবে কি, ব্রেক হিসেবে থার্ড ক্লাস নয়! এটাই দুনিয়ার সব জায়গায় চালু। সব দেশে সব জায়গায় এই ভ্যাকুআম ব্রেক!

নিখিলেশ বলল—বেশ মজার কল তো! একটা বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি করে তারপর তা দিয়ে কাজ করানো ইনজেকটারের মতো। বায়ু ছিল, সেই বাতাস টেনে বের করে বায়ুশূন্য করা! জল ভরতি ঘড়া। জল ফেলে খালি করে জল আনতে যাওয়া। শ্রীরাধার মতো।

খালেক বলল—যাক এখানেও ইজেকটার। বহিষ্কারক। অবিকল ইনজেকটারের মতো—কাজে কম্মে। সেই স্টিম, একের পর এক ক্রমশ সরু কোণের মধ্যে দিয়ে এনে তার বেগ বা ভেলসিটি বাড়িয়ে দেওয়া। তারপর ঠাণ্ডা লাগিয়ে হঠাৎ কনডেনস করে ফেলা। অতোখানি স্টিম এক সেকেণ্ডে একবারে জল। একঘর হাওয়া এক মুহূর্তে এক বিন্দু হওয়া তার মানেই দুরন্ত ভ্যাকুআম। বায়ুশূন্যতা। এই ভ্যাকুআম ভরাট করতে ট্রেণ পাইপের যাবতীয় হাওয়া এসে হাজির। ফলে ট্রেণ পাইপ নিজেই ফাঁকা, বায়ুমুক্ত।

ট্রেণ পাইপ ভেবে নাও একটা একটানা পাইপ। প্রত্যেক যাত্রী-গাড়ীর কামরা বা মালগাড়ীর ওয়াগনের তলা দিয়ে চলে গেছে। দুই কামরার মধ্যিখানের হোজ পাইপের কানেকশান দিয়ে যোগ করা। গাড়ীর য়্যালার্ম চেন টেনেছ কখনও দাস?

—না গুরুজী।

—তার মানে বিপদে পড়ো নি কোনদিন। চেন টানলে কি হয় বলো তো?

নিখিলেশ বলল: কি যেন একটা লিক করে বেরিয়ে যায়। পুস্-স্ করে আওয়াজ হয়—

—বহুৎ খুব। ব্রেক সিস্টেমটার অনেকটাই বাইরে থেকে দেখা যায়। কি কি দেখেছো?—এ কি চললে কোথায়? দেখে আসতে? নো নো—মন থেকে বলো—

নিখিলেশ বসে পড়ল আবার? বলল—বড়ো বড়ো সিলিণ্ডার থাকে প্রত্যেক কামরার তলায়। তার পিস্টনের সঙ্গে লিভার ফিট করা। পিস্টনটা নেমে এলে লিভারের আর এক মুড়োর ব্রেক শু চাকার গায়ে চেপে বসে।

খালেক আনন্দের চোটে ঈজিচেয়ারে উঠে বসে বলল—নট ব্যাড। কিন্তু উল্টো হল যে। তুমি যা বললে ওটুকু স্কুল বয়েরাও বলতে পারত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পিস্টনটা নেমে আসবে, না উঠে যাবে কি করবে! সমস্ত ট্রেণ পাইপটা ভ্যাকুআম বা বায়ুমুক্ত করা আছে। পিস্টনটা নিজের ওজনে নিচের দিকে পড়ে আছে। ভ্যাকুআম নষ্ট ক'রে ট্রেণ পাইপে হাওয়া ঢুকিয়ে দেয়া হ'ল। এইটেই লিকের আওয়াজ। এই হাওয়া পিস্টনের তলায় চাপ দিয়ে ওপরে উঠিয়ে দিল। পিস্টনের ওপরে সিলিণ্ডারের মধ্যেকার অংশ বায়ুমুক্ত ছিল। কাজেই তলায় ঢোকানো হাওয়া অতি সহজে পিস্টনকে ওপরে তুলে দিতে পারে। সহজে তুলে দিলেও চাপটি সোজা নয়। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় আধ পাউণ্ড। এমনি করে একুশ ইঞ্চি ব্রেক সিলিণ্ডারে তিনশো চৌত্রিশ বর্গ ইঞ্চির ওপর চাপটা কি সোজা হল? মোট প্রেশার গিয়ে পড়ল দেড়হাজার পাউণ্ডের ওপর। এক হাজার পাঁচশো সত্তর। ব্রেক সিলিণ্ডার নানা আকারের আছে। পনেরো ইঞ্চি, আঠারো ইঞ্চি, একুশ ইঞ্চি, চব্বিশ ইঞ্চি। ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে ড্রাইভারের কাছাকাছি বসে চালানো দেখেছ? প্রত্যেক স্টপের আগে আগে ভ্যাকুআমের হাতল টানে। ফোঁ-স

ফোঁ-স। কাঁটাটা নড়ে খানিকটা ডান দিকে এলো। গাড়ীর গতি কমে এলো। থামে নি কিন্তু। হাতল ছেড়ে দিল। কাঁটা বাঁ দিকে গিয়ে 'জিরো'তে ঠেকল। আবার হ্যাণ্ডল চাপল। এমনি করে একবারে নয় বারে বারে একটু একটু করে ভ্যাকুআম নষ্ট করে। ট্রেনও অবিকল তাই! ইজেকটার আবার দুটো। ছোট, বড়ো। ছোটটার ব্যবহার প্রত্যেক স্টেশনে আসার আগে আস্তে আস্তে স্পীড কমিয়ে আনার কাজে। বড়োটার ব্যবহার য়্যাকসিডেণ্টে। স্টেশনে আসার আগে ইঞ্চি দশেক ভ্যাকুআম নষ্ট করলেই যথেষ্ট।

নিখিলেশ খানিক বুঝল খানিক বুঝল না। মনে মনে নোট করে রেখে দিল—য়্যালার্ম চেন টানলে—?

—শুধু সেই কামরাটার ভ্যাকুআম নষ্ট করতে পারে সে। সবটার নয়। গাড়ীর গতি হয়তো কমে, তার চেয়েও বেশী, ড্রাইভার গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সে। তার কামরার ব্রেক শু-ই চেপে বসেছে মাত্র। থামানোর কাজ আসলে ড্রাইভারের। কোন প্যাসেঞ্জারের হাতে গাড়ী বন্ধর ক্ষমতা তুলে দেওয়া যায় না তো। নিরীহ ভদ্রলোক যেমন প্যাসেঞ্জার ডাকাত গুণ্ডাও তেমনি প্যাসেঞ্জারই।

পুরোন প্রসঙ্গে ফিরে এলো নিখিলেশ—দৌলৎপুরের আগে ভ্যাকুআম কাজ করল না কেন?

—অবস্ট্রাকশান। বাধা। ট্রেন পাইপের মধ্যে বাজে সুতোর তাল ঢুকে গিয়েছিল। ব্রেক রিলীজ করলেও ট্রেন পাইপে হাওয়া ঢুকতে পারল না। ভ্যাকুআমই রয়ে গেল। বড়ো ছোট কোন ইজেকটারই কাজ করল না।

—কি করলেন তা হলে?

খালেক বলল—চলতি অবস্থায় ট্রেন পাইপের হোজ কানেকশান টেণ্ডারের গা থেকে খুলে দিলাম। স্টিম বন্ধ ছিল। ট্রেন পাইপের মুখ খোলা থাকায় আস্তে আস্তে হলেও হাওয়া ঢুকল। গাড়ী দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রায় খুলনা। গার্ডের গাড়ী তখন থাকত শেষের দিকে। প্রভাস লাহিড়ী হ্যাণ্ড ব্রেক অন করেও সুবিধা করতে পারেন নি।

—কি করেই বা জানবেন কোথায় সেই সুতোর তাল ?

—এই যে এখেনে—বলে খালেক কপাল নির্দেশ করল নিজের।

—বের করলেন কি করে ?

খালেক বলল—লার্জ ইজেকটার খুলে যতোখানি বেশী পারা যায় ভ্যাকুআম সৃষ্টি করতে হয়। তারপর হোজেব প্লাগ খুলে হঠাৎ হাওয়া ঢুকিয়ে দিতে হয়। তাতে হাওয়ার সঙ্গে অতি বেগে ঐ অবস্ট্রাকশন ইজেকটারের দিকে ধাওয়া করে। বার কয়েক করলে তবে আশা করা যায় হাতের নাগালে এসেছে পথের কাঁটা। ইজেকটারের তলায় নাট খুলে বের করে ফেলা যায় তখন।

নিখিলেশ বলল—এতো বড়ো ব্যাধি! আগে থেকে টের পাওয়া যায় নি কিছু ?

—নিশ্চয়ই। সেখেনেই তো বরিশাল কুইনের ওপর টেক্কা মেরে গেল বসিরহাট কুইন। বসিরহাট কুইনের কথা ভাবছিলাম। জোসেফের হাতে জীবন মরণের ভার ছেড়ে দিয়ে সিটে বসেছিলাম চোখ বুজে। আমি জানতাম—পরে বুঝেছি প্রত্যেক স্টেশনে ঢোকার মুখে ব্রেক কষার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই কাঁটা কেঁপেছে তির তির করে। ড্রাইভারের ডুপ্লে গেজে দুটো কাঁটা লক্ষ্য করেছ তো! একটা লাল একটা কালো। লাল কাঁটা কেঁপেছে। কারণ, মুখ জাম থাকার জন্যে না হয়েছে পুরো ভ্যাকুআম না ঢুকেছে হাওয়া পুরোপুরি প্রয়োজন মাফিক।—লাল কাঁটা কেন কেঁপেছে তুমি আমায় কাল এসে বলবে।—

বরিশাল কুইন তো আমায় দৌলৎপুরে ধরা দিল না। বসিরহাট কুইনেরও সন্ধান পাই নি আর।—বিয়ে করো নি তো দাস।

—আজ্ঞে না।

—প্রেম করে বেড়াচ্ছ! না!—আমরাও করতুম এই বয়সে। উড়ে বেড়াবার বয়স এটা। আজও বাঁধা পড়ি নি আমি। আমার যা বয়েস এখন, প্রেম আর করা যায় না। অথচ বাড়ী গিয়ে সেবা যত্ন পাওয়া

দরকার। বাঁধা পড়লুম না, সে ভাগ্যও হল না। মেসে হোটেলে খাওয়া পোষায় না আর। কিন্তু উপায় কি!

গৌরবর্ণ। ট্রেনের গরমে কালী ধোঁয়ায় তামাটে। পুড়ে গেছে রং। খালেক মনে করে রং নয়, মুখই পুড়ে গেছে তার। চোখে দেখা কারণ বরিশাল কুইন, আসল কারণ বসিরহাট কুইন। পায় নি বলে ভুলতে পারে নি আজো। না-ধরা থেকে গেল আজো। এরকমটি ভাব জীবনে হয় নি।

খালেকের তামাটে মুখে বেদনার ছায়া পরিষ্কার হয়ে উঠল। নিখিলেশ স্পষ্ট পড়তে পারল তা। বাধা দিল না। চোখের জলে আস্তে আস্তে ধুয়ে যাক বেদনা—

খালেক বলে চলল—রংটা খুবই উজ্জ্বল। উজ্জ্বল রং দুরকমের হয়। কাঁচা হলুদ আর, দুধে আলতায় মেশা। এর ছিল লালচে আভাওলা। চোখ দুটি যে খুব বড়ো তা নয়। কিন্তু কথা বলা চোখ। নিচের ঠোঁটের বাঁ কোণে গালে একটি তিল। তিলোত্তমা নাম রেখেছিলুম আমি, অবশ্যই মনে মনে।

ভালো করে উঠে বসল নিখিলেশ। মন দিল, মনোযোগ দিল।

খালেক বলতে লাগল—স্টেশনে বসে কাঁদছিল। সঙ্গের লোক টিকিট কাটতে গেছে। আর ফেরে নি। বললাম আর ফিরবে না সে। মুখে না বললেও জেরা করে জানা গিয়েছিল। বিধবা। ঐ লোকটি ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতিতে চলে গেল আর ফিরল না, তার সঙ্গে মাস কয়েক ছিল।—ছোট্ট শহর। স্টেশনে গাড়ী চেপে পালাতে চাইলেই হল। আশ্রয় দিলাম আবার সেই আমরাই। চিড়িয়া বলল—হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান, জাত বিচার নেই আমার। আপনারা যে কেউ আমায় বিয়ে করুন আমি হিন্দু বিধবা। অর্থাৎ মেয়েটির জীবনে দুরন্ত ভ্যাকুআম। খাওয়া-পরায়, ব্যক্তিগত জীবনে। তারো চেয়ে দুরন্তবেগে মৌমাছিরা জুটছে। ঐ ইনজেকটার ইজেকটারের ব্যাপার। আমি বললুম আমি কিন্তু মুসলমান। বললে আপত্তি নেই। আমাদের মধ্যে ভি বি

বরদাচার ব্রাউন ছিল। নারীরাক্ষস ক্রিশ্চান। পরী বললে—আপত্তি নেই। আমি ব্রাউনের অসাক্ষাতে বললুম—বিয়ে করবে না ছাই। ও বিয়ে করবে কি? ও তো ক্রিশ্চান। ওর বৌ আছে না? পরী বললে—তালাক দেবে বলেছে। আমার আড়ালে ভি-বিও নিশ্চয়ই আমার নামে বলেছে। এটা স্বাভাবিক। দুজনের খোঁজের চেয়েও পরী তাই বেশী খোঁজ নিয়েছে অন্য জায়গার। বরিশাল এক্সপ্রেসের ঘটনার পরদিন সকালে বরদাচার এসে বললে—দাদা তুম ভি ফক্কা, হম্‌ভী। চিড়িয়া উড় গিয়া। তার চোখ মুখের চেহারায় কথাটা অবিশ্বাস হল না। বললুম—কাল রাত্রে তুমি দেখা করতে গিয়েছিলে তো! ভি-বি বললে—বাই জোভ, আমায় কাল ইমার্জেন্সিতে দিল না! আমি কাল বিকেল থেকে ও-ও-এস। আউট অব স্টেশান। তুমি বুঝি ঐ আনন্দে আছো।···· মেয়েটা আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিলে। লোক দুঃখু বলো, শোক বলো, একদিন ভুলে যায়। আমিও যেতুম। যদি না ঠিক তার আগের দিনই বরিশাল এক্সপ্রেস নিয়ে ঐ কাণ্ড ঘটতো। দুটো জড়িয়ে রইল। মেয়েটাই এই জন্যে দায়ী।—আর তা ছাড়া রূপও বটে! নাকটি টিকলো নয়, ছোট্ট! টিয়ের ঠোঁট নিয়ে কামড়াতে আসতো না। মুখখানি ভালোবাসা মাখা। ছোট্ট খাট্টো মেয়েটি। সত্যি চিড়িয়া। পাখীর মতো ছোট্ট। পাখীর মতো সুন্দর। পাখীর মতো হাল্কা। হাতের মুঠোর চাপে মনে হোতো প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে। একমাথা কোঁকড়া চুল, ছোট্ট ছোট্ট। কাঁধ ছাড়িয়ে নামত না। সব মিলে নিতান্ত কম মনে হতো বয়েস।

নিখিলেশের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মেঝেতে বসা থেকে উবু হাঁটু হয়ে বসেছিল আগেই। এইবার উঠে দাঁড়ালো।

দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলল—চলি আজ ওস্তাদ।

ম্লান হাসল খালেক—ইৎনি জলদি! নিজের ভালোবাসার লোকের কথা মনে পড়ল বুঝি? কিন্তু হোটেলওয়ালী কি সত্যি বিয়ে করবে তোমায়? শেষ পর্যন্ত—

পরিপূর্ণ চোখে তাকালো নিখিলেশ ওস্তাদের চোখে। তারপর ছুট

লাগালো। ইঞ্জিনের ছাই ফেলে মাঠের গাড্ডা ভরানো হয়েছে। পোড়া ঝামার মতো সিণ্ডার। তার ওপর দৌড়তে পায়ে লাগে। হোঁচট খেয়ে, হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে কবার। তারের বেড়া গলে নক্ষত্রবেগে ছুটতে লাগল সে।

পিছন থেকে একজোড়া সস্নেহ চোখ আপন বেদনার জলভারে নুয়ে তাকিয়ে রইল নিখিলেশের পিঠে। তারের বেড়া অবধি দেখা গেল আর দেখা গেল না। তারপর কোণাকুণি পাড়ি দিলে পান্থপাদপের ছায়া বেশী দূর নয় আর।

নিখিলেশকে তখন একসাথে অনেকে তাড়া করেছে। ইনজেকটার ইজেকটার ভ্যাকুআম। ভ্যাকুআম ভরতি করতে পাশাপাশি লোকের বা হাওয়ার দাপাদাপি। কালো তিল। কোঁকড়া চুল। বসিরহাট কুইন। ছোট্ট পাখী। নিজের ভালোবাসার লোক, তার কথা মনে পড়া। হোটেলওয়ালী কি বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত। অনেক অনেক—

তাড়া করেছে চিন্তার বাঘ।

হাঁপাতে হাঁপাতে হোটেলে এসে যখন সে পৌঁছল, বিকেলের আলো ডুবে যায় নি তখনও।

কেন তা বলা কঠিন, প্রিয়র মুখে তাকিয়ে বারে বারেই হাসি পেতে লাগলো নিখিলেশের।

পরের দিন ছিল রবিবার। কোর্ট কাছারীর ভিড় নেই হোটেলে। বেলা দুটো বাজলেই টেবিল চেয়ার মেঝে ধোয়া পোঁছা শেষ।

মেঝের সিমেণ্টে কোট আঁকা আছে বাঘবন্দীর। রবিবার বিকেলে বিকেলে সেই কোটে বাঘবন্দী করতে বসে যায় দুই নারী। কেউ ধরতে যায় রঙের জাল দিয়ে রূপের ফাঁদ পেতে! কেউ তার কেশের জাল বিছিয়ে দেয়। বাঘ কোটে ধরা পড়ে, তুচ্ছ জ্ঞানে ছেড়ে দেয় কেউ। কেউ ধরি ধরি করে নাচায় খানিকক্ষণ। ধরতে পারলে হয়তো শেষে সেও ছেড়েই দেয়।

আঁচল লুটিয়ে পড়ে বাঁ কাধ থেকে কোলে। ওপর অঙ্গে তখন শুধু জামাই। অন্যে উঠিয়ে দেয় কাঁধে। খোঁপা ভেঙে মাটিতে লুটোতে থাকে কারো চুলের ঝুল। মেঝের ধুলো থেকে সেই চুল কোলের ওপর উঠিয়ে দেয় অন্যজন। তখন তারা নিজেদের মধ্যে। চাকর বাকর আসে না কাছাকাছি। হাসাহাসিতে বিবশা, বাঘ শিকারের পরিশ্রমে বিবসনা না হলেও বিস্রস্তা। বাঘ শিকার কি সোজা হয়রানি!

সে রবিবার কাঁধের আঁচল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পিঠ দেখালে না কারো। চুল হয়তো একজনের ঝুলতে লাগল সহস্রঝুরি বটের মতো। দুই কাঁধ উপেক্ষা করে দুই বুকের পাশ কাটিয়ে মাটিতে।

নিখিলেশ এসে বসেছে। ঘন চুল থেকে ইঞ্জিনের কালি উঠিয়ে তার প্রসাধনের দিন এই রবিবার। এইটি তার দিবানিদ্রার দুপুর। তা হলেও না ঘুমিয়ে আজ এসে বসেছে।

খেলা চলছে। বারে বারে হেরে যাচ্ছে প্রিয়, জিতে যাচ্ছে কুন্তলা। হাসাহাসি চলছে তিনজনে। হাসি ঠাট্টাও। কুন্তলা আজকাল খুব খুশী। কথার মালিশ তেল লাগিয়েছে নিখিলেশের রিকেটি পায়ে। কমজোরী পায়ে জোর আসছে আস্তে আস্তে! সে খুশী এইতেই। মালিক হাসিখুশী থাকলে সবাই ভরসা পায় হাসতে।

নিখিলেশ তো খুশি আছেই। ঘর বাঁধার স্বপ্নে যতো না স্পীডের স্বপ্নে সে মশগুল। লণ্ডন এডিনবরা রুটে নব্বুই মাইল স্পীড। ওঃ কী সাংঘাতিক। আমাদের এদিকে চল্লিশ বেশী হলে পঁয়তাল্লিশ! কেন? তুফান অবশ্যই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন যায় লেট হলে।

আর একটা কথা মনে তার দাগ কেটে বসে আছে! জীবনটা স্পীড। বদ্ধ জলা নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটানা স্পীড। একটা গতি একটা প্রবাহ। কোন কারণে কোথাও বন্দী হওয়া মানেই মৃত্যু। সে প্রেমই হোক, স্নেহই হোক বড়ো চাকরীতে বড়ো প্রতিষ্ঠায়ই হোক! বদ্ধ হওয়া মানেই বন্দী হওয়া। বন্দী হওয়া মানেই মনে মনে মরে যাওয়া।

কথাটা কুন্তলার। যারই হোক না কেন? কথাটা মনে লেগেছে তার।

আর একবার হার হওয়ার পর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল নিখিলেশ—দেখি দেখি, তোমার হাতখানা।—বলে এক হেঁচকায় ডান হাতখানা টেনে উঠিয়ে নিল প্রিয়র। হাতের চেটোটা মেলে ধরে নকল গাম্ভীর্যে পরীক্ষা করে করে দেখতে লাগল। রোজকার ঘরের কাজে সাহায্য করে নোখের মাথা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। বুড়ো আঙুলের মাথায় বঁটি ধার পরীক্ষা করেছে নিজের। হলুদের ছোপ লাগা হাতের পোঁছা। তা হলেও মেয়েদের হাত কিনা! কি নরম! হি হি করে হেসে উঠল কুন্তলা, প্রিয়ও যোগ দিল।

কুন্তলা বলল—কলার গণক ঠাকুর। মেয়েদের বাঁ হাত দেখতে হয়, তাই জানে না।

—আজ্ঞে না, মেয়েদের হার্টের ঠাঁই পুরুষের উল্টো বুকে। যাতে মুখোমুখি দাঁড়ালে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে যায়। তাও জানো না। আমি যা দেখি ডান হাতেই দেখি।

দুখানা চেটোতে মন দেওয়াতে আবহাওয়া ভারী হয়ে এলো এবার।

কুন্তলা বলল—তিল তুলসী আনবো নাকি? মুখ খুলুন এবার—

নিখিলেশ বলল, গম্ভীর থেকেই।—বিবাহ হয়ে গেছে।

ঈষৎ গম্ভীর হল কুন্তলা। হাসি বন্ধ হল প্রিয়র। হাতটা টেনে নেবার ইচ্ছে হলেও নিল না।

কুন্তলা বলল—ওটা বলা কঠিন নয়। আর কিছু থাকলে বলো। ও কথা থাক।

নিখিলেশ বলল—ভূত না ভবিষ্যৎ? অতীত না—

কুন্তলা বলল—ভবিষ্যৎ।

নিখিলেশ বলল—ভবিষ্যৎ বলছি পরে। তার আগে অতীতটা বলে নিই। দেখুন, হাত দেখতে পারি কি না!

চুপ করে রইল ঘর। কাঁপতে লাগল প্রিয়। হাত টেনে আনতে চাইলেও পারল না। অবশ, নিখিলেশ বলল—সব বলব না কিছু কিছু বলি। কোন কারণে ঘর ছাড়া হয়েছে এই মেয়ে। ঘর হারিয়েছে মন হারায় নি। একটি অভদ্রলোক কথা দিয়ে কথা রাখেন নি। এখন

মেয়ের হয়েছে সমস্ত পুরুষ জাতটাকে অবিশ্বাস। দুটি ভদ্রলোক বিয়ে করতে চেয়েছেন একে। তাদেরও অবিশ্বাস।—কিন্তু এ মেয়ের বিয়ে হবে আবার, আমি বলছি।

কাঁপছিল প্রিয়। হাত কাঁপছিল তার, দুজনেই দেখেছে। এইবার পড়ে যাবার মতন হল। কুন্তলা ভাবল বিয়ে হবে? কার সঙ্গে? জেনে নেবে নাকি? আলোকের সঙ্গে না নিখিলেশের নিজেরই ঐ ইচ্ছে।

কুন্তলা বলল—কি হচ্ছে ছেলে মানুষী? দেখছ না কতো কষ্ট হচ্ছে প্রিয়ংবদার। হাত ছেড়ে দাও—

হাত ছেড়ে দিতে দিতে নিখিলেশ বলল—প্রিয়ংবদা।

পরের দিন ওস্তাদকে বলেছিল—ওস্তাদজী, হিন্দু আমরা। গুরুদক্ষিণা বোঝেন?

খালেক বলেছিল—হাঁ হাঁ বুঝি বৈকি! দেবে তুমি? সাদা ঘোড়া না সাদা কালো! স্কচ না ফরাসী?

—ঘোড়া নয়, ঘুড়ী—। ঘুড়ীও নয় হরিণী—

কি একটা যেন বুঝে ফেলার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল খালেকের চিন্তা। ভ্রূ কুঁচকে গেল তার। বলল—তার মানে?

গম্ভীর থেকেই বলল নিখিলেশ—মানে বুঝি না। আপনার কাছে যা কিছু শিখেছি তার জন্যে গুরুদক্ষিণা দেওয়া উচিত আপনাকে। এইটুকু বুঝি—

একটা গূঢ় ইঙ্গিতের পর্দা সরিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দিল নিখিলেশ। মাঠে-তাঁবু-ফেলা সস্তা সার্কাসের পর্দা যেন। নাচগার্লের কটকটে উৎকট চেহারার আভাস দিয়ে মনের কৌতূহলে সুড়সুড়ির আঙুল বুলিয়ে চকিতে মিলিয়ে গেল।

খালেক বয়োধর্মের গাম্ভীর্যে চুপ করেই রইল! কিছু বুঝল। বাকিটা না বোঝার অস্বস্তিতে কষ্ট পাবার আগেই চিন্তার রথ রাস্তার মোড় ঘুরল।

ব্যাপারটা কাকতালীয় হয়ে গেল কতকটা।

ঠিক সেই সন্ধ্যায়ই আবার হাজির হলেন সেই ভদ্রলোক। যাঁর একবার আসা এ বাড়ীর ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ইট-চূণ-সুরকি, সিমেণ্ট বালির ভিত নয়। মমতার মর্টারে গড়া আর একরকম মনের ভিতও আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষ ইটকে একত্র ধরে রাখে। সংসার গড়ে, সমাজ গড়ে, পরিবার গড়ে।

এবার গ্লাডস্টোন ব্যাগের পেটটা আরো মোটা। বাচ্চা হরিণ গেলা অজগরের মতন।

এসেই নোটিস দিয়েছেন ভদ্রলোক—থাকতে এসেছি। ভিড় হঠাও—

কুন্তলা বলেছে—তার মানে ?

—তার মানে! ভিড় অর্থ পরিষ্কার। বাজে লোকের জঞ্জাল। আবর্জনা—

—আবর্জনা নেই এখানে। আগে ছিল না—এইবার জুটল—

গোঁফের ফাঁকে না দেখা হাসি হেসেছিল ভদ্রলোক। গায়ে মাখলে চলবে না তার। বয়েস যখন কম ছিল সেন্টিমেণ্টাল ছিল তখন। এখন আর নেই।

কথার উত্তর দিতে না দেখে জ্বলে গিয়েছিল কুন্তলা। আগের কথার খেই ধরে আরো বিশদ করে বলল—হঠাতে হলে এই নতুন জঞ্জাল। সাফ করতে হলে এই নতুন আবর্জনা। যা আজ এসে জুটল—

বাজে লোকদের কানে পৌঁছেছিল এই কথা। তাতেই কাজ হয়েছিল। ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছিল নিখিলেশ প্রিয় উভয়েই। এই পরিবার সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর। পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কিছু মাত্র মিল নেই এদের মধ্যে। না রক্তে, না স্বভাব বা বংশ পরিচয়ে। এরা যেন রজনীগন্ধার ডাঁটির সঙ্গে মূলোশাকের আঁটি। তার সঙ্গে কিছু পাতাবাহার এক সাথে করে বাঁধা।

তবু তারা এক সাথে বাঁধা। হোক না শুকনো কলার 'বাসনার' 'ছোটা' দিয়ে।

শুধু একটা জিনিস জানবার ছিল। সেইটে জানা হলেই পা বাড়ানো যায়। মনের পা তো বাড়ানোই আছে।

জানবার বিষয়টি এই—

ভদ্রলোকটি ভদ্রলোক গুণ্ডা। এর সঙ্গে কুন্তলার সম্পর্কটা কি! সম্পর্ক যদি থাকেই সেটা সমাজের মেনে নেয়া কিনা! সম্পর্ক থাক না থাক, এ কথা ঠিক, কুন্তলা গলার জোরে চেঁচাচ্ছে। জোর গলায় চেঁচাতে পারছে না! তাই বা কেন? কুন্তলার মতো মেয়ে এক আঙুলের ইশারায় রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে না কেন?

কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে—কুন্তলার ওপর ভদ্রলোকটির কোন না কোন রকম দাবীর অধিকার আছে। জোর আছে। যা গলার জোরে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

পথ দেখার সময় এসেছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেরী হল না প্রিয়র বা নিখিলেশের।

অনেক বিপথ দেখে এসেছে প্রিয়। অনেক পথ দেখা আছে নিখিলেশের। দাসপাড়া রোড থেকে চন্দ্রাবলী মণিমালাদের বাড়ীর পথ পর্যন্ত। পথ তো অনেক। কিন্তু পথের শেষ কোথায়? দুর্নাম, কুখ্যাতি—হয়তো ক্ষুধাও। আর যাই থাক পথের শেষে শান্তি নেই। নিশ্চিন্ত হবার আরামও নেই—

দুজনের মনের কোণায় মেঘ জমেছে ভয়ের। ছিল নিশ্চিন্ত নীল—ভেসেছে মেঘের খেয়া। কোন আঘাটায় আবার নিয়ে যায়, কে জানে?

নিখিলেশ বেপরোয়া। এককালে আরামপ্রিয় ছিল। তার জড়তার শাল খোলা হয় নি এখনও মনের গা থেকে। পেলে খায়, না-পেলে খায়ই না। না পেলে না খেলে অভিযোগ নালিশও নেই কারো বিরুদ্ধে।

প্রিয়র মনের ভাব এই রকম নয় মোটেই। তার তরুতল খোঁজা আশ্রয় চাওয়া মন বিব্রত বোধ করল সত্যিই। মন বলছে, এইবার কি? কোথায়?

মনের উদ্বেগ বিনিময় হয় উভয়ের। কুন্তলার মুখ আষাঢ় আকাশের

মতন মেঘলা। বিদ্যুৎ বেদনায় ঝলকাচ্ছে। কথা কমে গেছে তার মুখে। কেন? ভদ্রলোকটির সঙ্গে সম্বন্ধটা এমন-ই যে, ফুঁয়ের বাতাসে উড়িয়ে দেয়ার মতন নয়। তা হলে কুন্তলা আর ট্যাকে মাছি বসতে দিত না। সেই মেয়েই কিনা কুন্তলা—!

পাকে প্রকারে বিদায় নিল ওরা।

নিখিলেশ বলল—আলাদা বাসা বাঁধতে বলে ছিলে। নিজে আলাদা বাসা বাঁধার আগে পরের বাসায় যাচ্ছি। আস্তে আস্তে না শিখলে তো পারব না। চেষ্টা করি—কি বলো?

কুন্তলা একবারও বলল না "যেয়ো না"। সে তো তাই চায়। আরামপ্রিয়তার নীড় থেকে ঠেলে দিতে চায় নিরবলম্ব শূন্যে। ডানা ঝাপটাক। ডানায় আসুক জোর। উড়তে শিখুক নিজের ডানায়। তবেই তো হতে পারবে স্বনির্ভর। জোগাড় করতে পারবে নিজের খড় কুটো। বাঁধতে পারবে নিজের নীড়। একটা হোক দুটো হোক খড় হোক কুটো হোক—শিখুক জোগাড় করতে—

কিন্তু এর পর প্রিয় যখন বলল—দিদি, তোমার দেনা শুধতে পারবো না এ জন্মে—। ভ্রূ কুঁচকে গেল কুন্তলার—তার মানে?

—যাচ্ছি।—মানে যেতে চাই। তোমার মত চাই। আশা করি পাবো—

কুন্তলা জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাবে? আর যাবার দরকারটাই বা পড়ল কিসে?

—না—মানে, আপনার লোক এসেছে তোমার। আমরা বিদেয় হই। যেতে তো একদিন হোতোই—

—আপনার কোনো কালে ছিল কিনা জানি না। এখন তো নয়ই। সে কথা থাক। আমার আড়ালে আবার কিছু বলেছে বুঝি তোদের? তাই যেতে চাইছিস—

প্রিয় বলল—না না দিদি, ছি! তা কেন? ও ভদ্রলোকের কি দোষ? যেতে তো একদিন হোতোই—

—তা যাচ্ছটা কোথায়? কুন্তলার চোখে প্রশ্নের চেয়ে ভ্রূকুটি বেশী—

শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহের একটি নবজাতক জন্মেছে কুন্তলার মনে। তাকে সত্য প্রমাণ করে উত্তর দিল প্রিয়—উপস্থিত নিখিল দাদার সঙ্গে, পরে জানি না।

একটা কটূক্তি মনে এলেও মুখ দিয়ে বের করলো না কুন্তলা। চোখের চামচেয় দু-চামচে কালকূট ভরে নিয়ে চেয়ে রইল শুধু। আগে হলে বাধা দিত। বুঝিয়ে বলত ভালো মন্দ। ঠিক করে ফেলেছে যাওয়ার। বাধা দেওয়া এখন কি আর সাজে? আর দেবেই বা কেন?—ছি!

নিখিলেশের নকল মনের পরিচয় পেয়ে ঘৃণায় রি রি করে উঠল কুন্তলার মন। আসলে সে গোপনে গোপনে এতোদিন তা হলে প্রিয়র সঙ্গ কামনা করে এসেছে! আর মুখোশ পরেছে কুন্তলা-রঙের। এ আর বেশী কথা কি! আঁস্তাকুড়ের ছেলে কুড়িয়ে আনাই ভুল হয়েছে আঁস্তাকুড় থেকে। এতো যে ধোলাই দিল! মুছবে কি করে ময়লা। মলিনতা যে অঙ্গারের অঙ্গের ভূষণ।

নিখিলেশকে যে কুন্তলা পলকে চোখে হারাতো এমন নয়। তবু যাওয়ার ব্যাপারের কদর্যতা বিরূপ করে তুলল তাকে।

প্রিয়র সঠিক ধারণা ছিল না নিখিলেশ তাকে কোথায় নিয়ে তুলবে। কাছে পিঠে ঘর পেয়েছে দুখানা। রেলোয়ে কলোনীতে না কোথায়! খালি কোয়ার্টার যেন কার। থাকবে সেখানে দিন কতো, তারপর পাড়ি জমাবে যেথায় হোক—

এ ভদ্রলোক উঠতে বসতে 'দূর-যা' করছেন। যেখানে হোক—এখানে আর নয়। এখানে থাকার কি অধিকার আছে তার। অনেক উঁচুতে উঠেছে সে এখানে, যদিও মোটেই যুগ্যি নয় তার। সেই উঁচু থেকে বাসন মাজার কলতলা বা মশলা পেষার জায়গাটা বড়ো নিচু

মনে হয়। সে কাজ হয়তো আবারও করতে হবে হোক। ভয় নেই। করতে হলে এদের আড়ালে—

এক বিষয়ে প্রিয় নিশ্চিন্ত। নিখিল দাদা মানুষ। পুরুষ মানুষ নয়। চোখ বাঁকা হয় নি কখনো। হাত আসে নি বেড়া ডিঙিয়ে। তা ছাড়া অনেক অভিজ্ঞতার শক্ত কুর্ম খোল আছে প্রিয়র আত্মরক্ষার জন্যে। পথ চেনা আছে প্রিয়র, বিপদ চেনা আছে। পা দুখানাও আছে তেমনি, খরগোশের মতো দ্রুতগামী—

আব্দুল খালেকের বাসাটা বড়ো ছিল না। ছোটো-ই। দরজাও ছোটো ছিল তাই। মনের দরজা কিন্তু ছিল দরাজ। গৃহ ছিল, ছিল না গৃহিনী। গৃহিনীরা বাসার সবটা ভালোবাসার সবটা জুড়ে থাকতে চায়। গৃহিনীরা থাকেন যে বাড়িতে সেই বাড়িতেই স্থানাভাব হয় অন্য মেয়ের। গৃহিনীরাই ভবে রেখে দেন সবটা! মনেরও বাড়িরও—

ওরা যখন এলো আব্দুলের বাসায়, আব্দুল তখন কর্মস্থলে।

অনেকক্ষণ টের পেলো না প্রিয়। শুধু বুঝল কার সাজানো বাগানে এসে পড়েছে সে!

হবেও বা। আপাতঃ খালি কোয়ার্টার। মালিক হয়তো গেছে সাময়িক ছুটিতে—!

খালেক বাড়ী ঢুকে বলল—বেরাদার শুনলুম চিড়িয়া ধরে এনেছ।

নিখিলেশ ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বললে—চুপ। চিড়িয়া মিড়িয়া শুনলে বিগড়ে যাবে না বুঝি—?

চুপ করলে খালেক।

তেমনি নিচু গলায় বলল নিখিলেশ—গুরু দক্ষিণা দেবো বলি নি! সেই গুরুদক্ষিণা এনেছি তোমার জন্য! কিন্তু সবুর করতে হবে। যখন দেবো তখন নিতে হবে—কেড়ে নিতে পারবে না।

বিলিতি কায়দায় কাঁধ দুটো তুলল আব্দুল খালেক। আর কথা বলল না।

দ্বিতীয় পর্ব

নিকোলাস

শেষরাত্রে আব্দুল খালেকের পাশের খাটিয়া থেকে উঠে পড়ল নিখিলেশ। সাবারাত ঘুমোতে পারে নি, ঘুম আসে নি তার। মাথার মধ্যে শিরায় শিরায় আগুন জ্বলেছে দপ—দপ। আকাশের অনির্বাণ তারাগুলি যেন শিবার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। জ্বলেছে ওমনি দপ্—দপ্ আর—। আর যেন, ডাক দিয়ে গেছে দূর দুরান্তের—

সামনে অবাধ স্বাধীনতা। একটা নির্মোক খসে গেছে। নিজে চেষ্টা করে খুলতে পারে নি, অন্য এক দুর্বার বেগ এসে খুলে দিয়ে গেল। খোলার জন্য তেমন চেষ্টা অবশ্য করতেও পারে নি। জড়তা এসেছে, আলস্য লেগেছে। আরামপ্রিয়তা এসে পথ রুখেছে। অনিশ্চয়তার ভয় এসে শিকল জড়িয়ে গেছে বাইরে বেরোবার পায়। এ ভালোই হল।

থানার পেটা ঘড়িতে চারটে ঘণ্টা বাজা পর্যন্ত অনেক কষ্টে শুয়েছিল নিখিলেশ। এইবার উঠে পড়ল।

প্রায় নিঃশব্দে খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল নিখিলেশ।

পাশের ঘরটা খিল বন্ধ ঘুমচ্ছে। সে দিকে একবার তাকাল নিখিলেশ। তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। কেন জানি তার, নিমাই সন্ন্যাস আর দি গ্রেট রিননসিয়েশন ছবি দুটোর কথা মনে পড়ল। নিদ্রিতা স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজে পালানোর চেষ্টা। তার ক্ষেত্রে স্ত্রী নয়, আত্মীয়া। স্ত্রীলোক।

এও মনে পড়ল তার—মিল নেই সেই দুটো ছবির সঙ্গে নিজের। সে কি ফাঁকি দিচ্ছে প্রিয়কে? কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখছে না?—না তো।

মাথার ওপর আকাশ-গঙ্গার অসংখ্য অলক্ষ্য ছোট ঢেউয়ের মাথায় তারার মানিক।

ছোট্ট সিমেণ্ট বাঁধানো উঠোন। পার হয়ে দেউড়ির আগড়।

খুট করে খুলে বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল। দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল নিখিলেশ।

ঘেঁষের রাস্তা। চটির চাপে চাপে জানান দিচ্ছে। খস খস খস। সঙ্গে বাক্সো নয় তোরঙ্গ নয় ছোট্ট একটু পুঁটলী। জামা কাপড়ের সম্বল।

পা চালিয়ে দিল নিখিলেশ।

এ কি! অভ্যস্ত পা ছুটো কোথায় এনে ফেলেছে তাকে। সামনেই পান্থপাদপ। ঐ ছাদের তলায় কেটেছে অনেক রাত। কাল রাতটা বাদ। অনেক আরাম ঘুমে কেটেছে ঐ ছাদের তলায়। আর আরাম নয়, বসে থাকা নয়। বদ্ধ জলা নয়। স্রোত এবার। এবার জীবন।

জীবন মানেই স্রোত। জলায় আটকে পড়াই মৃত্যু। আটকে পড়লেই শ্যাওলার শিকল—

পোনাহাটে অনেক ছাদের তলায়ই রাত কাটল। কোনোটা ছাদ। কোনোটা চ্যাঁদা, ফুটো। ছাদ নয়, চালা। পোনাহাটের সঙ্গে প্রথম পরিচয় তার বিনয় রায়ের মাধ্যমে। সে আজ পাঁচ ছ বছরের কাহিনী। তারপব সব চেয়ে মনে পড়ে তার দোনামা কালীচরণ আর বসন্ত চৌধুরীকে। দোনামা, ছুমুখো। মনে পড়ে অনেককেই।

তুফান আলীর আড়গড়া। ভুক্তাবশিষ্ট ঘাস পড়ে আছে। ঘোড়ার গাড়ীর কদর কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ঘোড়া নেই গাড়ী নেই আড়গড়ায়। ঘোড়া ছুটোর কঙ্কালসার চেহারা মনে পড়ল তার। আহা—

আহা! আহা কেন? কোচবক্সে বসে আর এক তুফান আলী কি তারো পিঠে চাবুক হাঁকড়াচ্ছে না? সেও কি ভালো মতো খেতে পাচ্ছে? সেও কি আজ কঙ্কালসার ঘোড়া নয়?

তুফান আলীর আড়গড়া থেকেই বাঁয়ে ঘুরল। পান্থপাদপ পর্যন্ত না গিয়ে ঘূর্নীর পথ ধরল সে।

পোনাহাট আড়ামোড়া ভাঙছে। উঠি উঠি করছে। আলিস্যির হাই তুলছে চায়ের দোকানের সন্ত ধরানো উন্নুনে উন্নুনে। হাত ছুটো মাথার ওপর তুলে আলিস্যি ছাড়ছে—চায়ের আর গজা জিলিপির, কচুরী ডালপুরী দোকানের ছ'টো ঝাঁপের ছুটো হাত।

কি মনে করে ঘূর্ণীর পথ ধরেছে তা কি সে নিজেই জানত। আকাশ পাতাল ভেবেছে সারারাত এইটুকুই মনে ছিল তার। হয়তো বিদায় নেওয়ার একটা গোপন বিলাস তার মনে থেকে থাকবে। আমাদের সমস্ত ক্রিয়া কলাপের কি-এবং-কেন হিসেব করে কি পথ চলি আমরা? তা হলে তো অনেক দুঃখই পেতে হত না আমাদের।

ঘূর্ণীর জলে ভাঁটা—সমুদ্র ডাক দিয়েছে ঘূর্ণীর জলকে। ঘাটের পইঠাকে ফাঁকি দিয়ে কাদায় নেমে গেছে জল। পইঠার স্থায়িত্ব থেকে নিচুর নিম্নে। একটু জল নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে দেবার বিলক্ষণ ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কেন সে নিজেই জানে না, দার্শনিকতায় পেয়ে বসেছে তাকে। অবশ্যই বাসি মুখটা ধোওয়ার দরকারও ছিল। ঘূর্ণীর জল মাথায় নিতে গেলে পোনাহাটের ঘাটে চরণচিহ্ন রেখে যেতে হয়। স্মরণচিহ্ন। সেটা খুব গৌরবের নয় মনে হল তার।

জল পালিয়েছে সমুদ্রের ডাকে। সমস্ত কিছুতেই বিদায় আর যাই যাই।

মুখ ধোওয়া হল না—হল না মাথায় জল ছিটোন।

ফিরল সে।

দ্রুতপায়ে এবার স্টেশান। নিজের কাছ থেকে নিজেই পালানো। অন্য লোকের চোখেও না পড়ে।

এস থ্রি থার্টি। ফাস্ট ডাউন। ছাড়ি ছাড়ি করছে।

সকলের অলক্ষ্যে স্টেশান প্লাটফরমের কলে মুখ ধুয়ে নিল নিখিলেশ। একখানা থার্ডক্লাসের প্রায়ান্ধকার কোণে মুখ লুকিয়ে বসে পড়ল।

গাড়ী ছাড়ল। নিখিলেশের গাড়ী পোনাহাট ছাড়ল।

পিছনে পড়ে রইল উত্তরপাড়া। পান্থপাদপ। আব্দুল খালেক, প্রিয়বালা। আর—! আর কুন্তলা রায়।

কেমন একটা বেদনায় টনটন করে উঠল নিখিলেশের মন।

সে কি অজানার ভয়! সে কি মায়া! সে কি পুরোনর মোহ! না কি বিচ্ছেদ! বিচ্ছেদ? কার? কুন্তলার?

বাইশ ফুট রেলের সন্ধিতে চাকা পড়ে আওয়াজ হতে লাগল খটা-খট, খট-খট, নিজের মনে নিজের তৈরী প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলল নিখিলেশ। চলতে লাগল কলকাতার দিকে। দাসপাড়া রোডের দিকে—এককালের নিজ নিকেতনের দিকে—

ঠাকুরগাছি ইয়ার্ডে প্রায় সব ডাউনই দাঁড়ায়। সিঙ্গল পয়েণ্ট ক্রসিং। স্টেশনে ঢোকার পথ একটিই। বেরোনর পথও ঐটেই। আপকে ঠিক সময়ে ছাড়ার ব্যবস্থা করে দিতেই হয়। তাই ডাউনের এই দুর্দশা।

টুপ করে নেমে পড়ল নিখিলেশ দাস। পাতার আশ্রয় থেকে শিশির-বিন্দু পড়ল মাটিতে। পাতায় ছিল একক—মাটিতে পড়ল সর্বসাধারণের বসুমতীতে। পাতায় ছিল যখন সূর্যকিরণে ঝলমল করত। মাটিতে পড়ে মিশে গেল মাটিতে। নিজের স্বতন্ত্র সত্তা রইল না আর।

শেড-এর অজস্র ইঞ্জিনে ধোঁয়ারা ঠিক যেন সময় বুঝে এই সময়েই শেড-এর তলা থেকে এদিক দিয়ে বের হল।

আর গ্রাস করল নিখিলেশকে। ঢেকে ফেলল, আড়াল করল তাকে। কি এক অজানা লজ্জা আর কুণ্ঠা ঘিরে ধরল নিখিলেশকে। ধোঁয়ারা ভালই করেছে—

ধোঁয়ার আড়ালে আড়ালে এগোল সে। হাতেব পুঁটলীটি শেড-এর একটি খুঁটির পাশে লুকিয়ে রেখে দিল। পুঁটলী নিয়ে নামতে দেখলে অনেক কথাই উঠবে। সেগুলি এড়াতে চায় নিখিলেশ। চলে আসাটা যে বরাবরের, গোপন রাখতে চায় আপাতত।

এখানে অনেক চেনা। এখানে সবাই চেনা। শিয়ালদহ গেলে পরিচিতের সংখ্যা হত আরো অনেক। এখানে ঠিক অতো নয়।

অনেক লাইন চলে গেছে। শাণ্টিংয়ের। খানিকটা গিয়ে জড়াজড়ি। যেন চিন্তাজাল। মানুষের চিন্তা জালের মতোই জটিল। একটার সঙ্গে আরেকটার যোগসূত্র আছে। একটাকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। এও তেমনি।

ঠাকুরগাছিটা শান্টিং ঈয়ার্ড।

প্রথমেই দেখা, হেনরি সাহেবের সঙ্গে। অনেক বড়ো অফিসার, পোস্টটা যে কি সঠিক জানা নেই। আব্দুল খালেকের কাছে যেতে দেখেছে নিখিলেশ। খুব মান্যি মাননা করত ওস্তাদ।

হাতটা তুলে ছোট্ট একটু নমস্কার করল নিখিলেশ। সাহেবও হেসে উইশ রিটার্ণ করলেন।

ইয়ার্ড ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন হেনরি। পরে জেনেছে নিখিলেশ—সারপ্রাইজ ভিজিটে এসেছিলেন ইয়ার্ড সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। নইলে অতো সকালে আসার কথা নয়। আগওয়ালা ক্লিনার পয়েণ্টসম্যান লাইনম্যান সিগনালার মেকানিক ডিপার্টমেণ্ট সবাই ঠিক হাজিরা দিচ্ছে কি না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিল সারা ইয়ার্ডে। বোঝা গেল কাছাকাছি হোমরা-চোমরাদের উপস্থিতি। অহেতুক কর্মব্যস্ততা। লোক দেখানো হৈ চৈ।

আরও এক অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে গেল। আগওয়ালার চাকরী জুটে গেল নিখিলেশের। হেনবী সাহেবই দিলেন। তখনকার দিনে হাতে কাজ করবার লোক বেশী পাওয়া যেত না। তা ছাড়া আগওয়ালার কাজে তো লোক পাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। মনে হয় হেনরি সাহেব আব্দুল খালেকের কাছে নিখিলেশ সম্বন্ধে কিছু শুনেছিলেন। নইলে, আগে ক্লিনার পরে স্টোকার এই ব্যবস্থার বদল হল কেন? সব চেয়ে বড়ো কথা, হেনরির কথার উত্তরে নিখিলেশ ইংরিজিতে দিয়েছে।

নিখিলেশ ইণ্টারমিডিয়েট পড়েছে। জিজ্ঞেস করছিল মাত্র গোটা কতো প্রশ্ন।

একশো পাউণ্ড কয়লায় কতোটা পরিমাণ কার্বন আর কতোটা হাইড্রোজেন আর—অন্যান্য গ্যাস থাকে। এক পাউণ্ড কার্বনকে কার্বনিক এসিড গ্যাস করলেই বা কতো ব্রিটিশ থারমাল ইউনিট পাওয়া যায়, আর সেইটে কম জ্বলে কার্বন মনক্সাইড তৈরী হলেই বা কতো ইউনিট পাওয়া যায়?

হেনরি বিশেষ চোখে তাকিয়ে গেছেন নিখিলেশের দিকে। এই ফুটফুটে রং আগুনে পুড়ে তামা হয়ে যাবে। তার আগেই ওকে প্রোমোশান দেওয়া যেতে পারবে। নিখিলেশের রকম সকম দেখে আশা হচ্ছে।

হেনরির সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাও হল নিখিলেশের কিছু কিছু। আগে কোথায় দেখেছে, সে জায়গা ছেড়ে এল কেন ? এখানে কবে এসেছে, কেন এসেছে ? সেই সূত্র ধরেই তার বাসগৃহের সমস্যাও সমাধান করে দিয়ে গেছে হেনরি।

ব্যাপারটা কাকতালীয় হয়ে গেল। নিখিলেশ কাজের সন্ধানে বের হয় নি। কেন বের হয়েছে তাই সে জানত না। ওখানকার অন্ন উঠল এইটুকুই জানত। বেরিয়ে পড়েছিল নতুন আস্তানার সন্ধানে। অন্ন তার মত অকর্মণ্যকে কে দেবে ? তারপর, গন্তব্য স্থান তার শিয়ালদা হলেও ঠাকুরগাছিতে গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল। সেও চেনাজানার আশায় নেমে পড়ল। এখানটা দেখে পায়ে হেঁটে শিয়ালদা যাবে এই আশা ছিল। টিকিটও সঙ্গে ছিল না তার।

ওকে দেখেই হেনরির মনে পড়ে গেল আব্দুল খালেক ওর সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করে। কাজ করতে চায় কিনা এও জিজ্ঞেস করেছিল হেনরি। খালেক বলেছিল—এখনও নয়। পরে হয়তো চাইবে। ওকে দেখে তাই সেদিনের ঘুমনো ইচ্ছেটা জেগে উঠল হেনরির। ব্যক্তিগত গোটা কতো প্রশ্নের পর ঝপ করে জিজ্ঞেস করল হেনরি—স্টোকারের চাকরী নেবে কিনা দাস !

না বলার সাহস ছিল না, নিখিলেশের চাহিদার আর ক্ষুধার। সম্মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ! হেনরিকে ঈশ্বর প্রেরিত বলেই মনে হল নিখিলেশের। গড-সেণ্ট একেবারে।

দাসের থাকার ব্যবস্থা হল ডেভিড ও'ব্রায়েনের সঙ্গে। পাকা ড্রাইভার ও'ব্রায়েন। রেলোয়ে কোয়ার্টার্সে থাকে। শিয়ালদার অতি নিকটে।

ও'ব্রায়েনের বাসা আছে সংসার নেই। করে-কম্মে দেবার লোক নেই। একা একা থাকে। আকস্মিক অতিথিরা এই বাসাতেই ঠাঁই পায়।

একা একা থাকে ও'ব্রায়েন। মোষের মতো চেহারা। সময় পেলেই মোষের মতো ঘুমোয়। আর মাছের মতো পান করে। তার সঙ্গে থাকলে খাইখরচ লাগে না। কিন্তু অন্য খরচ করতে হয়। সে চায় না, তবু করতে হয়। খরচটা আহারের নয়, পানের। মদ জোগাড় করে দিতে হয়। সময় সময় নিজের পকেট থেকে। খরচ বলতে এইটেই।

শান্টিং ইয়ার্ডের শান্টিংয়ের তদ্বির তদারক থেকে অচল ইঞ্জিনের টুকিটাকি মেরামত—সব কিছুর খবরদারী করে ও'ব্রায়েন। বয়স পঞ্চাশের ওপর। গোলগাল মুখখানা—গালেই পাউণ্ড কয়েক মাংস। চোখ দুটো গালের চাপে প্রায় ডুবে গিয়েছে। আর মুখ খুললেই গালাগাল।

মোগল ইঞ্জিন ভারী তো আট চাকার। বিলেতে চালু হয়েছে ১৮৭৮ সালে, আমেরিকায় ১৮৬৩ সালে, আর তাই এখানে নতুন। টু-সিক্স-জিরো-টাইপ। ও'ব্রায়েনের কাছে চালাকী নয়। ওর নিজের পেটটার মতন—পেট নয় তো জালা—মোগলের অতো বড়ো বিশাল বয়লার। অতো বড়ো বড়ো সিলিণ্ডার। ও'ব্রায়েনের কাছে জলভাত।

মাস কয়েকের মধ্যেই এই সব শেখা শেষ। শোনা যাচ্ছে 'প্যাসিফিকে'র অর্ডার দিয়েছে কম্পানী। ফোর-সিক্স-টু, বারো চাকার টাইপ। দাসের মনটা আনচান করে। কবে আসবে প্যাসিফিক।

দাসকে খুব ভালোবাসে ও'ব্রায়েন।

দাসকে ভালো না বাসার কিছু নেই। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি মনিব কি বন্ধু। তার চেহারা সুকুমার। জামা কাপড় মলিন থাকে হয়তো। তাই বলে চেহারার সৌকুমার্যে বা আভিজাত্যে মালিন্য লাগে না কখনও। স্বভাব ভদ্র, ব্যবহার অমায়িক। সব চেয়ে বড়ো কথা, তার প্রয়োজন হয়তো আছে কিন্তু ক্ষুধাবোধ নেই। চাহিদা নেই তার। কোনো কিছু দিতে গেলেই হাতে গুঁজে দিতে হয়। তাও নিতে যেন তার কুণ্ঠা বা দ্বিধা।

দাসকে পছন্দ করে ও'ব্রায়েন অনেক কারণে। দাস যেমন বাধ্য অনুগত তেমনি লেখাপড়া ও কাজ জানা। দাস এখানে থাকতে আসে নি। এইটা বুঝে নিতে দেরী হয় না। কারোই হয় না, ও'ব্রায়েনের তো

নয়ই। ও'ব্রায়েন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশেছে চিরকাল। ধরণ ধারণ জানা অছে ভদ্রলোকদের। ঘ্যান ঘ্যান করে ভিক্ষে যে চায়—তাকে ভিক্ষে দিতে হাত ওঠে না। আর যে চায় না অথচ বুঝি ক্ষিধে আছে পেটে, তাকে ডেকে ডেকে সাহায্য করি।

মাস ছয়েক এখানে এসেছে নিখিলেশ। অপিসের খাতাপত্রে ও'ব্রায়েন কায়দা করে নামটা লিখেছে—ডস নিকোলাস। সাহেবরা সাধারণতঃ ক্রিশ্চান নামে ডাকে না। ডাকে—পরে। সৌহার্দ হয়ে গেলে। ডাকতে সুরু করে পদবী ধ'রে। তাই স্বভাবতঃই ডস পদবীটা আগে লিখল। পরে কলমেব ডগা চিবতে চিবতে বলল—ক্রিশ্চন নেম কি? কি লিখব বলো। নিখিলেশ নিজের নামটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। পূর্ব স্মৃতি থেকে ও'ব্রায়েন লিখে বসে আছে—এন-আই-সি-এইচ।

ভালই হল। নিখিলেশ দ্বিজ হল। কলমের এক খোঁচায় জাত গেল নিখিলেশের। মনের জাত তো কবেই গেছে। পদবীর জাত গেল এবার। এক একবার মনে হল বড়ো বড়ো তত্ত্ব কথা—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। এ পুনর্জন্মে ভালই হল। দাস পাড়া রোডেব নিখিলেশ পোনাহাটের উত্তরপাড়ার নিখিলদার পঙ্ক থেকে জন্মাল নিকোলাস। পঙ্কজ।

দু একটা উৎসব ছাড়া বীফ বেকন পর্ক হ্যাম ঢুকত না ও'ব্রায়েনের হেঁসেলে। একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ও'ব্রায়েন—আপত্তি আছে নাকি?

নিখিলেশ বলেছিল—রামো। আমি আগুন, আমি বৈশ্বানর। সর্বভুক। চতুষ্পদ, দ্বিপদ, পত্রী, পতত্রী, সব চলে।

পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল ও' ব্রায়েন। বলেছিল—তুমিই পারবে ডস। তুমিই উন্নতি করতে পারবে।

জীবনটা উপভোগ করতে পারে সাহেবরা। কাজের সময় কাজ, মদ্য-পানের সময় মদ্যপান। মেয়েদেব সঙ্গ উপভোগ করার সময়একবারও কাজের কথা ভাবে না। সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকার সময় মাথা তোলে না পানকৌড়ির মতন। ভুলে ভাবে না মেয়েমানুষের কথা। কাজের মধ্যেই ডুবে থাকে। দিনের কর্মরাজ্য থেকে স্ত্রীলোকের চিন্তা একেবারে নির্বাসিত।

পুরোপুরি সাহেব না হলেও ও' ব্রায়েন আধা সাহেব। অবশ্যই ও'ব্রায়েনরা নিজেদের পুরো সাহেব বলেই প্রকাশ ও প্রচার করে। সারাদিন ইয়ার্ডে খাটুনীর অন্ত থাকে না। তা বলে মুখে হাসির অভাব নেই। ইয়ার্ডে বসেই খাওয়া-দাওয়া সারে দুপুরে। খাওয়া দাওয়া এমন কিছু নয়। খান কয় স্যাণ্ডুয়িচ, ফ্লাস্কের পর ফ্লাস্ক চা। খানসামা কাম বেয়ারা মজিদ নিয়ে আসত আগে। ফ্ল্যাট তালা বন্ধ করে রেখে। এখন নিকোলাস নিজেই যায়, গিয়ে নিয়ে আসে। ও' ব্রায়েন নিষেধ করেছিল। নিকোলাস যায়, নিজের খাওয়াটা সেরেও আসে ঐ একই সঙ্গে। ও'ব্রায়েন বলেছিল মজিদ দুজনের খাবারই আনবে। তার জন্যে কি! পছন্দ হয় নি নিকোলাসের।

সন্ধ্যেবেলা ফিরে যায় দুজনে—সাধারণত একই সঙ্গে। গিয়ে মুখ হাত ধোয়া হচ্ছে প্রথম কাজ। মাথায় ছাই বোঝাই নীল রুমাল। চুলে বাবুই বাসার মত জট। সারা গা থেকে ইঞ্জিনের মলমূত্র নির্মল তো করতেই হবে।

এই সায়ংকৃত্য সারা হবার পর ও'ব্রায়েনের কাজ হচ্ছে মদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। নিকোলাসের অমায়িক ব্যবহারে আশ্বস্ত হয়ে মদ সংগ্রহের ব্যাপারেও ও'ব্রায়েন কাজে লাগাত নিকোলাসকে। জোগাড় করা হাঙ্গামা ছিল না সেকালে। মাস গেলে প্রভিশান স্টোরের বিল মেটাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিলও মেটানো। আর, কাজের মধ্যে দিনান্তে দেখা, কোনটা কতোটা ফুরোল। বিয়ার কবে চাই আর হুইস্কিই বা কতোটা আছে। সেটা নির্ভর করে সন্ধ্যেবেলা বন্ধুসমাগমের ওপর। যেটা ফুরোবে ফুরোবে করছে, দোকানীকে সেইটের নাম বলে আসা। গরমের দিনে টান ধরে বেশী বিয়ারে। বর্ষা শীতে হুইস্কিতে!

কোন কোন সময় হাতে করে নিয়ে আসতেও হত নিকোলাসকে। তাড়া থাকলে।

সোম থেকে শুক্কুরবার ও'ব্রায়েনের দিনলিপি এই। শনিবার সাধারণত সে যায় পার্ক সার্কাসের শ্বেতাঙ্গিনীদের কাছে। ফিরে আসে রাত সাড়ে

দশটা এগারোটার মধ্যেই। দেরী করে না এর চেয়ে বেশী। শীতের রাতে তো ফেরে আরো আগে। ফূর্তি করে, ফূর্তি করতে পারে, ফূর্তি করতে জানে ওরা। তবে ফূর্তির স্রোতে স্বাস্থ্যকে কাগজের নৌকো করে ভাসিয়ে দেয় না ওরা। কর্তব্যবুদ্ধিকেও নয়। অথচ ফূর্তি যখন করছে তখন দেখলে মনে হবে—এতো বড়ো বেহেড বুঝি পৃথিবীতে আর নেই। কাণ্ড জ্ঞান ফিরবে না বুঝি কখনও আর। কথার অসংলগ্নতায় ব্যবহারের অসংযমে পানের মাত্রাহীনতায় একটি পশু—উপম হয়ে যায় তখন। কতক ব্যাপারে শিশুও বটে।

কালে ভদ্রে কোন শ্বেতাঙ্গিনা এসে জোটে ও'ব্রায়েনের ফ্ল্যাটে। উচ্ছ্বাসের অতিরেকে। ও'ব্রায়েন পছন্দ করে না বিশেষ। তবু আসে। হয়তো নগদ প্রাপ্তির আশু তাগিদে। এই আসার বার-অবার নেই। যেদিন খুশী এলেই হল। নগদ কিছু দিয়েই বিদায় দেয় ও'ব্রায়েন। নিজের ফ্ল্যাটে বসে বেলেল্লাপনা করতে ইচ্ছে হয় না তার। পাশা পাশি ফ্ল্যাটের চোখের গোচরে বলেই হোক, পদের মর্যাদার জন্যেই হোক, বয়সের আধিক্যের পক্ষে আদিখ্যেতা মনে হয় বলেই হোক।

নিকোলাস অনেক দেখেছে জীবনে। আর কিছু দেখার চোখ নেই তার, মন তো নেই-ই। বেশ লাগে তার ও'ব্রায়েনকে। পঞ্চাশ বাহান্ন বছরের বন্ধনেই যা বাঁধা, যে বন্ধনের চিহ্ন কপালে বলীরেখার আভাসে আর হয়তো মাংসপেশীর আর চামড়ার লোলতায়। তাছাড়া আর সর্ববিষয়ে বাধা-বন্ধ বিহীন। সব কিছু দায়-দায়িত্ব থেকে পলাতক। বালক। ছিন্নবাধা। এক পয়সা সঞ্চয়ের প্রয়োজন নেই। করেও না। বলে—প্রভিডেন্স তো প্রোভাইড করেই রেখেছেন—ঐ যে তোমরা যাকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বলো। পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে ওখানে, ইনশিওর আছে পঁচিশ। কুলোবে না বাকি জীবনটা ?

অনিকেত ও'ব্রায়েন। গৃহ নির্মাণের অভিরুচিও নেই তার। এদিক দিয়েও সাধুপুরুষদের সঙ্গে একটা মিল আছে তার।

অতিরিক্ত সঞ্চয়ের ইচ্ছা তার নেই। সেইজন্য অনেকগুলো পাপকার্য

সে করে না। করার দরকার করে না। সে হয়তো জানে, অল ফিয়ারস আর বর্ন অব য়্যাটাচমেণ্ট। সে য়্যাটাচমেণ্ট তার নেই।

ও'ব্রায়েন এ তত্ত্ব জানে কি জানে না, নিকোলাস জানে না। নিকোলাস মনে করে, এমনি মনোভাব না হলে য়্যাটাচমেণ্ট রাখে নি কেন ও'ব্রায়েন। নিকোলাস জানে, ইয়র কম্‌ফর্টেবল লিভিং হ্যাজ মেড 'য়ু এ স্লেভ।

কুন্তলার কথা মনে পড়ে যায় নিকোলাসের। মনে পড়ে যায় মানে, ভুলতেই পারে নি সে কোনদিন। ভুলতে পারে না মুহূর্তেকের জন্যেও। দূর থেকে লোকাল, প্যাসেঞ্জার, মেল, এক্‌স্‌প্রেস ট্রেন যেতে দেখতে পায় সে। দেখতে পায় তাতে চলন্ত নারী-মূর্তি। নারী-মূর্তি মানেই কুন্তলা।

ইয়ার্ডে বসে কাজ করতে করতে দেখে সে—গাড়ী চলে যায় ইয়ার্ডের প্রান্ত ছুঁয়ে। কাজের প্রাঙ্গনের প্রান্ত ছুঁয়ে যায় যেমন করে চিন্তা। চিন্তায় যেমনি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মনেব পুলকের বিদ্যুৎবিকাশ।

আর সে বিদ্যুৎটির একটিই নাম। কুন্তলা।

নিজের মনকে ডাক্তারী ল্যান্সেট নিয়ে চিরে পোস্টমর্টেমের বিলাসে মেতে যায় নিকোলাস। কুন্তলাকে তা হলে কি নিখিলেশ ভালোবাসত। যে কুন্তলা আসার সময় একবারও পথ রুখে দাঁড়ায় নি নিখিলেশের! নিখিলেশ জানত—দাঁড়াবে না। তবু একবার একটু আশা ছিল বৈকি। উল্টে যে কুন্তলা তাকে পথে বের করে দিয়েছে। তবে কি উপযুক্ত হলে কুন্তলা তাকে গ্রহণ করবে? উপযুক্ত করবার জন্য তবে কি কুন্তলার এটা সাময়িক প্রত্যাখ্যান! কিন্তু কুন্তলা তাকে গ্রহণ করলেই কি নিখিলেশ খুশী হত? তাই কি চেয়েছিল সে মনে মনে?

না তো! নিখিলেশের চিন্তা মনে মনে আস্তিন গুটোয়। মোটেই নয়। চাইলে বহু নারীর সঙ্গ সে পেতে পারত। নারী সঙ্গটাই আসল কথা নয়। রাস্তার মেয়ের কাছে লোকে কি সুখে যায় বোঝে না নিখিলেশ। নারীকে জয় করতেই যদি না পারলাম, তবে তার এক ঘণ্টার সাহচর্যের মূল্য কি?

আরো খানিক বিশ্লেষণের পর নিখিলেশের মন বোধ হয় এই সাময়িক তথ্যে পেঁাছল। কুন্তলাকে সে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে কামনা

করে না। কিন্তু কুন্তলাকে জয় করা তার হয় নি। আর, কুন্তলা তার পথ রুখে দাঁড়াল না কেন, কেন দিল সহজে বিদায়—এর শোধ তাকে তুলতে হবে। নিখিলেশকে কুন্তলা চাইবে, উবুড় হয়ে পড়ে থাকবে দরজায় পথ রুখে। আর সে তার আনত দেহটা টপকে আসবে, পুঞ্জীভূত ইচ্ছাটাকে ডিঙিয়ে আসবে। এ নইলে কিসের সে মেয়েদের নিখিলদা!

মেয়েদের মন জয় করা ছাড়া পুরুষের আর কি কাজ নেই কোনো? ওটা একটা বিলাসিতা সন্দেহ নেই, আরাম পাওয়া যায় ও-কাজ ক'রে। কিন্তু কুন্তলার মতে ও তো বদ্ধজলায় আটকে থাকা! নিখিলেশের নিজের মতেও—

কতো শিক্ষা দিয়েছে তাকে কুন্তলা, দিয়েছে তাকে মানুষ হবার নানান শিক্ষা অনেক উপদেশ। দিয়েছে তাকে জীবনের নতুন দিগদর্শন।

কুন্তলার কাছে সে কৃতজ্ঞ। উপকৃত। উপকৃত এই কারণে যে, একটা স্থাণু গোলককে ঠেলা মেরে ঠাঁই নেড়ে দিয়েছে কুন্তলা, ঠেলে দিয়েছে জীবনের গড়ানে রাস্তায়। রাস্তাটা হয়তো ক্রমনিম্ন, সে পথে চললে উন্নতি না হয়ে অবনতি হবে। হয়তো গোলকধাঁধাঁর মুখ একটা। যাই হোক, গতি এনে দিয়েছে একটা।

বদ্ধজলার মুখ দিয়েছে খুলে। এখন শুধু চলা চলা আর চলা—

মোগলকে শান্টিং করাচ্ছিল নিকোলাস। মোগল বাদশাহকে নাম দিয়েছে নিকোলাস শাহজাহান। এখনকার মত ইঞ্জিনের গায়ে তখন ড্রাইভারের নাম লেখার রেওয়াজ ছিল না, না ইঞ্জিনের বিশেষ কোনো নামকরণ। বিলেতে অবশ্য সে আমলেই ইয়র্কশায়ার, করোনেশান, নক লং, হুইটিংটন ক্যাসল, স্প্রিংবক, দি গ্রীন হাওয়ার্ড, অথবা জগদ্বিখ্যাত ইঞ্জিনের মত দশ হাজার এই সংখ্যাটি মুদ্রিত থাকত। আমাদের দেশে ছিল না। থাকলে হয়তো মোগলের গায়ে নাম লিখিয়ে নিত নিকোলাস—বড়ো করে ক্যাপিটালে শাহজেহান। তলায় ক্যাপে-স্মলে ডেভিড ও'ব্রায়েন।

মোগলকে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখত যে কে বলবে বাদশাহের বয়েস হয়েছে। দাড়ি পরিচ্ছন্ন করে ছাটা, হাতে গোলাপ। তেমনি বাদশাহী পোষাক, তেমনি জাঁহাপনা উচিত মৃদু হাস, যেন এইমাত্র তাজমহল তৈরী সম্পূর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শাজাহান পড়ে, দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটক দেখে আর সকলের মত তারও শাহজাহান ভক্তি উছলে পড়ত। এই মনীষী দুজন শাহজাহানকে অতিমানব সৃষ্টি করে গেছেন। তার প্রভাব সেই বা কি করে মুক্ত হবে ?

শাহজাহানের বয়েস হয়েছিল। বাদশাহ সাজাহান ষোলো শ আটাশ থেকে আটান্ন সাল অবধি রাজত্ব করে গেছেন। আর ইঞ্জিন শাহজাহানের জনক উইলিয়ম য়্যাডামস, পালক মাসী ব্রমলী—নীলসন কম্পানীর বিলিতি আঁতুড়ে জন্মেছেন আঠারো শ আটাত্তর। ঠিক আড়াই শো বছর পর। জন্মেছিলেন পনেরো মোগল একসঙ্গে। বিলিতী গ্রেট ইস্টার্ন রেলপথে চালবাজী করে এসেছেন উনিশ শতাব্দীর শেষ তক। এর বিলিতী রাজত্বকালও আশ্চর্যভাবে তিরিশ বছর। ঠিক বাদশাহ শাজাহানের মত। পুত্রের হাতে বন্দী ছিলেন বাদশাহ আট বছর, তারপর দেহাবসান ঘটে। ওখানে ভালো করে জুৎ করতে পারে নি মোগলেরা, ত্রিশ বছর গড়িয়েও চালু হতে পারে নি। মাল টেনেছে শেষে মোগলেরা, মোট বয়েছে। দাও ইণ্ডিয়ান স্টেট রেলওয়েজকে দিয়ে, বদান্যতা দেখানোও হবে। কানা গোরু বামুনকে দেওয়াই ভালো।

নিকোলাস জানে না এ ইতিহাস তা নয়। জানে। মরা হাতীর দামটাও সে জানে। আর মোগল তো হাতী নিশ্চয়ই, মরাও নয় জ্যান্তই। একটু আয়েসী হয়ে পড়েছে, এই যা। ওটা বয়সের দোষ।

ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজকে বিক্রী করার তারিখকে যদি একরকমের মৃত্যু ধরা যায় তা হলে বাদশা শাজাহানের সঙ্গে ইঞ্জিন শাহজেহানের এখানটায়ও মিল রয়েছে। সে যাই হোক—টাইপটার নাম মোগল জেনে, চেহারাটা শৌখীনপানা দেখে শাহজাহান নামটা এমনিতেই মনে

এসেছিল নিকোলাসের। এখন দেখছে মিল এক জায়গায় নয়। এর ইতিহাসে ওর জন্ম বৃত্তান্তে ইতিহাসে মিল পদে পদে।

শাহজাহান ম্যাজেস্টিকালি দাঁড়িয়ে আলবলা টানছিলেন। চিমনীর কলকেয় ঈষৎ নীল তামাকের ধোঁয়া। তলায় একজস্ট স্টিম পাইপ আর ওভারফ্লো পাইপের নল দিয়ে সাদা বাষ্প। আওয়াজটা ঠিক গুড়ুক গুড়ুক না হলেও কাছাকাছি হচ্ছিল।

শান্টিং ইয়ার্ডে তিনটে প্রশাখা। এরা আবার আস্তে আস্তে মিলতে মিলতে অনেক অ-নে-ক দূরে গিয়ে মাত্র আটজোড়ায় ঠেকেছে। এক একটা প্রশাখায় কোনটায় আট কোনটায় দশ কোনটায় তের জোড়া লাইন পাতা। শান্টিং অর্থে পর পর লাইন, লেভেল ক্রসিং উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া। সামনে চলা পিছনে হটানো। আস্তে আস্তে ধীর পায় যাওয়া। এমন ভাবে পথ অতিক্রম করা যাতে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করতে বাধ্য হয়। ইঞ্জিনের ফ্রী হ্যাণ্ড একসারসাইজ। প্রতিটি প্রত্যঙ্গের টেস্ট বা পরীক্ষা। নাট ঢিলে আলগা নেই তো রড-এণ্ডে আর গ্ল্যাণ্ডে! বেশ টাইট আছে তো! ইঞ্জিনের চলতি বেলায় যে সমস্ত প্রত্যঙ্গ প্রতি-নিয়ত দৌড় ঝাঁপ করে, বিশেষ করে সেগুলির লক নাট, চেরা পিন দেখে নেয়া হয়েছে তো! নইলে সমূহ সর্বনাশ!

প্রশাখান্তরে যাবার সময়, বেশী মোড় ঘোরার সময়, আগু পিছু করার সময় অনেক দোষ আপনি ধরা দেয় নিজেদের। মাঠে দৌড়বার আগে এ হল সকাল বেলাকার প্র্যাকটিস। কোন শিরা-টেণ্ডনে টান ধরে নেই তো অশ্বিনীকুমারের—

অন্য একটা লেভেল ক্রসিং পার হবার আগে নিজের রাজমর্যাদায় দাঁড়িয়ে ফরসি টানছিল শাহজেহান। সিলিণ্ডার ড্রেন কক খুলে রাখছিল নিকোলাস। সিলিণ্ডারে বাষ্প জল হয়ে গিয়ে থাকলে বেরিয়ে যেতে পারবে। লেভেল ক্রসিংয়ে ঠিক তখখুনি পয়েন্টম্যান ছিল না। ঐ পয়েন্টে দেরী হবার আশঙ্কা করছিল নিকোলাস।

হঠাৎ কে যেন ডাক দিল—নিকলস—

ডাকটা পুরোপুরি না নিকোলাস না নিখিলেশ। একটু বিশেষ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ডাক। অবাক হল নিকোলাস। কে ডাকে?

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই, ওরে ব্বাপস, ঈয়ার্ড সুপার স্বয়ং হেনরি।

হেনরির মুখ বেজায় গম্ভীর। সর্বনাশ করেছে—নিশ্চয় রেগে গেছে হেনরি। কেন রেগে গেছে সেটা বোঝাও কঠিন নয়। এতো বড়ো ইঞ্জিন মোগল, অনেক দামী, নতুন এসেছে। তাকে ছেড়ে দিয়েছে ফায়ারম্যানের হাতে। তাও আনকোরা নতুন আগওয়ালা! কাণ্ডজ্ঞান নেই একেবারে ও'ব্রায়েনের।

—ইয়েস স্যর, গুডমর্নিং স্যর—বলে নেমে এলো ফাঁসীর আসামী নিকোলাস, মোগলের ক্যাব থেকে।

—ও'ব্রায়েন কোথায়?

প্রায় পাশ থেকেই কে যেন উত্তর দিল—এই যে! গুড মর্নিং।

চুপ করে রইল হেনরি। রাগের মাত্রা এতো অধিক, বাক্যি সরছে না মুখ দিয়ে।

ও'ব্রায়েন ঘাবড়ায় নি। সে ঘাবড়ায় না। তখন বোঝা যায় নি, ও'ব্রায়েন পরে বলেছিল নিকোলাসকে, ঘাবড়ায় নি তো সে। বরং উল্টে তার কাজে হস্তক্ষেপের অপরাধে চটে গিয়েছিল হেনরীর ওপর—

হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতেই বলল ও'ব্রায়েন। দুগালে পাউণ্ড কয়েক মাংস যেন বিপজ্জনক ভাবে দুলতে লাগল গিরিচূড়া থেকে।

ও'ব্রায়েন বলল—মশাইকে কিছু অপ্রসন্ন দেখাচ্ছে! কেন?

তার উত্তর না দিয়ে হেনরি পড়ল নিকোলাসকে নিয়ে—কি কি দেখতে হয় ইঞ্জিন নিয়ে বেরবার আগে? কি কি চেক করেছ? বলো—বলো—শীগগীর বলো—

ভাবখানা, নইলে এই এখুনি আমার সামনে ঈয়ার্ড ছেড়ে চলে যাও।

নিকোলাসের ঠোঁটের বাঁকে মৃদু এক টুকরো হাসি শুশুকের মতো একবারটি মাথা তুলেই মিলিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগল নিকোলাস—তাতে ভয়

পাওয়া কূর্মের মতো মুণ্ডু ঢুকিয়ে নেওয়ার আভাস তো নেই-ই, সবজান্তা উচ্ছ্বাসের প্রগলভতাও নেই।

নিকোলাস বলল—বয়লারে জলের লেভেল দেখেছি গেজ গ্লাসে। একবার 'ব্লো' করে নিয়েছি তার আগে। প্রেশার গেজ দেখে নিয়েছি, ঠিক মতো স্টিম তৈরী হচ্ছে কিনা। ফায়ার বক্স খুলে আগুনের রকম দেখেছি। টিউব এণ্ড, ফিউজ প্লাগ, ইটের আর্চ খিলেন দেখেছি। জলের ট্যাঙ্ক, কয়লার গাদি দেখেছি। ইন—

আরো বলতে যাচ্ছিল নিকোলাস, মাঝ পথে থামিয়ে ধমক দিল হেনরি—ওগুলো অশিক্ষিতরাও পারে। আসল কথায় এসো—

এ মুখ থেকে ওমুখে চাওয়াচায়ি করছিল ওব্রায়েন আর সকালবেলার বাঁকা নরম রোদ। বলবার ছিল না ও'ব্রায়েনের। দরকার হচ্ছিল না। মুখের মতো জবাব পাচ্ছে হেনরি।

নিকোলাস বলল—বলতে দিন স্যর। পর পর বলে যাই। ইনজেকটার ছুটোই দেখেছি। পিটে চাপিয়েছি ইঞ্জিন। ব্রেক ভালো করে কষে, রিভার্সিং হাতল ঠিক মাঝ গিয়ারে রেখে তলায় গিয়েছে। সিলিণ্ডার ড্রেন কক খুলে সমস্ত গ্র্যাণ্ড রড-এণ্ডের নাট। আর অন্যান্য লকনাট চেরাপিন দেখে নিয়েছি স্প্যানার দিয়ে। ক্র্যাংক য়্যাক্সল, বিগ এণ্ড ইত্যাদি দেখে নিয়েছি। তেল দিয়েছি। স্লাইড বারের সামনের পিছনের বোল্ট, একসেনট্রিক, স্ট্র্যাপ, রড, বেয়ারিং স্প্রিং কানেকশান, লং রিভার্সিং রড—সব দেখেছি। ছাইদানি দেখেছি, ফায়ার বার দেখেছি।

হেনরি বলল, গলার আওয়াজে আগেকার ঝাঁঝ একেবারেই নেই। নরম হয়েছে অনেক।—এ সব বই থেকে মুখস্থ করেছ তোতাপাখীর মতো। ক্র্যাংক, ভাল্‌ভ, সাইড রডের সঙ্গে স্টিফেনের লিংক মোশনের পারস্পরিক সম্পর্ক এঁকে বোঝাতে পারবে? যে কোন একটা পোজিশান আঁকলেই চলবে—

ও'ব্রায়েন-ও বুঝল, নিকোলাসও বুঝল—ইঞ্জিনের হাত পায়ের ক্রিয়াকলাপ বোঝা শেষ। হেনরি ডুব মেরেছে হৃদি রত্নাকরের অগাধ

জলে। ইঞ্জিনের হৃদযন্ত্রের, হার্ট লাংয়ের, পাকস্থলী অন্ত্রের, পিলে যকৃতের ক্রিয়া বোঝাতে হবে। রোগ নির্ণয় করতে হবে। সারাতে হবে।

নিকোলাস নিচু গলায় অনেকটা আপন মনেই বলল—একটুকরো কাগজ—একটা পেনসিল—

পকেট থেকে ছোট্ট নোট বই বার করল হেনরি। তার পুটে গোঁজা আছে সরু ছোট্ট পেনসিল। একটা পাতা খুলে দিলে হেনরিই—নাও—

রাইট হ্যাণ্ড ক্র্যাংক লিডিং। রাইট হ্যাণ্ড বিগ এণ্ড টপ আর লেফট হ্যাণ্ড বিগ এণ্ড ব্যাক সেণ্টারে। ফরওয়ার্ড, মিড, ব্যাক গিয়ারে—তিনটেই। ছবি আঁকো। ঐ সঙ্গে নচ-এর ফুল, থার্ড, সেকেণ্ড, ফার্স্ট পোজিশানে লিড, ওপনিং, কাট অফ, রিলীজ, য়্যাঙ্গল কতো যদি বলতে পারো—চেষ্টা করো—

ছটো ছবি নিজের মতন করে এঁকে কেটে দিল নিকোলাস। ভুল ভ্রান্তি ছিল তাতে, আঁকাও ভালো হয় নি। লাইট পোস্টে খাতা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঁকা যায় ভাল ছবি?

তৃতীয়টা দেখাবার মতো হল। জায়গা থেকে কয়েকগজ দূরে এসে নিকোলাস মনে করেছিল নিজের মনেই আঁকছে সে। কেউ দেখছে না। তা নয়। দুই ঘাড়ের ওপর দিয়ে আদ্যোপান্ত নজর রেখেছে দুই বাঘ। ভুল হলে একজন না একজন হালুম করে উঠবে নিশ্চয়।

চার্টটা মুখস্থ ছিল না। ট্রাভেলে ঠিকেই ভুল। ফলে আদ্যোপান্ত সেই অনুপাতে ভুল হয়ে গেল। সব ক'টা। সব ক'টা এক অনুপাতেই ভুল।

পিঠ চাপড়ে দিল হেনরি। হাসল হেনরি—আর একটা মোটে প্রশ্ন। আই-এইচ-পির হিসেব জানতে চাই!

নিকোলাস বলল হাসতে হাসতে—তেত্রিশ হাজার ইনটু 'প্ল্যান'—অর্থাৎ পি-এল-এ-এন—

বিস্মিত হেনরির চোখ মুখ থেকে তারিফ ঝরে পড়তে লাগল।

হেনরি জিজ্ঞেস করল—ক মাস হোলো তোমার এ লাইনে?

নিকোলাস বুঝেছে বাজী মাত। ও'ব্রায়েন-ও বুঝেছে নিশ্চয়। নিকোলাস বলল—এই ঈয়ার্ডে মাস তিনেক—

হেনরি বলল—ঈয়ার্ডে মানে ?

নিকোলাস বলে—আপনার মনে থাকতে পারে, জনাব আব্দুল খালেকের ওখানে ছিলাম আমি—পোনাহাট ঈয়ার্ডে।

—তা মনে আছে। সেখানে তো তুমি কম্পানীর এমপ্লয়ী ছিলে না।

—আজ্ঞে না। আমার নিজের কৌতূহলের অধীনে শখের এমপ্লয়মেণ্টে ছিলাম।

হেনরি বিড়বিড় করল, অনেকটা আপন মনেই—খাতায় তো নাম ছিল না। টু ঈয়ং—বড্ড ছেলেমানুষ।

তারপর মুখ ফেরাল ও'ব্রায়েনের দিকে—কাল থেকেই লাইনে দিয়ে দিও। রাস্তাঘাটের জিয়োগ্রাফিটা জেনে আসুক।

যাকে ছাড়ে নিখিলেশ, ভালো করেই ছাড়ে। অন্ততঃ সেই গর্বই ছিল তার। সে মনে করেছিল—কুন্তলাকে ছেড়েছে সে। পোনাহাট, পান্থপাদপকেও।

তার গত জীবন পর্যালোচনা করলে এ তথ্য মেনে নেওয়া যায়। দাসপাড়া রোডকে ছেড়ে উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া ছেড়ে পান্থপাদপ। জীবনের বন্ধুর পথে হেঁটেছে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের চড়াই উৎরাই উৎরেছে সমান উৎসাহে। মুখ ব্যাজার করে নয়।

কিম্বা বলা যেতে পারে সমান উৎসাহহীনতায়। বিপদে অধীর হয় নি, সুখেও উল্লসিত-প্রাণ হয় নি।

লাইনে বেরিয়ে পোনাহাটে প্রথম রাত্রি সে স্টেশনেই কাটিয়ে দিলে। একটা সুবিধে হল তার। এস এম ছুটিতে গেছেন, রিলীফ এসেছে তার,—নতুন লোক। এ এস এম পাকাপাকিই বদলি হয়ে গেছেন। পুরোন বলতে মালবাবু—সুধাসিন্ধু সুর।

রাতটা কাটল তার ওখানেই। খাওয়াটাও।

সুরবাবু চুপচাপ মানুষ। তার নিজেরই অনেক কথা, তদধিক ব্যথা। পরকে নিয়ে ঘামাবার মাথা তার নেই। নিখিলেশ নিজেও যেচে কিছু

জিজ্ঞেস করে নি। করবে না। পাশাপাশি খেতে বসে এবং শুয়ে চাকরী বিষয়ের কথাই হল তার সঙ্গে। সুরবাবুর আক্ষেপের কথা—মালবাবু না হয়ে, টেকনিকাল লাইনে যদি তিনি থাকতেন! নিখিলেশের সামনে কতো ভবিষ্যৎ, উন্নতির কতো রাস্তা খোলা। এক্সপ্রেস ট্রেণের ড্রাইভার হবে সে একদিন, এতে ভুল নেই। নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছিল—কেন, মালবাবুর তো বাঁ হাতের দু পয়সা আছে। ড্রাইভারের তো তা নেই। ইত্যাদি—

দ্বিতীয় দফায় ধরা পড়ে গেল, স্টেশন পোর্টার সোনালালের কাছে। সোনালাল বিহারী হলেও 'বংগালী হৈয়ে গেচে'। রসিক লোক। সন্ধ্যে-বেলায় স্টেশনের স্টাফ কোয়াটার্সের পিছনে বটগাছ—তার তলায় একবারটি এক ছিলিমে না-বসলেই নয়। রিকশওলারা জোটে, স্টেশন পোর্টারদের আরো দু একজন। মৌলোভী জোটে আরো অনেকে। রাঙা না হয়ে বেরয় না ওখান থেকে কেউ।

সোনালাল তখন রসিকতর।

রাত পৌনে এগারোটায় সেই আবিষ্কার করল নিখিলেশকে।

—আরে-আরে নেকলেস যে। তুমি আর একদিন এইয়েছিলে। তা ব্রাদার খোবোর ভালো তো সোব।···না, ব্রাদার বলব না আর তোমাকে। আগওয়ালা হৈয়েসো। ডেরাইবার ব'নে যাবে তুরন্ত। হিনরি সাহাব লিখিয়েসে তোমার লিয়ে।

নিখিলেশ বলল—না সোনালাল, তুমি আমাকে বেরাদারই বলবে।

—তা এতো কথা কে বললে তোমাকে? ও সব তো ভুল! ফায়ারম্যান হয়েছি—তাও তো অস্থায়ী। ঠিকে।

বাজে কথা শোনে না, বলেও না সোনালাল। কোন কথা শুনলে, নিজের সহজ বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ক'ষে দেখে। কোনও খবরের সারবত্তা তার বিচার বিবেচনাই বলে দেয় তাকে। যাই হোক—আসল কাজের কথা নিয়ে পড়ল সোনালাল।

—তা ব্রাদার—হিঁয়াসে চৈলে গিয়ে ভালোই কাম করেছ তুমি। ও মেয়ে ছেলেটা লোক ভালো নোয়। তোমায় নেকলেস বানিয়ে গোলায়

পরিয়ে রাখলে—আবার এই বাবুঠো আইলো তো ব্যস! ভাগা দিল ভুমকো।

নিখিলেশ নামটা বাঙালী উচ্চারণে বলা হয়তো সোনালালের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বলে চেষ্টা করলে না পারত তাও মোটেই নয়। নেকলেস কথাটা আবিষ্কারই তার। 'কুন্তলার গোলার হার তুমি—নেকলেস। ওনেক পৈসা আছে মেয়েছেলেটার। দেখলে-না গাড়ী কিনেছে হাওয়া খেতে! সোব দিয়ে যাবে তোমায়। লেইগে থাকো ব্রাদার। ছেড়ে দিয়ো না। ও তোমার শাককে শাক—আবার পিছনে মূলো ভি আছে।' এই ছিল সোনালালের বিশ্লেষণ।

বাবুটি তা হলে আছেন। এবং জেঁকেই বসেছেন।—নিখিলেশ ভাবতে লাগল।—না থাকার কোন কথাই নেই। শুধু একটা জিজ্ঞাসা ক্বচিৎ ভবিষ্যতে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বাবুটি কে? কুন্তলার সঙ্গে সম্পর্ক কি? অমন স্বাধীনচেতা জেনানা সহ্যই বা করছে কি করে বাবুটিকে? তা হলে সম্পর্ক একটা আছে নিশ্চয়! কি সেই সম্পর্ক?

নিখিলেশ বলে—ছোড়ো ইয়ার! উসকো বাৎ ছোড়ো।—তারপর, মাস্টার সাহাব কবে আসছেন? ছুটী ক'দিনের?

মুখে না বললেও সোনালাল জানে, নেকলেস কুন্তলার খবরই জানতে চায়। মাস্টার মশাই অর্থাৎ এস এম-এর আসার জন্যে তো ঘুম হচ্ছে না নেকলেসের! সোনালাল বলে—জানো নেকলেস—বাবুঠো যেন ক্যায়সা! ঐ এক কিস্‌মের আদমী। বোনছে না—বনিবনাও হোচ্ছে না, মেয়েছেলেটার সোঙ্গে। ঐসাই তো সুনা যাচ্ছে!

তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে যায়। উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে সোনালাল। কুস্তিগীরের ভঙ্গীতে নিজেরই ডান উরুতে চাপড় মারে একটা। বলে—আরে ব্রাদার, তুমি তো কেষ্ট ঠাকুর হৈয়ে গিয়েছ! আর একজন ঔরৎ, পোসোন্দো হৈল না তোমার। দিয়ে দিলে উস্তাদকে। তুমি তো জিৎনী জেনানা লোগের দিল চোরায় লিয়া। সব-কোই তোমাকেই চায়। তুমি বেগর আন্ধেরা হৈয়ে গেলো পোনারহাট—তামাম—

নিখিলেশ বলে—সে আবার কি কথা ? তুমি জানলে কি করে !—

তারপর হেসে ফেলে। বলে—তুমি নিজে জেনানা হলেও না হয় কথা ছিল। নিজের দিল-এর খবর দিয়ে বিচার করতে পারতে ! অন্যের দিল দেমাকের কথা তুমি টের পেলে কি করে ?

এ যেন একটা শাশ্বত সত্য। একটা শিশুও জানে। এমনি আত্ম-বিশ্বাসের ভঙ্গী সোনালালের কথায়—ও হোটলবালীর বাৎ-কুছু জানে কুছু জানে ভি না। ও তুসরা জগহ থাকছে। লেকিন তোমার উস্তাদজী তো রেলবে কোয়াটার মে থাকছে। উনকা সভী বাৎ রেলকা আদমি সব কোই জানে। জৈসী গহমন সাঁপ আছে—এ জেনানা ঐসী ভী। পলক পলক ছোবল মারছে উস্তাদকে—জহরসে কালি হৈয়ে যাচ্ছে তুমহার উস্তাদ।

তু একটা অনিবার্য প্রশ্ন হুড়মুড় করে ঠেলাঠেলি ভিড় করে এল, নিখিলেশের মন থেকে ঠোঁটের ডগায়। তা সত্ত্বেও হুড়কো লাগিয়ে দিল সে। তুটি কারণে। এক, কোন কৌতূহলই প্রকাশ করবে না সে। কারো সম্বন্ধেই। তুই, সোনালাল আপনা থেকেই সেগুলি নিরসন করে দেবে। জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হবে না।

হোলও তাই।

বলে যেতে লাগল সোনালাল—জাঁহা ইৎনী না-পসন্দ, উনকা ডেরা ছোড় দেনা ঠীক। চলা জানা ঠীক হ্যায়, উস্তাদকা কুয়াটার ছোড়কর। উহাঁ থাকবে ভী, উস্তাদকে সাথ থাকবে না। তুসরা কামরামেঁ শোবে—

মনে মনে ঘটনাটার ন্যায় অন্যায় বিচারে মেতে গেল সোনালাল। মনের মুখটা অনেক কথা বলছে, খণ্ডন করছে নিজেই। বাইরের মুখটা চুপ হয়ে আছে তাই। কোনো মানুষেরই তুটো মুখ একসাথে চলে না।

নিজের চিন্তার গভীর থেকে ওপরে ভেসে ওঠে সোনালাল—এই সোব কেন ? কোন মেয়েছেলেটাই তুসরা কিসীকো চায় না। সোব কোই তোমাকে চায়। তাই বোলছিলাম সোব জেনানা লোগকো দিল চোরা লিয়া ব্রাদার।

হো হো করে ছাদ ফাটানো হাসি হেসে উঠল নিখিলেশ। খাটিয়ায় শুয়ে নিখিলেশ। সবে আমেজ আসছিল ঘুমের। নিচে মেঝেয় বসে সোনালাল। মালবাবুর পাশের ঘরটা বাইরের দিক থেকে বন্ধ থাকে সর্বদা। মালবাবুর অপিসের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করা যায়। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আসা মালের আর ছোট ছোট মালের গুদাম-ঘর ওটা। সেই ঘরে খাটমলের শরশয্যা পাতা খাটিয়া পেতে দিয়েছে নিখিলেশের শোবার জন্যে।

হাসির স্বরগ্রামটা নিজের কানেই খারাপ লাগল নিখিলেশের। নিজেই লজ্জা পেল যেন। হাসির প্রকোপ থামিয়ে সোনালালকে যা সে বলল তার অর্থ এই। এই দুটো ঘটনা থেকে কোন রকমেই বিন্দুমাত্রও প্রমাণ পাওয়া যায় না—যতো জনানা লোগের মন চুরিয়ে নিয়েছে নেকলেস।

সোনালালকে যা হোক কিছু দিয়ে বুঝিয়ে দিলেও তার নিজের মনকে সে বোঝাতে পারল না।

এবং নতুন করে তার মনের ঘর ভাড়া নিল কুন্তলা আর প্রিয়বালা। পান্থপাদপ আর পোনাহাট ভাড়া নিল নিখিলেশের ছেড়ে যাওয়া মনের ঘর।

কাজে কর্মের ফাঁকে অবসরে নিখিলেশের নতুন করে মনে পড়ে। মনে পড়ে কুন্তলাকে। এই দুই নারীকে দেখতে পায় সে নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে। দৃষ্টিকোণে নতুনত্ব এনে দিয়েছে সোনালাল।

যতো সহজে ভুলবে মনে করেছিল পোনাহাটকে, তা হল না। লাইনে বেরিয়ে প্রায়ই রাত্রিযাপন করতে হয় পোনাহাটে। এই বাহ্যিক কারণটাকে উপেক্ষা করা যদিও সম্ভব হত, সোনালালের বিশ্লেষণকে নয়।

ফায়ারম্যান হবার আট ন মাসের মধ্যে এতো দ্রুত উন্নতি এই লাইনে কারো হয়েছে, এমন নজীর নেই। ফায়ারম্যান হওয়া, রাস্তার ভূগোল জানার জন্যে লাইনে বেরনো, মালগাড়ীর পরে লোকালের ড্রাইভার হওয়া—উন্নতির এই অনুক্রম।

আর সকলের এই ক'টা ধাপ ডিঙোতে চার পাঁচ বছর তো লাগেই।

হেনরির সুনজরে যে উন্নতির সূত্রপাত তার জন্ম কিন্তু নিখিলেশের নিজের কৌতূহলে। সে কৌতূহল ছিল অবৈতনিক, 'বিনি মাইনেয় আপ খোরাকী'। এ উন্নতির আঁতুড় পোনাহাট রানিং শেড। ধাত্রী—আব্দুল খালেক।

যদি বিশ পঁচিশ টাকা বেতনে ক্লিনার হয়ে ঢুকত নিখিলেশ, তবে আর পাঁচজন শিক্ষার্থী ক্লিনারের মতই দিনগত পাপক্ষয় করে বাড়ী ফিরত। ইঞ্জিন শেডে নিয়ে গিয়ে আগুন ফেলে দিয়ে অন্যান্য ক্লিনারের মত সেও ব্লো ডাউন করেছে। অন্য ক্লিনাররা জলের পাইপ সংযোগ করে লোহার রড দিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার কবে। সে খোঁচাত বুদ্ধির রড দিয়ে যুক্তির পাইপ জুড়ে। এই তফাৎ।

পোনাহাটে রানিং শেড ছিল না, হল। ঠাকুরগাছিতে ঈয়ার্ড বাড়াবার জায়গার অভাব ছিল। আইনগত কতোগুলো অসুবিধে ছিল। তাই পোনাহাট সৃষ্টি। পোনাহাট শেডে ঠাণ্ডা জল জোগান দেওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘূর্ণী প্রাণ বাঁচাল শেডের জলের তেষ্টা মিটিয়ে। ডিজেল পাম্প চামচে করে করে জল খাওয়ায়। পোনাহাট শেডে প্ল্যাণ্ট ছিল ঠাণ্ডা জলের। ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করতে ঠাণ্ডা করতে হত ইঞ্জিন। তাতেই প্রচুর সময় ব্যয়। তার ওপর ঠাণ্ডা জলকে গরম করে বাষ্প করা। পাক্কা পনেরোটি ঘণ্টা ইঞ্জিনের পেনশন প্রাপ্তি। এদিকে তাড়া। অলস করে রাখা যায় না কোন ইঞ্জিনকেই অতোক্ষণ। কাজের লোককে বেকার করে রাখা—লোকসান কার! কাজের মানুষের নয় নিশ্চয়, মালিকের—

আচমকা ঠাণ্ডা জল দিয়েই ঠাণ্ডা করা চলতে লাগল ইঞ্জিন। তাড়াতাড়ি চাই। পনেরো ঘণ্টা হা পিত্যেশ করে বসে থাকা চলবে না। গরজ বড়ো বালাই।

ফলে সর্দি গর্মি হতে লাগল—প্লেট, স্টে, টিউব, হঠাৎ ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যেতে লাগল। সর্দি গর্মি হলেই লোক মারা যায় না সঙ্গে সঙ্গে। টের পাওয়া যায় না তখনই, কতোটা ক্ষতি হল ফুসফুসের।

এমনি 'পেনী ওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ' আমরা সবাই। জীবনের সব ক্ষেত্রে।

ঠাণ্ডা জলের সেই প্ল্যাণ্টকে গরম জলের করা হল। মুখের কথা খসাল আব্দুল খালেক। আস্তে আস্তে কাজে পরিণত করল যারা, তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো য়্যাসিস্ট্যাণ্ট নিখিলেশ। এ কথা আর সবাইর মতো হেনরিও জানে।

একশো আশী ডিগ্রীর গরম জলে ধোও, ধোওয়া শেষে দুশো দশ অর্থাৎ প্রায় ফুটন্ত জল বয়লারে উপহার দিয়ে দাও। মাছের তেলে মাছ ভাজো। যে বয়লারকে ধোবে তারি বাষ্প, তারি গরম জল নাও।

সমস্ত ব্যাপারটা দু তিন ঘণ্টার মামলা। সম্পূর্ণ ধোলাই হয়ে নতুন ইঞ্জিন বেরিয়ে এল শেড থেকে।

নিজের ভবিষ্যৎ নিজেকেই গড়তে হয়। কায়িক পরিশ্রমের আগুনে পুড়িয়ে বুদ্ধির নেহাইতে ফেলে অধ্যবসায় আর ব্যর্থতার হাতুড়ি পুনঃপুনঃ পিটে পিটে গড়তে হয়। নিজেকেই। অন্যে পারে না। পিতা পুত্রের হয়ে পারে না। পিতা বা মুরুব্বি বড় জোর উসকে দিতে পারে আগুনটা। এর বেশী নয়।

নিখিলেশ যখন নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী করেছে, সে করেছিল না-জেনেই। সে জানতও না, এই লাইনে আসতে হবে তাকে কোনদিন। জানত না এই হবে তার রুজি রোজগার। সে শিখেছিল কৌতূহলের তাগিদে। তাই তার শিক্ষায় ফাঁক ছিল না, ছিল না গোঁজামিল।

মোটর গাড়ীও স্পীডের রাজা। তার নাড়ি-ভুঁড়ি, হার্ট, লাং, প্লীহা, যকৃৎ সব জানত নিখিলেশ।

বাকি ছিল এই যন্ত্রদানবটাকে জানা! স্পীডের গুপ্তমন্ত্রের ইতিহাস জানা। কে পিছন থেকে দড়ি টেনে, এই একশো আটাত্তর টন ওজনের ভারী লোহার লাশটাকে পুতুল নাচায়! এই চার হাজার আটশো মণ ওজন, দৌড়চ্ছে ষাট সত্তর মাইল ঘণ্টায়। কে জোগাচ্ছে এই শক্তি! শুধু জল শুধু কয়লা। জনক, জননী।

নিখিলেশ এসেছিল স্পীডের নেশায়। রক্তে তার স্পীড। এই স্পীডই তাকে টেনে এনেছিল বিনয় রায়ের সঙ্গে উত্তরপাড়ায়।

আর স্পীডই তার কাল হল। অবাধ গতি তুরন্ত গতি দুরন্ত গতি দুর্নিবার হয়ে উঠল একদিন।

তার আগে দু একটা প্রায় অনুল্লেখ্য ঘটনা ঘটল।

লোকাল নিয়ে বেরয় তখন নিখিলেশ।

এমনি একবার পোনাহাটে রাত্রিযাপনের সময় একটি ঘটনা। অনেকবার এসেছে, থেকেছে। সোনালালের কথা অপ্রমাণ হয়েছে। ডাক আসে নি কোথাও থেকে। না পান্থপাদপ থেকে, না রানিং শেডের কোয়ার্টার থেকে। বার বার মনে পড়েছে তার ওস্তাদজীকে। মনে পড়েছে আর কৃতজ্ঞতাহীনতার গ্লানিতে ভরে গেছে মন। এখনও পর্যন্ত গুরুজীব সঙ্গে দেখা করতেই পারল না সে। কতো খুশী হতো গুরুজী, কতো তৃপ্তি পেত গুরুজীর আত্মপ্রসাদ। ছাত্রের অসামান্য কৃতিত্বে ধন্য ধন্য করছে সবাই। সেই জয় জয়কারের সবটা পাওনাই তো তার গুরুজীর।

কিন্তু উপায়ান্তরও নেই। গাড়ী নিয়ে সে যখন আসে, ফিরে যাবার আগে গুরুজীর সঙ্গে দেখা করার সময় থাকে না। আর লাস্ট ট্রেন নিয়ে এলে রাত্রি যাপন করতে হয় অবশ্যই। কিন্তু রাত তখন গভীর।

তার শরীরের ক্লান্তি, জামা কাপড় চুলের ময়লার সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে অতো রাত্রেই না হয় সে গুরুজীর কোয়ার্টারে যেতে পারে। আশা করা যায় বিরক্ত হবেন না তাতে ওস্তাদজী, খুশীই হবেন। কিন্তু ও কোয়ার্টারে সম্ভবত প্রিয়বালা এখনও আছে। নিখিলেশ তো যাবে ওস্তাদজীকে সেলাম জানাতে। প্রিয়বালার চোখে সেটা কোন দৃষ্টিতে ধরা পড়বে, কে জানে? একটা বুঝ সমুঝ না করিয়ে চোরের মতো গৃহত্যাগ করেছিল নিখিলেশ। ওস্তাদজী জানত না চিড়িয়াটি কে? বন-টিয়া, কাছে গেলে ধারালো ঠোঁট নিয়ে কঁ্যাক কঁ্যাক করে ঠোকরাতে আসবে! না, দাঁড়ের

ময়না। কেষ্ট বুলি ধরালেই ধরবে। ওস্তাদজীকে জানতে দেয় নি চিড়িয়াটির রূপ ও স্বরূপ।

ঠিক তেমনিই প্রিয়বালাকেও বলে আসেনি, ওটা সিংহের বিবর না সাধুসন্তর গুহা। জানায় নি তাকে, ওটা নিকেতন না নীড়!

কারোকে জানতে দেয় নি। ওস্তাদজী দোর খুলে বসে আছে এরই অভ্যর্থনায়। তাকেও জানায় নি গুরুদক্ষিণার রকম। প্রিয়বালাকেও বলে নি—সারাজীবনের দরজা, শূন্য বুকের কবাট মেলে রেখেছে লোকটা তোমারই জন্যে!

কৌতুকের সঙ্গে মনে পড়ে তার। পরদিন প্রত্যূষে এদের মিলনের—মিলন কি সাক্ষাৎ কে জানে—রকমটি ভাববার চেষ্টা করে নিখিলেশ। উভয়েই অবাক! এ বলছে—ও তুমি? ও বলছে—চিনি-চিনি মনে হচ্ছে তোমার থাবাটি! জোর বেঁচে গিয়েছিলাম সেবার! এ আমায় কোথায় এনে ফেলল নিখিলেশ!

অথবা, আসল সাক্ষাৎটা কি রকম হল কে জানে?

ঘটনাটা আকস্মিক নয়। ভেবে চিন্তেই প্রিয়বালাকে নিয়ে সন্ধ্যাব অন্ধকারে ছেড়েছিল সে পান্থপাদপ। রাত সুমুখে। পারে বোঝাপড়া করুক। পারে ওস্তাদজী ভালোবাসার দড়ি দিয়ে বাঁধুক। না পারে—যা হবার হোক।

বয়স্ক দুজনের ভাব করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তার নয়। ক্ষমতার বাইরে সেটা, একত্র করতে না পারুক এক জায়গায় ভিড়িয়ে দিল। তারপর, বোঝাপড়া তোমাদের!

তাই, গুরুজীর সঙ্গে তার কোয়ার্টারে গিয়ে সাক্ষাৎ করার আপত্তি অসুবিধা দুইই আছে। গুরুজী তো এও ভাবতে পারেন - প্রিয়বালা নিখিলেশেরই। ঠাঁই নাড়া হয়েছে নিখিলেশ, গচ্ছিত রেখে গেছে গুরুজীর বিশ্বস্ততার কাছে। সময় হলে আবার ফেরৎ নেবে গচ্ছিত ধন। যদিও গুরুজীকে বলে গিয়েছিল—গুরুদক্ষিণা এনে দিলাম।

এতো দুষ্টু সোনালাল, আগে থেকে বলে নি—ভদ্রলোকটি কে! শুধু বলেছে এক ভদ্রলোক রোজই এসে খবর নেন—তোমার আসার তারিখ আবার কবে। আজও সন্ধ্যে থেকে খবর নিয়েছেন দুবার।

আবার এসেছেন। বাইরে আছেন। ডাকছেন তোমাকে।

শুতে যাবার প্রস্তুতি করছিল নিখিলেশ। পরিষ্কার হওয়া খাওয়া দাওয়া শেষ।

বাইরে এসে দেখে, কেউ কোথাও নেই। ইতি উতি তাকাচ্ছে নিখিলেশ। এক চোখ কানা মোটরের দরজা খুলে গেল। কে যেন ডাকল—উঠে এসো—

কুন্তলা!

কুন্তলা বলল, পাশের সিট দেখিয়ে—বোসো। খুব ওস্তাদ হয়ে গিয়েছ, না? এতোবার এলে গেলে দেখা করো নি যে বড়ো! ড্রাইভার ব'নে ধরাকে সরা দেখছ আজকাল—

স্টিয়ারিং-এ কুন্তলা। পাশে নিখিলেশ। চলতে সুরু করেছে ততোক্ষণে গাড়ী।

নিখিলেশ বলল—ঠিকই তো। ড্রাইভার ব'নে ধরাকে সরা দেখছ আজকাল। রাত সাড়ে দশটায় গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছ—কানা মোটর। এক চোখ আবার তার নেই। সাহস কম নয় তো তোমার—!

কুন্তলা বলল—কানা বললে আমাকে? এক চোখ নেই তো নেই। তোমার তাতে কি? চোখ একটা নেই বলেই তো তোমার মতন অপাত্রে বিশ্বাস করি। নেমকহারাম কোথাকার!

সুরে হাসি ছিল কথাটার। সীরিয়স করে ধরবার প্রয়োজন মনে করল না নিখিলেশ। শুধু ভেবে দেখার চেষ্টা করল নেমকহারামীটা কোনখানে?

এই ভাবনার অবকাশে কুন্তলা বলে যেতে লাগল—অবলাকে একা ফেলে যে যায়, সে শুধু নেমকহারাম নয়, কাপুরুষও—

নিখিলেশ কথার সুরে হাসির ছিটে মিশোলেও প্রশ্ন করল—অবলাটা কে, জানতে পারি?—মনে মনে ধরে নিল ইঙ্গিতটা প্রিয়বালার—

গাড়ীর বাঁক ঘোরাতে ঘোরাতে বলল কুন্তলা—বোঝ না, এমন ছেলে মানুষ তুমি নও।

কুন্তলাও মুখে বলবে না অবলাটা কে। দেখা যাক নিখিলেশ কাকে মিন করে।

নিখিলেশ সোজা রাস্তায় যাওয়াই নিরাপদ বিবেচনা করল। বলল—অবলা মোটেই নন তিনি। আর তাঁকে তাঁর নিজের আস্তানায়ই পৌঁছে দিয়েছি। পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য ছিল আমার, তাই করেছি। তারপর তাঁদের বোঝাপড়া। বুঝে পড়ে নিন তাঁরা নিজেরাই।

গাড়ী চলছে আস্তে আস্তে। ধরেছে গ্রামের পথ। পোনাহাটের চৌহদ্দী ছাড়াল বলে—

—বোঝাপড়া?—হাসল কুন্তলা। অবিশ্বাসের হাসি। বলল—বোঝাপড়া তাদের হয় নি। এসে এসে বলে গেছে আমাকে। আমি ডেকেছি, বলেছি—অসুবিধে হলে ফিরে আয়। প্রিয় বলে—না। বদনাম হবে তোমার হোটেলের। মুসলমানের বাড়ী রাত কাটিয়েছি। দেখি আমার বরাত কোথায় নিয়ে যায় আমায়!

নিখিলেশ বলল—আছে কোথায় প্রিয়?

—আছে ওখানেই। স্রোতে ভাসছিল দুটো কলসী। কাছাকাছি এসে ঠেকেছে। দুটোই পিতলের। কোনোটাই ভাঙছে না। ঠেকাঠেকি হয়ে ঠোকাঠুকি হয়ে বাজনা বাজছে শুধু টুং টুং।—না ঠিক হল না। একটা মাটির, একটা পিতলের।

নিখিলেশ বলল—মাটিরটা ভাঙবে শীগগীরই। জানি ভাঙতেই হবে, মেয়েদের কি আর বেশী ডাঁট দেখালে চলে? অর্থনৈতিক পরাধীনতার বেড়ি তাদের পায়ে।

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে কপট কোপের সুরে কুন্তলা বলে—কি বললে—মেয়েদের বেশী ডাঁট দেখানো চলে না? ডাঁট দেখাতে পারে এমন মেয়ে একটাও ছাখো নি?

নিখিলেশ বলে—ঐ একটাই। আর সেটা একটা ব্যতিক্রম! হোলো?

গাড়ী নাচছে, দুলছে। মেঠো রাস্তা। দুপাশে ধানক্ষেত। মাঝখানে সরু সিঁথির মতো পথ। সেই সিঁথিতে সিঁদুরের টিপের মতো জ্বলছে কানা হেডলাইট। সিঁদুরের রেখার মতো হেডলাইটের আলোর রেখা।

কেন জানি এই উপমাটাই এল নিখিলেশের মনে। কবিত্বের ছোঁয়া লেগেছে আজ তার। কবিত্বের উৎস তার পাশে বসে। ছোঁয়া লাগছে গাড়ীর দুলুনিতে। পুরুষের মনে মেয়েরা চিরকাল কবিত্ব জুগিয়ে এসেছে।

টাল সামলে কুন্তলা বলল—হায় ঈশ্বর, আচ্ছা কাকে ভেবেছ তুমি মেটে কলসী? প্রিয়কে?

সত্যি অবাক হয়েছে নিখিলেশ—তবে?

কুন্তলা পথের ওপর চোখ রেখে বলল—মেটে কলসী তোমার ওস্তাদজী—প্রিয় নয়!

নিখিলেশ বলল—তা, ধাক্কা লেগে ফেঁসে যাচ্ছে না কেন মেটে কলসী?

কুন্তলা বলল—ফাঁসবে না তো। পাশাপাশি চলবে। বাইরের কোন জোর স্রোত বা ধাক্কা না এলে ঠোকাঠুকি লাগছে না তো, ঠেকাঠেকি হচ্ছে শুধু!

নিখিলেশের মন অপরাধ বোধে ভরে গেল। মত না নিয়ে, জিজ্ঞাসাবাদ না করে প্রিয়বালাকে ওখানে নিয়ে তোলা—খুব অন্যায় হয়েছে তার। জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল ওর। পোকায় খাওয়া আগেই ছিল, বোঁটা থেকে ঝরে না পড়ে এবার।

একটা নিঃশ্বাস পড়ল নিখিলেশের আপনা থেকেই। বলল—

—আচ্ছা, প্রিয় এখন কি করতে চায় তা হলে? ওখানে থাকবে অথচ ওস্তাদজীর সঙ্গে নয়।

কুন্তলা বলল—ওরে ব্বাপস—কি ঝাঁকুনি রে বাবা! আচ্ছা আগের বার আমরা এসেছিলাম, কতোদিন আগে? তখন তো—রাস্তা এতো খারাপ ছিল কি?

প করে রইল নিখিলেশ। প্রিয়র কথা ভাবছিল সে। কি করা উচিত এখন তার? প্রিয়র জীবনটাকে নষ্ট করতে চায় নি সে। ওরি

মধ্যে চকিতে কখন মনটা তার মিলিয়ে দেখেছে—এই তো সেই পথ। সেদিনও কুন্তলার অনভ্যস্ত হাতে স্টিয়ারিং ছিল। টান মেরে খোঁপা খুলে দিয়েছিল কুন্তলার। ব্যক্তিগত অভিযান ঐখানেই ইতি হয়ে গেছে। এগয় নি আর।

নিখিলেশ বলল—কাজটা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে আমার—

আধো অন্ধকারে, ড্যাশবোর্ডের সামান্য আলোয় দেখতে পেল না নিখিলেশ, রহস্যের ভ্রূভঙ্গী করল কুন্তলা। বলল—প্রায়শ্চিত্ত করে ফ্যালো তা হ'লে।

কুন্তলা নৈশ অভিযানে বেরিয়েছে এ কথা বলবার জন্যে নয়। হয়তো আরো কিছু বলবার ছিল। নইলে এইমাত্র মুখ ফসকে যে অভিমানের কথা বেরিয়ে গেল তার, ইতি হওয়া উচিত ছিল সেইখানেই।

বাইরেটা দুজনেই চুপচাপ। তার মানে এ নয়, দুজনেই চিন্তাহীন নিশ্চিন্ত, বলার কথা ফুরিয়েছে দুজনেরই। বরঞ্চ ঠিক তার উলটো।

বলার কিছু ছিল কুন্তলার। তার আগে ভাবনার। প্রায়শ্চিত্ত করতে ব'লে যে পথ নির্দেশ দিল নিখিলেশকে, সম্ভবত সে পথের পথিক হবে না সে। হলে আগেই হতে পারত। হতে পারত পান্থপাদপ ছাড়ল যখন দুজন। সে রকম অভিপ্রায় নিখিলেশের এখনও নেই। আগে চাকরী বাকরী ছিল না, এখন হয়েছে—এইটুকু যা তফাৎ।

সরাসরি ওর বক্তব্যে আসবার আগে ঘুর পথে রওনা হল কুন্তলা।

—আচ্ছা, এক বিছনায় না-শোওয়া পর্যন্ত মেয়েদের ভালোবাসা স্বীকার করতে পারো না কেন বলো তো? তুমি বলে নয়, তোমরা পুরুষেরা! একসঙ্গে না শুলে কি ভালোবাসা যায় না?

সহজ হবার চেষ্টা করে নিখিলেশ বলল—আমার কথা থাক। অন্য পুরুষের কথা বলছি। কারণটা অতি সোজা। নিরাকার পরম ব্রহ্মের যেমন শ্রীচরণ হতে পারে না, নেই ব'লে, এও ঠিক তেমনি। ভালোবাসা নামে মনের এই বৃত্তিটা দাঁড়াবে কোথায়? বাঁচবে কি আশ্রয় করে? পুজো করতে একটা পুতুলকে খাড়া করা কি জন্যে?

সেই মাঠ। হয়তো সেই খেজুর গাছ। তফাৎ, সেই চাষী নেই আজ। মেয়ের হাতে স্টিয়ারিং দেখে নেই তার চোখের বিস্ময়।

আর একটু তফাৎ আছে। শীতকাল। খেজুর গাছের গলায় আজ দড়ি আর কলসী বাঁধা। আত্মহত্যা করছে সে। আত্মদানের পরোপকার করছে সে। মূর্খদের আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র।

কুন্তলা ভাবল, সে নিজেও কি এই মুহূর্তে স্বখাত সলিলে আত্মহত্যা করতে চলে নি। অমনি গলায় দড়ি আর কলসী বেঁধে।

কুন্তলা পৌঁছে গিয়েছিল সেই জায়গায়, যেখান থেকে ফেরার পথ সুরু। পথের মোড় মনের মোড়—ফিরতে হয় এবার দুটোই।

গাড়ী থামাল কুন্তলা। এই সেই জায়গা। নিখিলেশের সাহস হাত বাড়িয়েছিল কুন্তলার দিকে। হাত বাড়িয়ে পরখ করতে চেয়েছিল, মাপতে চেয়েছিল কুন্তলার মনের তলা।

কুন্তলা বলল—ধরো, কারো যদি আর এগোবার উপায় না থাকে সে কি ভালোবাসবে না ?

নিখিলেশের তাকানোর ভঙ্গীতে কেমন যেন ধরা পড়ে গেল কুন্তলা। ঢোক গিলে বলল—এই যেমন তোমার ওস্তাদজী। এক সঙ্গে থাকার জন্যে আর তো পেড়াপিড়ি করে নি, করছে না। তবু বলছে—এই বাড়ীতেই থাকো তুমি। যেও না। প্রিয় রাজী নয়।

আগেকার দিনের কথা স্মরণে পড়ল নিখিলেশের। সেদিন ছিল বিকেল। আজ গভীর রাত। হাওয়ায় হেমন্তের শিরশিরানি। চতুর্দিক নির্জন। জনমানব নেই। সাক্ষী নেই, ভবিষ্যতে সাক্ষী দেবে তার উপায় নেই।

সেদিন হাত বাড়িয়েছিল আজও বাড়াতে পারে। অনায়াসেই।

নিখিলেশের মনের কথা টের পেল কি কুন্তলা।

হেডলাইট নেভাতে নেভাতে বলল—ব্যাটারী খরচা করে কি লাভ খামকা ? আপত্তি নেই তো তোমার।

নিখিলেশ বলল—না, আপত্তি আর কি।

কুন্তলা বলল—সেদিনের কথা মনে পড়ে নিখিলেশ ?

—হুঁ। পড়ে বৈকি।

—দেখি তোমার স্মৃতিশক্তি, কি কি মনে পড়ে বলে যাও

নিখিলেশ বলে—রাত্রি গভীর। কেউ নেই কোনখানে। তুমি আমায় ভেবেছ কি বলো তো। ধান ক্ষেত, অন্ধকার। রাস্তা অন্ধকার। গাড়ী অন্ধকার। ভূতের মতো বসে আছি।—পাশের জঙ্গল থেকে গোবাঘা-টোবাঘাও তো—

—জঙ্গল থেকে কেন? বেরোলে এইখান থেকে বেরোক—বলে কাছে সরে এসে নিখিলেশের বুকে মাথা রাখল কুন্তলা।

—জেনে শুনে আগুনে হাত দিলে আমি কি করতে পারি। বেরোক বাঘ, আর তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাক।

নিখিলেশ নিবিড় আলিঙ্গনে কুন্তলাকে বুকে টেনে নিল। কপালে গালে মাথায় মুখে অজস্র চুম্বন করতে লাগল।

হঠাৎ স্প্রিংয়ের মতো ছিটকে সরে এল নিখিলেশ। আলিঙ্গন থেকে নিজেকে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে।

কুন্তলাও সরে গেল। ভয়ে।—কি হল—লোক-টোক নাকি!

নিখিলেশ বলল—হ্যাঁ। এখানে নয়। হোটেলে বসে সব দেখেছে সে।—তুমি কি বলো তো কুন্তী! আমি কতোক্ষণ সামলে ছিলাম নিজেকে—তুমিই বলো—। তুমি কেন—কেন কাছে সরে এলে—? আমি—আমি কি রক্তমাংসের মানুষ নই?

কুন্তলা বলল—হোটেলে কেউ নেই। ভুল—ভুল—সব ভুল নেকলেস—

—তার মানে কি?

—তার মানে জানতে চেও না। বলতে পারব না। শুধু জেনে রাখো—কেউ নেই, ও কেউ নয়।

অভিভূতের মতো চুপ করে রইল নিখিলেশ। পরে বলল—তোমাদের এ কী রীতি কুন্তী? যখন কাছে ছিলাম, দূরে ঠেলে দিলে। আর এখন দূরে আছি বলেই কি কাছে টানছ?

কুন্তলা বলল—অযোগ্যকে ভালোবাসলে মনে হয় ভালোবাসা শরীর সর্বস্ব। শরীরের একটা ব্যাধি মাত্র। তা তো পারি নি কোনদিন। তুমি প্রিয়কে নিয়ে বেরিয়ে এলে—ঘেন্নায় মরে গেলুম, ভাবলুম কাচে আর হীরেয় তফাৎ জানো না তুমি। ভেবেছিলুম মুখ দেখব না আর কোনদিন। তারপর, ভুল ভাঙল। তোমাকে নিশ্চিন্ত আরামের বাসা থেকে ঠেলে দিলুম—দেখলুম, তোমার পাখায় কতো জোর!

উত্তেজিত স্বর নিখিলেশের—হোটেলের ও ভদ্রলোক তবে কে? আগে আমাকে তাই বলো।—কি সম্পর্ক তোমার সঙ্গে?—বলো, বলো। চুপ করে আছো কেন? ভালোবাসার লোক? না আরো একটু বেশী?

কুন্তলা বলল—আজ না শুনলেই নয়! আর একদিন বলব নেকলেস, আজ নয়।

—না—আজই শুনতে হবে। আজই জানতে হবে আমাকে। এই মুহূর্তে—

—আজই জানতে হবে? তবে শোনো।—ভালোবাসার লোক নয়, ভূতপূর্ব স্বামী—একটুও ভালোবাসি না ওকে। কোনদিন বাসতে পারি নি। ভালোবাসার লোক ও নয়—দুশ্চরিত্র লম্পট মাতাল অকর্মণ্য। শুধু পুরুষ। পশু একটা। জানোয়ার—। রেজেস্ট্রি বিয়ে। নাকচ করে এসেছি। তবু পিছু ছাড়ে না। সিঁদুর পরতে দেখেছ কোনদিন? আমার কাছে শুধু স্ত্রীলোকের মূল্য চায়।—একদিন তাড়িয়ে দিল আমাকে। বলেছিল—ঝি'র মতো থাকতে হবে।—চলে এলাম।—আসবার সময় বলেছিল—মেয়েছেলে, যাবে কোথায়? এসে পায়ে ধরে সাধতে হবে। আর সেদিন লাথির বেশী কিছু পাবে না। মনে রেখো।—আজ আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি। আবার এসে জুটেছে। কানাকড়ি রোজগার করার মুরোদ নেই। যা ছিল, উড়িয়ে পুড়িয়ে আবার জ্বালাতে এসেছে।

নিখিলেশ কথা খুঁজে পায় নি। শুধু বলল—সরো, স্টিয়ারিং দাও। চলো বাড়ী যাই। রাত হয়েছে। ভোর চারটেয় উঠতে হবে কাল।

সারা রাস্তা নীরবে কেটেছে।

গাড়ী গ্যারাজে তুলে স্টেশনের পথ ধরল নিখিলেশ।

কুন্তলা বলল—কি হল, আসবে না?

নিখিলেশ বলল—আজ নয়। পরে—

কুন্তলা বলল—তোমার জন্যে দরজা খোলা রইল। ইচ্ছে আর মন হলে এসো। যখন ইচ্ছে যবে ইচ্ছে—। তোমার জন্যে বসে রইলাম। ফিরে এসো—

কুন্তলা ভাবল আজই দরকার ছিল নিজেকে এগিয়ে ধরার। প্রিয়র জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে কাল থেকেই অন্য পথ ধরত যদি—। অনেক ভুল করেছে জীবনে, আর নয়।

পান্থপাদপের খোলা দরজা দিয়ে অনেক কেউ এল গেল। সেই ভদ্রলোকও এলেন একবার। আবার চলেও গেলেন। শুধু যার জন্য খুলে রাখা দরজা, সে-ই এল না।

নিজেকে বার বার চাবুক মারল কুন্তলা। শুধু নিমেষের ভুলে দুর্বলতার এই লজ্জা পেতে হোল তাকে। সেই রাত্রিটা জীবনে না এলে উঁচু মাথা উঁচুই থাকত তার। দর্প হরণ করার জন্য মধুসূদন আছেন তা হলে—কোন অলক্ষ্যে বসে। নিখিলেশ তো চলেই গিয়েছিল।—তার মতো কঠিন মেয়ে কেন মিথ্যে তাকে পায়ে ধরে সাধতে গেল! ভগবান শুধু তার মাথাটা নুয়ে দেবার জন্য তার জীবনে ঐ রাতটা এনে দিয়েছিলেন।

তা ছাড়া কুন্তলার উপায়ই বা কি ছিল? প্রিয়বালার প্রতি অবিচার বোধে পীড়িত হচ্ছিল নিখিলেশ। প্রিয়বালার দিকে ঝুঁকে পড়ে যদি! সেদিন ওটুকু না করে উপায় ছিল না কুন্তলার। নিখিলেশ। স্টেশন স্টাফ নাম দিয়েছে নেকলেস। নিখিলেশের অপভ্রষ্ট উচ্চারণ। নেকলেস। কণ্ঠহার। কুন্তলার কণ্ঠহার। বেশ নাম। বীজমন্ত্রের মতো গোপনে নেবার মতো নাম। প্রকাশ্যে উচ্চারণ করবার মতো নয়। সবার গোচরে এ নাম নিলে সমাজ ক্ষমা করবে না। সতীনাথের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি!

কি করে বাইরের লোককে বোঝাবে সে। মদ খেয়ে এসে একদিন নর্দমায় পড়ে যেতে পারে না! পড়ে মরে যেতে পারে না। তার পথের কাঁটা। কী বিশ্রী ব্যাপার! সতীনাথের সঙ্গে একসাথে থাকে না সে, এই তথ্য কি করে সকলকে জানানো যায়? আসে, জ্বালাতন করে, পয়সা লুটে-পুটে নেয়। কুন্তলার পয়সায় মদ ভাঙ খায়, মেয়েমানুষের বাড়ী যায়। হোটেলের ঠাকুর চাকর ঝি—কারোকেই আসল স্বরূপটা বোঝাতে পারে না কুন্তলা। এই জ্বালায় নিশিদিন জ্বলছে সে।

সেদিন রাত্রের ঐ ঘটনার পরই নিখিলেশ অন্য লাইনে বদলী হয়।

এবং নতুন লাইনে যাবার জন্যেই কি না নিশ্চয় করে বলা কঠিন, একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে তার গাড়ীর।

একবার ভ্যাকুঅম ব্রেকের সংযোগকারী হোস পাইপ ট্রেণের মাঝ বরাবর ছিঁড়ে যায়। চলতি পথে, মাঝ রাস্তায়। সমস্ত ট্রেনের ব্রেক আপনিই চেপে বসে। গাড়ী আপনি থেমে যায়। ছিঁড়েছে যেখানে, তার আগেকার কক বন্ধ করে দেয় নিখিলেশ। পিছনের সমস্ত গাড়ীর সমস্ত ব্রেক চাকা থেকে আলগা করে দেয়। গাড়ী চালু করে। সময় লাগে প্রচুর। গাড়ীর প্যাসেঞ্জার মারমুখী হয়ে ওঠে। পিছনে আরো দুখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে যায়, সে দুটোর প্যাসেঞ্জারও। এখানেই ইতি নয়। নিখিলেশের নিজের গাড়ীতে তখন লোড পুরোই আছে—তদ্দরুণ ভরবেগ বা মোমেণ্টামও পুরো। কিন্তু ব্রেক কাজ করছে মোটে আর্ধেক গাড়ীর। স্টেশনে পৌছনর আগে—পাঁচ, দশ, পরে পনেরো ইঞ্চি ভ্যাকুঅম নষ্ট করেও গাড়ী প্লাটফরমে দাঁড়াল না। প্রাণপণে ভ্যাকুঅম নষ্ট করে ট্রেণ পাইপে হাওয়া ঢোকার ব্যবস্থা করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ড ব্রেক। তাতেও নয়। গাড়ী প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে একশো ফুট এগিয়ে গেল।

আরো রেগে গেল যাত্রীরা।

রিভার্সিং গিয়ার ঘুরিয়ে গাড়ী চালাল। পিছনে চোখ নেই। রাগ করে আর মারমুখী জনতার ভয়েও বটে, গাড়ী থেকে গার্ড নামল না।

একজন ফায়ারম্যান নেমে গিয়ে লাইটের সংকেতে সাহায্য করতে লাগল। পিছু হটল গাড়ী—পাঁচ মাইলের বেশী গতি বেগে নয়। প্লাটফরমে এসে দাঁড়াল।

তাতেও নাকি একজন চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

যাত্রীরা জোরদার নালিশ করলে ট্রাফিক সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে।

আর একবার।

মাইল বিশেক স্পীড তখন। একটা বাঁক পার হয়েই সামনে একটা লোক। চোখের আন্দাজে মনে হয় দূর মাত্র একশো গজের কাছাকাছি। কিছু কম হতে পারে। প্রাণপণে বাঁশীর আর্তনাদ তুলল নিখিলেশ। লোকটা শুনতে পেল বলে মনে হল না। আবার। আবার বাঁশী বাজাল নিখিলেশ। আবার। বাজিয়েই চলল। লোকটা বোধহয় কালা। তাই বা হয় কি করে? পায়ের তলে তখন তার কাঠের স্লিপারের চটি কাঁপছে। কাঁপছে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। স্লিপারে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে লোকটা। বাঁক ঘোরা শেষ না হলে ঐ স্পীডে জোরে ব্রেক কষা যায় না। বাঁক ঘোরা শেষ। সমস্ত ভ্যাকুঅম নষ্ট করে ব্রেক কষল নিখিলেশ। তখন আর পঞ্চাশ গজের বেশী নেই।

লোকটার আয়ু থাকলে পঞ্চাশ গজের আগে গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়লে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। লোকটাকে নখে দাঁতে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল নিখিলেশ। তার মরা শরীরটার ওপর ইঞ্জিন সুদ্ধু চারখানা বগির অতোগুলো চাকার খাঁড়ার ঘা দিয়ে। দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ী। গাড়ীর গোল গোল লোহার দাঁতে তখন টাটকা রক্ত, গরম মাংস নরম ছাল লেগে। আদম খোর গাড়ী চিবিয়ে চিবিয়ে নরমাংস খেল।

নিখিলেশের হাতে নরহত্যা এই প্রথম।

আর এই নরহত্যা নিখিলেশের নরম মনে দারুণ 'শ্যক' দিয়ে গেল।

এইবার কাজে কর্মে তার আরো ভুল হতে লাগল। একেই কাজ ভুলিয়ে দিয়েছিল কুন্তলা প্রিয়বালা উভয়েই। ভুল হচ্ছিল প্রতিপদেই।

সর্বদাই আনমনা থাকত সে। এই নরহত্যার পর মন মেজাজ আরো বিগড়ে গেল তার। 'নার্ভ' হারিয়ে ফেলল নিখিলেশ।

ওদিকে যাত্রী সাধারণের নালিশ ট্রাফিক সুপারের হাতে। বিভাগীয় তদন্ত তথা শাস্তির কথা ভাবছিলেন তিনি। ইতিমধ্যে নতুন অপকর্ম করে বসল ডস নিকোলাস। ছোট্ট একটা টার্মিনাসে সাইডিং লাইনে শান্টিং করতে গিয়ে বাফারের দুহাতের মানা উড়িয়ে দিল।

এই সব রিপোর্টের তদন্ত সাপেক্ষ, লোকাল থেকে গুডসে অবনতি হল ডস নিকোলাসের।

পরাজয়ের গ্লানির ভারে মাথা নিচু করে দিনযাপনের ঘানি টানছিল ডস নিকোলাস। লাইন বদলের ফল এই সব। তার কর্মক্ষেত্রে বদল হয়েছিল লাইন—পোনাহাট থেকে শুকদেবপুর। চিন্তাক্ষেত্রে লাইন বদল লহ উল্টোদিকে। অন্যদিক থেকে নতুন করে পোনাহাটে। শূন্যমন থেকে, কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিয়োজিত মন থেকে কুন্তলার দিকে। তার ফল এই সব কাজের ভুল।

তার ফল এই দ্রুত অবনতি।

এর মধ্যে কবে যেন সিগনাল অমান্যের নালিশও নাকি যোগ হয়েছে।

বোঝার উপর শাকের আঁটি।

গুডসে বদলি হবার পরাজয়ে স্থিতি হবার আগেই নতুন শাস্তি। বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

সসপেণ্ড হল ডস নিকোলাস।

হেনরির পক্ষপাতিত্বে এক চোখো একদেশদর্শী ব্যবহারে কেউই খুশী ছিল না। না হেনরির ওপর না নিখিলেশের ওপর। তার সহকর্মীরা তো হিংসায় বিদ্বেষে ফেটে পড়ত। কর্তৃপক্ষও নিখিলেশের এতো দ্রুত উন্নতি প্রীতির চোখে দেখেন ।ন। 'টু-মাচ' মনে হয়েছে।

হাততালি দিল সহকর্মীরা। যারা ফায়ারম্যান হয় নি এখনও ভালো করে টিটকিরি দিল তারা।

হেনরিকে বোতলের পর বোতল মদ ঘুষ দেবার মিথ্যে অপবাদ দিল তারা।

কনডেমড ড্রাইভার আব্দুল খালেককে মেয়েমানুষ ঘুষ দেবার কথা তুলল তারা।

তারা বলল শকুন পড়েছে নিখিলেশের কাঁধে—শকুনতলায় চাপা পড়েছে ধর্মান্তর হওয়া নিখিলেশ।

হাউইয়ের উত্থান। নির্বাপন। পতন।

আগুন মুখে ওঠা। মুখে-আগুন হয়ে ছাই মুখে নামা।

সসপেণ্ড হলে আজকাল গড়হিসাবে মাইনে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগেও এক পয়সাও পাওয়া যেত না। নিখিলেশও পেল না।

দুর্দিন ঘনিয়ে এল নিখিলেশের।

কুন্তলা সম্বন্ধে তার কি করা উচিত, ভেবে স্থির করার আগে বিচারকের আসন থেকে নেমে যেতে হল। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল ক্ষণপূর্বের বিচারককে।

কুন্তলার আত্মদান, তার অজানা জীবন ইতিহাস—এই দুই বিপরীত স্রোতের দুমুখো চাপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল নিখিলেশ। কুন্তলাকে জয় করা হয় নি এই পরাজয় বোধ তার ছিল। তার পর এল জয় গর্ব। সাথে সাথে এল কুন্তলার ফেলে আসা জীবনের জটিলতা। জটিলতাই নয় শুধু, বিনা দ্বিধায় গ্রহণ যোগ্য কিনা তা ভাববারও। কুন্তলার বিয়ে, বয়স দুইই হয়েছে। নিজের পায়ে দাঁড়ায় যে মেয়ে তাকে বাহবা দিই দূর থেকে, বিয়ে করে ঘরে তুলি না। তাকে বিয়ে করলে আমার নিজ পরিচয় প্রতিষ্ঠা সব ডুবে যাবে। আমাকে লোকে বলবে অমুকের বর।

অথচ কুন্তলা সুন্দরী। রং গোলাপের নয়, দুধে আলতাও নয়। মাজা রং কুন্তলার। কালো আর ফরসার মাঝামাঝি। কিন্তু মুখশ্রী, চোখের টান, নাক, ঠোঁট, কপাল—অপূর্ব। সবচেয়ে সুন্দর বোধহয় তার চুল। শরীরের গড়ন পিটন মদনদেবেরও কাম্যকামনার—

বয়েস ? ঐ যদি সতীনাথ হয়, তার স্ত্রী। সতীনাথ কতো বড়ো ?

অকালে পাকা। শরীরের ওপর অত্যাচার অনাচার অনেক করেছে। চল্লিশের অনেক এপাশে বয়স তার। বকাটেপনা করতে করতে পাকাটে চেহারা। তা হলে কুন্তলার বয়স কতো? এখানে এসেছে চার বছরের কিছু বেশী। এসেছিল যখন, চব্বিশ পঁচিশের বেশী ছিল না কখনও। কুন্তলার বয়স তা হলে ত্রিশের কাছাকাছি।

নিখিলেশের নিজের এই বত্রিশ চলছে।

বিচারকের আসনে বসে এই ছিল তার চিন্তা। ডিগ্রেড হবার পর বদলাচ্ছিল চিন্তা ধারা।

সসপেণ্ড হবার পর আসামী বনে গেল। যোগ্য বলেই গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিল কুন্তলা। যোগ্যতা উধাও হয়ে গেল একটি দিনে।

অযোগ্য, অকর্মন্য হয়ে গেল। বাতিল হয়ে গেল রাতারাতি।

বিচারকের আসনে এবার কুন্তলা। অযোগ্যকে সে গ্রহণ করে না, এ কথা নিখিলেশের চেয়ে ভালো আর কে জানে?

চোরের মতো, দয়াপ্রার্থীর মতো হাত পেতে দাঁড়াতে পারবে না সে।

যখন তার দিন ছিল একটা কাজ বোধ হয় করতে পেরেছিল সে। গার্ড আলোক মুখুজ্যে বোধ হয় প্রিয়বালাকে ওস্তাদজীর বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছে। তবে আলোক যে চরিত্রের লোক, প্রিয়কে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে কিনা সন্দেহ!

এমনি করে আড়াই মাস কেটে গেল। অনাহারে অর্ধাহারে ময়লা কাপড় জামায় জীবনের মালিন্য জমে উঠল। তিক্ততা বাড়ল। ভগবানকে অত্যাচারী বলে মনে হতে লাগল। যা কিছু সুকুমার তারই উপর বিরূপ হয়ে উঠল তার মন। এককালে যে উপকার করেছে, তার উপকার-টুকুকেও বাঁকা চোখে দেখতে লাগল। তাতে উদ্দেশ্য আরোপ করে বিদ্রোহী মন তৃপ্তি পেতে লাগল।

সসপেণ্ড হবার পর থেকেই ও' ব্রায়েনও কি অপরাধ করে বসে আছে তার চোখে। আর হেনরি? হেনরি তো মহা অপরাধী। বিশ্লেষণ

করে খুঁজে পায় না তাদের অপরাধ। তবু কেন জানি না, ক্ষমা করতে পারে না তাদের। উপকার করাটাই একমাত্র অপরাধ।

ঠাকুরগাছির ঈয়ার্ডে খালি 'রেকে' রাত্রিযাপন করে। ঈয়ার্ডের হাইড্র্যাণ্টে খুশী হয় মাথাটা ধুয়ে নেয়, খুশী হয় তাও ধোয় না। পরনে বয়লার স্যুটটা একদা নীল রঙের ছিল। এখন ছাই বা ধূসর নয় কয়লা রঙ। জানলা দরজা তাতে অসংখ্য।

চুলের সঙ্গে কাঁচির সাক্ষাৎ নেই মাস তিনেক। শিবের জটা নেমেছে নাক মুখ চোখ ছেয়ে। দাড়ির সঙ্গে ক্ষুরের অসহযোগ। চুলে দাড়িতে পাঞ্জাবী বলে ভ্রম হয়। সুস্থ দেহ সুস্থ মস্তিষ্ক পাঞ্জাবী নয়। বিকৃত মস্তিষ্ক পাগল।

পাগলদের যেমন দেয়—পোড়া রুটির টুকরো, গুমসনো তরকারী মাংস, উদ্বৃত্ত উচ্ছিষ্ট খাবার, নিকোলাসকেও তাই দেয় লোকে।

ক্ষিধেটা সর্বগ্রাসী থাকলে কিছুটা খায়, তারপর মুখে নিয়ে থু থু করে ছিটোতে থাকে। ছিটোয় আকাশ মুখো। আকাশে বোধ হয় ঈশ্বর থাকেন। দেবতারা থাকেন তাদের মুখে নিজের মুখের উচ্ছিষ্ট দেয়াই উদ্দেশ্য। তাকে খেতে হচ্ছে, দেবতারাও চেখে দেখুক একটু। এই স্বাদু খাবার। এই সুস্বাদু উচ্ছিষ্ট।

মনের যাদের এই ভাব, তারা সাধারণত থাকে রাজপথে। নিকোলাস ছেড়ে যেতে পারে না ঠাকুরগাছি ঈয়ার্ড। স্পীড, ট্রেন, যন্ত্রদানব, কয়লা জল-ভূতের মতো সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে, চিন্তার তন্তুতে তন্তুতে।

তার শাহজেহান। বড়ো আশা ছিল নিয়ে বেরবে একদিন। শান্টিং নয়, লাইনে। হোলো না।

শাহজেহানের চুল পেকেছে, ছাঁটা হয় নি। দাড়ি গোঁফেরও সেই হাল। ছুঁচলো ফ্রেঞ্চ কাটের আকৃতিই নেই দাড়ির।

অযত্নের খড়ি উঠছে সর্বাঙ্গে। ঔরংজীবদের হাতে আগ্রা দুর্গে

বন্দী। ঐ সাইডিংয়ে দাঁড়িয়ে দিন গুণছে মৃত্যুর। মালও নয় মেল এক্সপ্রেস প্যাসেঞ্জার তো নয়ই। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

জঠরে এক মুঠো কয়লা কেউ দেয় কোনদিন, কেউ দেয় না। ঔরংজীব জল সাপ্লাই বন্ধ করেছে আগ্রা ফোর্টের। নর্দমার জল খেতে হচ্ছে শাহজেহানকে। এক কোষ অপরিস্রুত জল কেউ দেয় কোনদিন, কোনদিন তাও নয়। সমস্ত গৌরব গত।

তারি মতন—ভাবে নিখিলেশ। সম্মানের চূড়ো থেকে অপমান অনাহারের খানায়।

কুন্তলা ডেকে পাঠিয়েছে। এই খবর দিতে যে এসেছিল, থুতু ছিটিয়েছে তাকে। ভাগ্যি গায়ে লাগে নি তার। বলে দিয়েছে তাকে—এই নিয়ে যাও উপহার। তাকে দিও।—বলে কুৎসিত বিশেষণে ভূষিত করেছে কুন্তলাকে।

ইচ্ছে হয়, নেড়ে চেড়ে দেখে শাহজেহানের কলকব্জা, হাত বুলোয় গায়ে। ওদিকে ঘেঁষতেই দেয় না কেউ তাকে। সে যে পাগল। ইঞ্জিনের নাড়ী নক্ষত্র জানা পাগল। অনেক ক্ষতি করতে পারে সে ইচ্ছে করলে।

রাত্রির অন্ধকারে, প্রায় নির্জন হয়ে এলে ঈয়ার্ড, ওদিকপানে যায় সে। চোরের মত। চুপি চুপি। ঈয়ার্ড আলো করা ফ্লাড লাইটেরা তবু চেয়ে দেখে। নিজের ছায়াকে নিজেরই সন্দেহ হতে থাকে নিকোলাসের—'ফলো' করছে নাকি কেউ? যদি মার লাগায়। সব চেয়ে বড়ো শাস্তি—তাড়িয়ে দেয় যদি ঈয়ার্ড থেকে!

শিফট ফোরম্যানের অপিসে ছাড়া লোক থাকে না সারারাত। আর লোক থাকে তেলগুদোমে।—তাও খুব কম।

গভীর রাত্রে খাতির জমায় গিয়ে তাদের সঙ্গে। চা তৈরী করে দেয় তাদের। তারাও বলে—নে ওটুকু তোর। উচ্ছিষ্ট খেয়ে নেয় পাগলা। হাত পা সেঁকার ব্যবস্থা করে দেয়। পোড়া কয়লা জড়ো করে জ্বালিয়ে দেয় ছোট ছোট স্তূপে। তারপর এক সময়, এদের চোখে ঢুলুনি আসে। শেডের ইঞ্জিনের মধ্যে সাইডিংয়ের ইঞ্জিনের ক্যাবে ঘুরে

বেড়ায়। হাত বুলোয়। ইচ্ছে করে স্টিম তুলতে, আগুন ঠিক মতো তৈরী করে রেগুলেটার হ্যাণ্ডলে হাত বুলোয় নিকোলাস। আলাদিনের হাতের প্রদীপ। এই অদ্ভুত ধরণের বাঁকানো লোহার হাতলটায় সত্তর আশী নব্বুই মাইল স্পীড লুকোন আছে। এ দেশে আশী নব্বুই মাইল স্বপ্নই রয়ে গেল। সত্তরও তাই। ষাট এ দেশে স্পীডের রাজা। স্কটল্যাণ্ডে কোথায় একটা বিশাল লেক—তার পাড় বেড় দিয়ে অর্ধবৃত্তে বেরিয়ে যায় ট্রেন। নন স্টপ। দেড় ঘণ্টা। নাইনটি এম-পি-এইচ্—

মাঝরাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত তিনটে প্রেতাত্মার মুখোমুখি হয়। পয়লা নম্বর ঈয়ার্ডের প্রেতাত্মা। ঈয়ার্ড মরে রয়েছে। এখানে হাইড্র্যাণ্টের জল ঝর ঝর করে ঝরছে, ওখানে স্টিমে স্টিমে গুজগাজ ফুসফাস। সেখানে কট কট কটাং—ঠাণ্ডা পেয়ে কোন ধাতুর পাত, লোহার স্ট্রাকচার সংকুচিত হচ্ছে। দু নম্বর হল স্পীডের প্রেতাত্মা। ইঞ্জিনের গর্ভকোষে স্পীডের ভ্রূণ। বাইরের অবয়বটা তারই প্রেত। তিন নম্বর হল নিখিলেশের।

স্থাণু ছায়া অনেক। চলমান ছায়া একটাই। নিকোলাসের।

দিনের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমোয় নিকোলাস। রাত জাগতে হবে বলে। আর দিনের বেলা জেগে থাকলে জন মনিষ্যির মুখ দেখতে হয়। তা সে চায় না। সবাই মায়াদয়াহীন। ক্ষমাহীন। পিশাচ।

অঘ্রাণ মাস।

মেঘলা করে আছে সারাদিন। সন্ধ্যের দিকে মনে হচ্ছে নামবে। উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। মেঘলা আকাশ মুখ গোমড়া করে হাওয়ার চাবুক চালাচ্ছে। চাবুক মেরে চোর ছ্যাঁচোড় ছাড়া ভদ্রলোক সজ্জনদের সন্ধ্যের আগেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যে হতেই পথ নির্জন। না গাড়ী ঘোড়া না লোকজন। ট্রাফিক পুলিশ খবরদারী করবে কার? তারাও উধাও।

বিকেল থেকে বলাবলি করছে সবাই—নিকোলাসের বিচারের রায় বেরোবে কাল। রায়টার আভাসও পাওয়া গেছে। কর্মচ্যুতি। ডিসমিসাল।

মানুষের মনের অন্ত পাবে কে? নিকোলাসকে এই প্রথম চিন্তা ভাবনা মুক্ত সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো দেখা গেল। যেদিন তার সবচেয়ে বেশী চিন্তিত হবার কথা—

বিকেলের দিকে শহরের পথে দেখা গেল তাকে।

সন্ধ্যের মুখে ফিরে এল যখন, চেনা যায় না তাকে আর।

চমৎকার করে চুল ছাঁটা, পরিষ্কার দাড়ি কামানো। সুন্দর প্রায় নতুন বয়লার সুট। জুতো মোজা। মাথায় কার্নিশওলা কাউন্টি ক্যাপ। সুদর্শন নিখিলেশের ছাইয়ের চাপা সরে গিয়ে আগুন বেরিয়ে পড়েছে রঙের—

দু একজন বেশ খানিকক্ষণ নিরীক্ষণের পর চিনতে পারল।

—কি রে পাগলা, এতো সাজগোজ যে, ব্যাপার কি?

সহজ স্বাভাবিক মানুষ। বিকৃতির চিহ্নমাত্র নেই।

—কাল থেকে তো ঈয়ার্ডে ঢুকতে পারব না আর। শেষ দেখা দিয়ে যাই, ভাই ব্রাদারদের। শেষ দেখা দেখে নিই এই এনাদের—

দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে চলে যায় তারা। কি আশ্চর্য ইঞ্জিন প্রীতি এই লোকটার। কেন যে অন্যমনস্ক হয়ে ইঞ্জিন চালাল! প্রত্যেক ঘটনায়ই নাকি চালাচ্ছিল ও নিজেই। ফায়ারম্যানদের হাতে ছেড়ে দেয় নি। তবু কেন এমন হল। ফার্স্ট ক্লাস প্র্যাকটিকাল ইঞ্জিনিয়ার লোকটা। হেনরিতে ওপরওলাতে—বাজায় রাজায় যুদ্ধ হল। চাকরী গেল এই বেচারার।

অন্যদিনের চেয়ে অনেক আগে ঈয়ার্ড ফাঁকা হয়ে গেল আজ।

আজ আর একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা পাওয়া যাবে ইঞ্জিনদের সঙ্গে। আজই তো শেষ রাত। ঈয়ার্ডের সব ইঞ্জিন ঘুরবে সে আজ। তারপর? কাল?

কালকের খবর তার জানা নেই। কোথায় সূর্যোদয় হবে কে জানে।

শুধু ইয়ার্ড থেকে বিদায় নেবার আগে ভদ্রভাবে দেখা করে যেতে চায়। ভদ্রলোকের মতন। ভিখারীর মতো বা পাগলের মতো নয়।

একটা ঘটনা বিকেল থেকে কাঁটার মতো খচ খচ করে বিঁধছে। আবার মনে হচ্ছে, ন্যায় কি অন্যায় কি? ন্যায় অন্যায় বলে কোন কিছু আছে কি এই পৃথিবীতে? যা করেছে বেশ করেছে সে! ও' ব্রায়েনের মদের দোকান থেকে হুইস্কি নিয়ে এসেছে এক বোতল। ও'ব্রায়েনের য়্যাকাউণ্টে। ও'ব্রায়েন টেরও পাবে না—হিসেব মিলিয়ে দেখবে না সে। বিল যা হবে দিয়ে দেবে টাকা। তাই সে দেয়।

দোকানের সামনের ফুটপাথে হাঁটছিল নিকোলাস। মিঃ শাহ ডাকলেন—কি খবর ব্রাদার? দেখা নেই যে অনেকদিন! কেমন আছো?

মিঃ শাহ জানতেন, নিখিলেশ এ সব ছোঁয় না। তাই খাতির করতেন নিখিলেশকে। নিখিলেশ বলল—আপনারাই তো পাঠিয়ে দেন আজকাল। আসার দরকারই হয় না। তা ছাড়াও জরুরী দরকারে মজিদ আসে।

মিঃ শাহ বললেন—চাই নাকি কিছু আজ?

নিখিলেশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—হোয়াইট হর্স দিন একটা—

কেন আনল তাই সে জানে না। কি রকম একটা খেয়াল। দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটছিল, ভালো পোষাক পরেই। তার উদ্দেশ্য বোধ হয় ছিল একবার দেখে আসা। পরিচিতদের কাছ থেকে নিজের মনেই বিদায় নেওয়া। তার ভবিষ্যৎ জানে না সে। একটা ক্ষীণ ধারণা ছিল। এ পরিবেশে থাকবে না, এটা নিশ্চিত। ডাঙ্গার দুটো স্পীড দেখা হোল। এবার স্পীড দেখতে হবে মাছের। মাছেরা তাড়াতাড়ি যেতে পারে না। দেখতে হবে পাখীর স্পীড। যদি সম্ভব হয়। বছর কতক হল ছোট ছোট 'মথ' পাখা মেলে উড়ে এসেছে। নেমেছে দমদমে। ইঞ্জিনটা দেখা যায় না তার? সেটাও তো আরশুলা, মোটরের মতো তেলাপোকাই। কেমন আর হবে ইঞ্জিনটা? কিন্তু নিখিলেশের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের কাছে ঘেঁষাও দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভব—

বোতলটা এনে যখন ফেলেছে সদগতির একটা পথও ভেবে নিল মনে মনে। শিফট ফোরম্যানের অফিস স্টাফকে কোকের আগুনে শরীর গরম করতে হবে না আজ। এই তরল আগুন রইল, এইটে উপহার দেবে। মাঝে মাঝে কতো কিছু খাইয়েছে তারা। তার শোধ দেয়াও হবে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সুস্থ মানুষ নিকোলাস কোল সাইডিংয়ের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। ঠাকুরগাছিতে তখন সেই আমলেই অনেক আধুনিক নিয়ম তন্ত্র ছিল। কয়লা নেয়া, জল নেয়া, ছাই ফেলা, এই সব ক্রিয়াগুলি একই লাইনে এই পারম্পর্যে সাজান ছিল। অর্থাৎ এই লাইনটিতে ঢুকতে পারলে ব্যস আর ভাবনা নেই। কয়লা খেয়ে, জল খেয়ে ছাইটাই ফেলে সিধে টার্নটেবল। মুখের দিক পরিবর্তন পর্যন্ত সহজ, অনায়াসসাধ্য ছিল। টার্নটেবল ছিল ত্রিশ ফুটের। ছোট্ট, নাড়াচাড়ার পক্ষে খুব সুবিধাজনক। এখন অবশ্যই সত্তর ফুটের হয়েছে, বিদ্যুতে চলে। কোলিং প্ল্যাণ্ট, জল নেবার ক্রেন দুটোই ছিল প্রায় স্বয়ংক্রিয়।

কোল সাইডিংয়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানে এল তার, কে যেন বলছে—বাতিল তুমি। 'নো মীল' হয়ে গেছে। কয়লা পাবে না আর। উই ওধারে ভাগাড়ে গিয়ে দাঁড়াও। ফায়ার ফেলে দাও। পেনশান হয়ে গেল তোমার। সিধে গিয়ে একদম লাস্ট সাইডিং। গুড বাঈ।—

—অনেক দিন চলেছ। ক'বছর হোলো ওল্ড ম্যান, বয়েস কতো হোলো?

কোলিং প্ল্যাণ্ট কয়লা বোঝাই করে টেণ্ডারে। তার য়্যাসিস্ট্যাণ্ট। হাসছে মৃদু মৃদু মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করে দাঁড়িয়ে—অন্নসত্রের মালিক হয়ে এ কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কি করি? হুকুম ইজ হুকুম।

বাইসাইকেল মডেল? না তো! প্ল্যানেট। দেখতে ভুল করেছিল নিখিলেশ। ফোর-টু-টু নয়, টু-টু-জিরো টাইপ।

মান্ধাতার আমলের 'প্ল্যানেট' সামনে দাঁড়িয়ে। এই টাইপের ইঞ্জিন বাতিল হয়ে গেছে অনেকদিন। চলা উচিত হয় নি গত দশ পনেরো বছরই।

কোলিং প্ল্যান্টের ছোকরার জীবন দর্শন শোনার ইচ্ছা ছিল না শান্টিং ড্রাইভারের। বা অভিনয় দেখার অভিরুচি। ইঞ্জিন নিয়ে গুটি গুটি রওনা দিল সে।

খানিকক্ষণ কে যেন স্তব্ধ করে দিল নিখিলেশকে। তার হাত পা চিন্তা ভাবনা স্তব্ধ হয়ে আসতে চাইল। কানের মধ্যে বাজতে লাগল শুধু—নো মীল-বাতিল-ভাগাড়-অন্নসত্র-হুকুম।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল—ক'টা বাজল স্যর ? বাকি কতো ছুটীর ?

ব্যঙ্গ ! তাকে আজ স্যর বলা ব্যঙ্গ ! সে পাগলা, স্যর নয়। তার কাছে সময় জানতে চাওয়া মানে তার দারিদ্র্যকে নিষ্ঠুরতর ব্যঙ্গ। তার হাতে ঘড়ি নেই আজ, তাকেও ব্যঙ্গ—

আগেকার কথামালায় আর দুটি শব্দ যোজনা হোলো। ব্যঙ্গ। ছুটী।

আস্তে আস্তে ওদিককার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল নিখিলেশ।

হাওয়া হয়েছে জোর। ঝির ঝির বৃষ্টি সেই সঙ্গে। বৃষ্টি নয় বরফের চাবুক। কেটে কেটে বসে যাচ্ছে, বিঁধে যাচ্ছে বুকে পিঠে। ছোরা মারছে কেউ বরফের। হিম হয়ে আসছে সর্বাঙ্গ। শরীরে যে তাপ থাকলে চলাচলের উপযুক্ত তারল্য থাকে রক্তের, সেই আটানব্বুই পয়েন্ট চার নেমে নেমে আসছে। ধরে রাখতে পারছে না তাকে গায়েব জামা, সংরক্ষণ করতে পারছে না। সেই তাপ ছুটে গিয়ে বাইরের চল্লিশ বিয়াল্লিশের সঙ্গে সমভূম হয়ে যেতে চাইছে।

শরীরের তাপ ধরে রাখতে হবেই। কাপড়ের জামার আবরণে না কুলোয়, ইটের দেয়ালের জামা চাই। বেড়ার জামা চাই। মাথার ওপর যা হোক কিছু চাই।

ছাত হোক ছাতা হোক। বৃষ্টির ; শীতকালের এই বরফের ছুরী চালানো অকাল বৃষ্টির আক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে। চারপাশে ইট হোক টিন হোক লোহা হোক ; মাথার ওপরও তাই। যা হোক কিছু চাই। জামা কাপড় ভিজে শপশপে। শুকোতে হবে এগুলোকে। ক্যাপটা মাথাটাকে অনেকক্ষণ বাঁচিয়েছে অনেক পরিমাণে। আর পারছে না।

এ-আড়াল থেকে ও-আড়াল, এ-ছাউনি থেকে ও-ছাউনি করতে করতে ভিজে গোবর হয়ে গেল নিখিলেশ।

পাকা বাড়ী বলতে শিফট ফোরম্যানের অফিস। অনেক দূরে। বৃষ্টির ছাটে ফ্লাডলাইটের আলো পড়ে অদ্ভুত রহস্যময় মনে হতে লাগল ঈয়ার্ডটাকে। নরক দেখতে কেমন? কেমন দেখতে মৃত্যুপুরী? কয়লার পাহাড়, কোলিং প্ল্যাণ্ট, মাঝে মাঝে গুমটি। এধার থেকে ওধার চলে গেছে রেলের লাইন। সমান্তরাল। জন্ম থেকে মৃত্যু পার হয়ে গেলেও মিলবে না এর সাথে ও। মাঝে মাঝে লেভেল ক্রসিং, দেখা দুজনের—খিটিমিটি বাধার জন্যে। এমনি রেল লাইন আর ক্রসিংয়ের গোলক ধাঁধা। ওপাশে পাশাপাশি শেড—সুস্থ সবল ইঞ্জিনের বাঁচার ব্যবস্থা। উই হোথা ভাগাড়। ভাঙা-চোরা নড়বড়ে শেড। মুমূর্ষুদের পিঁজরাপোল।

একটা শেডেব আড়ালে ভিজতে ভিজতে আর বাঁচার আশায় জায়গা বদলাতে বদলাতে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল নিখিলেশ। হাড়ে হাড়ে কাঁপন ধরেছে এবার। চামড়ার ওয়াড়টার মধ্যে হাড়ের পাশা খেলছে কুরুপাণ্ডব। প্রাণ—দ্রৌপদীকে নিয়ে টানাটানি।

রাত বাড়ছে। কটা বেজেছে বলা কঠিন। সেই কোলিং প্ল্যাণ্টের ঘটনা থেকে ঘণ্টা দুই আড়াই হয়েছে সন্দেহ নেই।

ঈয়ার্ড নিষ্প্রাণ। শুধু স্তিমিত আগুনে হাত পা সেঁকে নিচ্ছে বয়লারের ঠাণ্ডা জল। প্রাণ যা কিছু সেখানে।

প্রাণী বলতে শিফট অফিসে তিনটি কি চারটি।

একটু আগুন দরকার। হাত পা সেঁকতে হবে। আশ্রয় চাই মাথার ওপর।

কাছে পিঠে এই জ্যান্ত ইঞ্জিনের শেড। এখানে ঢোকায় বিপদ আছে তার পক্ষে। ধরা পড়লে চুরির দায়ে জেল।

একটু দৌড়ে গিয়ে মরা ইঞ্জিনের ভাগাড়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যা ভেজা হয়েছে, এর চেয়ে বেশী আর ভিজবে না।

ছুট লাগাল নিখিলেশ।

পায়ের জুতোর মধ্যে জল ঢুকে গাম বুটের মতো আওয়াজ হচ্ছে—খপ-খপ।

বাতিল প্ল্যানেটে গিয়ে উঠল নিখিলেশ। গায়ের জামা ভিজে এতো ভারী, বওয়া যাচ্ছে না আর ওজন।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল নিখিলেশ। শেডের আশ্রয়। হাওয়া নেই এখানে। ফায়ার ডোর খুলে দেখল আগুন আছে প্রচুর। বৃষ্টির তাড়ায় পালিয়েছে ড্রাইভার। তাড়াতাড়িতে আগুন ফেলে যায় নি। যন্ত্রপাতিও নিয়ে যায় নি। বেলচা আছে, আগুন খোঁচানো শিক আছে। স্প্যানার আছে। সব-সব ঠিক আছে। নিয়ে যায় নি কিছুই।

ফায়ার ডোর খুলে দাঁড়াল নিখিলেশ। আঃ! আগুন। আগুন মানে জীবন। এখানে আগুন মানে জীবন। মরুভূমিতে জীবন মানে যেমন জল।

দু-এক জায়গায় কালচে হয়ে এসেছে আগুন। আধ বেলচা পরিমাণ কয়লা ছিটিয়ে দিল এমনি কালো হয়ে আসা পাঁচ ছ জায়গায়।

জামা কাপড় জুতো খুলে ফায়ার ডোরের সামনে দাঁড়াল নিখিলেশ। রেগুলেটার হ্যাণ্ডলে, বাঁশীর তারে টাঙিয়ে দিল জামা কাপড়। শুকুতে দিল।

হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি কমে গেলে আরাম লাগল শরীর।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টার শুকনো নাড়ী মোচড় মেরে উঠল খিধেয়। কাল রাতে খাওয়া হয়েছিল শিফট অফিসে। খান দুই মোটা চাপাটি আর পেঁয়াজের তরকারী। তারপর! আজ সকালে? সকালে—বোধ হয় এক মগ ঠাণ্ডা চা। মনে করবার চেষ্টা করল—সেটা কাল সকাল, না আজ সকাল। আজ সকালই তো। তারপর!—না সারাদিনে জোটে নি কিছু আর।

আর সেই পরিমাণ তেষ্টা। বাইরের জলে শরীরের বাইরেটা ভিজে গোবর ভেজা হয়েছে এতোক্ষণ। আশ্চর্য! ভিতরের তেষ্টা যে কে সেই।

শেডের ছাদের ছ্যাঁদা দিয়ে কোথায় যেন জল পড়ছে তোড়ে। পড়ছে জলাধারে কোন জলের ওপর। খানাখন্দে বোঝাই হয়ে আছে জল। তারি ওপর পড়ছে কোথাও।

কোথায় পড়ছে? বের করা যায় না খুঁজে? অন্ধকার এদিকটা।

আলোর ছিটে ফোঁটাও এসে পেঁীছচ্ছে না। আলো পাওয়া যায় কোত্থেকে একটা? একটা 'লম্ফ', একটুকরো মোমবাতি? আর একটা জল খাবার কিছু? গেলাশ, মগ, খোরাই? কিছু একটা?

ফায়ার ডোর হাঁ-পাট খোলা। আর খোলা যায় না। ইঞ্জিনের পিছনপানে টেণ্ডারের মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি পাঠাল নিখিলেশ। লাল আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল টেণ্ডারের মাথা। টেণ্ডার মানে জীবন সঙ্গিনী। ইঞ্জিনের সঙ্গে চিরকালের গাঁটছড়া বাঁধা টেণ্ডার। কিন্তু আজ তো মরণসঙ্গিনী তুমি। ফাঁসীর আসামীর সঙ্গে এখনও গাঁটছড়া বাঁধা। খুব প্রেম তো। এতো দুঃখে, ক্ষিধেয় পিপাসায় কাতর নিখিলেশ—তবু হাসি পেল তার।

আরে, এ যে টেণ্ডারের জলাশয়েই পড়ছে। টেণ্ডারের মাথায় উঠলেই জল পাওয়া যাবে নাগালে। কিন্তু একটা গেলাশ টেলাশ?

তেলের ক্যান, এটা তেলের মগ। মগটায় তেল আছে। এই তো জুট। তেলটা ফেলে জুট দিয়ে পুঁছে নিলে হয় না। নাঃ—দারুণ দুর্গন্ধ। জল খাওয়া চলবে না।

ব্যাঙ ডাকছে কোথায়! পুরুষ ব্যাঙের মেয়ে ব্যাঙকে আহ্বান। গাঙোর গ্যাঙ। ভৈতিক প্রণয় সম্ভাষণ। বিশেষণটা এই মুহূর্তে আবিষ্কার করল নিখিলেশ। করে হাসল।

তা তো হোলো। একটা বোতল টোতল!

ইয়েস—বোতল তো আছে। ভরা ভরতি। কিন্তু সে যে মদের। ড্যাম ইট—মদের! কি হয়েছে? জীবনের মদ তো কবেই ফুরিয়েছে—বোতলের মদে জীবন ভরলে ক্ষতি কি?

ছিপি খুলে ফেলতে হবে বোতলের। রেগুলেটার হ্যাণ্ডলে ঠুকতে

গিয়ে একি! চলবে চলবে মনে হচ্ছে ইঞ্জিন। হ্যাণ্ডলে স্বল্প চাপ দিতে চমকে উঠলো নিখিলেশ। ভালভের গায়ে যে রকম সোঁ সোঁ করছে; চলবে ইঞ্জিন চলবে।

তাই তো। কয়লা দিয়েছে ইঞ্জিনের ভর পেট সে নিজেই। জল দিয়েছে বৃষ্টি—শেডের ছাদের ছ্যাঁদা দিয়ে। অবশ্য জল যা ছিল তাতে দশ বিশ মাইল এমনি যেত।

প্ল্যানেট। গ্রহ। আকাশে আকাশে ঘূর্ণ্যমান শনি। তোমার পিঠে সওয়ার আমি নিখিলেশ দাস। ডস নিকোলাস। নেকলেস।

ওঃ, নেকলেস নামটা মনে আসে কেন? মনে আসে কেন কুন্তলার নাম? কুন্তলার নেকলেস—কণ্ঠহার। সোনালালের আবিষ্কার। সোনালাল। পোনাহাট। সুন্দর ধ্বনিগত মিল। পোনাহাটে বৃষ্টি হচ্ছে এখন? বৃষ্টি হচ্ছে পান্থপাদপে? বৃষ্টি হচ্ছে ধানক্ষেতে? সেই ধানক্ষেতটায়, যেখানে গোবাঘা বেরিয়েছিল বুকের বন থেকে?

ব্যাঙ ডাকছে। পুরুষ ব্যাঙ মেয়ে ব্যাঙকে ডাকছে। আচ্ছা মেয়ে ব্যাঙরা বুঝি পুরুষদের ডাকে না! স্বভাব লাজুক ওরা। না!

না তো। মেয়ে ব্যাঙরা ধানক্ষেতে রাত্রি নির্জন হলে পুরুষদের ডাকে না বুঝি!

বড়ো তেষ্টা। ঢক ঢক করে গলায় অনেকটা ঢেলে দেবার ইচ্ছে থাকলেও দেখা গেল, একটুর বেশী ঢালা সম্ভব হল না।

তাইতেই য়্যাসিডের মতো গলা জ্বলে কণ্ঠনালী জ্বলতে জ্বলতে নামল।

ভাই প্ল্যানেট, তুমি বাতিল আমিও বাতিল। তাই তুমি আমি টু ব্রাদারস। এই যে দেখছি ওয়াটার গেজ, ভ্যাকুঅম গেজ প্রেশার গেজ সব ঠিক ঠিক কাজ করছে। ওয়াটার লেভেল চমৎকার।

তবে কি হে আমার প্ল্যানেট, দুষ্টু গ্রহ! এটা ভগবানের—ভগবান নেই, শয়তানের ইঙ্গিত যে আমরা দুই বাতিল, নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমাই?

রিভার্সিং হুইল ঘুরিয়ে দিল নিখিলেশ। রেগুলেটার হ্যাণ্ডলে হাত দিতেই পিছু হঠল ইঞ্জিন। তখখুনি থামিয়ে দিল। শেডের তলা ছাড়ায় নি তখনো। উল্টোপাকে ঘুরিয়ে নিল রিভার্সিং হুইল। সামনে চালাবার চেষ্টা করতেই সামনে চলল। বেঁচে আছ তুমি তা হলে! ভাওয়াল সন্ন্যাসী তুমি! মরা বলে ফেলে দিয়ে গেছে!

এই তুমি বাতিল! হাত পা আছে, চোখ মুখ নাক কান সবই আছে। ক্ষুধা আছে—খেতে দিলাম, খেলে। তেষ্টা বোধ আছে, ইনজেকটার কাজ করছে চমৎকার। এই রকমেই এমনি করেই ছুনিয়া বাতিল বলে বাদ দিয়ে দেয়। ক্ষুধার খাদ্য দেয় না, জল দেয় না তৃষ্ণার। জ্যান্তদের ভুখা রেখে মেরে ফেলে। নিজেরা আরামে থাকবে বলে অন্যদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে।

তুমি বাতিল আমি বাতিল।

চলো ছুই বাতিল আজ ভেসে পড়ি শূন্যে। তুমি প্ল্যানেট তুমি গ্রহ। ছুষ্টু গ্রহ। আমি নিখিলের ঈশ্বর। তোমার কক্ষ্যপথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে তোমাকে। ভাগাড়ের পথে নরকের পথে ঠেলে দিয়েছে। ভগবানের ইঙ্গিত, ভগবানের নয়—শয়তানের ইঙ্গিত। একসাথে নিরুদ্দেশের যাত্রী হবো আমরা—

প্রেশার গেজ দেড়শো হয় নি এখনো। হবে হবে করছে। আগুনে চাট্টি কয়লা দিল নিখিলেশ।

আজ সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ ঝড় জল না এলে ফায়ার ফেলে দিয়ে যেত। তার আগে জলে ভরতি করে রেখে যেত বয়লার। যন্ত্রপাতি নিয়ে যেত টুল বক্স সমেত। আগুন খোঁচানি বেলচা তেলের মগ তেলের ক্যান জুট কিছুই থাকত না। ছু'একদিন পর গেজ আর ঘড়িগুলো খুলে নিয়ে যেত। একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তামার টিউব খুলে নিত। তারপর—টানতে টানতে নিয়ে যেত, লোহার মাংস সের দরে বিক্রী হয় যেখানে।

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে। জামা কাপড়গুলো পরে নিলেই হয়, শুকিয়ে গেছে—

ব্যাঙটা ডেকেই চলেছে গ্যাঙোর গ্যাঙ।

বাইরে জোর কমেছে বৃষ্টির। হাওয়াও কমেছে। শীত বেড়েছে শুধু।

প্রেশার গেজ দেড়শো ছুঁই ছুঁই করছে।

ঈয়ার্ডটাকে চেনা যাচ্ছে এতোক্ষণে। তেমনি জনমানবহীন, তেমনি নির্জন নিষ্প্রাণ।

ঈয়ার্ডের প্রান্ত ছুঁয়ে লাস্ট আপ চলে গেল। সাড়ে দশটা তা হলে। এখন ভোর সাড়ে চারটে পর্যন্ত অকর্মা পড়ে থাকবে আপ লাইন। ব্যস্ততা, চাঞ্চল্য যা কিছু সাড়ে চারটের পর আবার।

না, বাতিল যে হয় নি জোর করে বাতিল করা যাবে না তাকে। হতে দেবে না নিখিলেশ।

প্রমাণ করবে সে মানুষের বিচারই শেষ কথা নয়। মানুষের বিচার একচোখো একদেশদর্শী। তারও ওপব বিচারকর্তা আছেন। কে? ভগবান!—না না, শয়তান।

পিছু নিয়ে এলো গাড়ী। খানিক এসে থামিয়ে দিল। শিফট অফিসের পিছনে, বেশ খানিক দূরে। শিফট অফিসের লোকজনদের খবর নেওয়া দরকার। কি করছে তারা? এতোক্ষণ নিশ্চয় জেগে নেই কেউ।

ছিপ ছিপ জল পড়ছে তখনো। কম আর মাঝে মাঝে। একটানা নয়। জলজমা খানা খন্দ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে চললো নিখিলেশ। জলে ডুবে গিয়েছে ঈয়ার্ডের উঠোনের ঘেঁষ। পায়ের চাপে শব্দ উঠছে না বেশী—

কা কস্য—জেগে নেই কেউ। একজন কে যেন শুয়েই পড়েছে কম্বল মুড়ি। লম্বা টানটান। একজন দেয়াল ঠেস—ঘাড়টা কাত হয়ে পড়েছে একদিকে। আর একজন টুলে বসে, যন্ত্রপাতি-ভরা কেরোসীন কাঠের টেবিলে মাথা রেখে উবুড়। আর একজন? নেই তো! আসেই নি হয়তো ঝড় বাদলায়।

ফিরে এলো ইঞ্জিনে নিখিলেশ। ফিরে এলো প্ল্যানেটে। তার কুগ্রহে।

হ্যাণ্ড ব্রেক মুক্ত করে ধীরে ধীরে ব্যাক করে নিয়ে গেল। ধীরে ধীরে চাকায় ন্যূনতম আওয়াজ তুলে।

জল কয়লার ভাঁড়ার টেণ্ডার। জল দিয়েছে আকাশ। কয়লা কিছু কম। একবার মনে হোল ঐ লাইনে নিয়ে গিয়ে কয়লা নিয়ে নেয় কিছু। শিফট অফিসের একেবারে সামনে ওটা। সাহস হোলো না তার। দেখে ফেলে যদি কেউ—

থাক কয়লা যা আছে ঐ থাক। খুব কম নেই।

তারপর লেভেল ক্রসিংয়ে নেমে নেমে লাইনের পর লাইন কাটিয়ে কাটিয়ে আপ লাইন। এই ইয়ার্ডের পয়েন্ট তার নখদর্পণে।

এ সব তার মুখস্থ। কাজও হাল্কা। একজনের পক্ষেই সম্ভব। এখানকার কয়লা দেবার কোলিং প্ল্যাণ্ট পর্যন্ত এমন সুবিধের—একাই নেওয়া যেতো কয়লা।—থাক আরো রসদে কি হবে?

ইঞ্জিনের মুখও আপ লাইনের দিকে। টার্নটেবিলে গিয়ে মুখ ঘোরাবারও দরকার হোলো না। যদিও ত্রিশ ফুটি টার্নটেবিল একাই ঘোরানো যায়। কতো বন্ধু বান্ধবের হয়ে সেই ঘুরিয়ে দিয়েছে কতোবার। ইচ্ছেও নেই। শহরের দিকে আর নয়। শহর পড়ে থাক পিছনে—

ইয়ার্ডের প্রান্ত ছুঁয়ে ধীরে ধীরে আপ লাইন ধরে এগোতে লাগল প্ল্যানেট। গ্রহ। টু-টু-জিরো টাইপ। সামনের দুপাশে দুখানা ছোট, তারপর দুপাশে দুখানা বড়। এ দুখানাই চালায়। এ দুখানার সঙ্গেই পিস্টন ক্র্যাংক লীভার ইত্যাদির যোগ। উনিশ শতকের গোড়ায় জন্ম। এখন বাতিল। প্ল্যানেট।

আঃ কি আরাম লাগছে নিখিলেশের। মুক্তির আরাম। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে, ভিতরের ইঞ্জিনের গরম। অদ্ভুত এক আরাম—জীবন মৃত্যুর বিপরীত প্রবাহ। অদ্ভুত এক অনুভূতি উদ্দেশ্যহীন ঠিকানা-হীন এই যাত্রায়।

কোথায় চলেছে সে? কোথায় গিয়ে যাত্রা শেষ করবে তার? বাতিল বলে বাদ দেবার চেষ্টা করলেই বাদ দেওয়া যায় না। জাগতিক মানদণ্ডে বাতিল হলেও আরো একটা বৃহত্তর মহত্তর পথ-চলার আইন আছে! যে অদেখা নিয়মে বাঁধা পড়ে না-জানা কানুন আপনিই মেনে চলেছে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সবাই। কারো পথে বাধা হয় না কেউ। নিজের নিজের কক্ষপথে চলেছে নিজের নিজের কাজ করে। সেই মহাজাগতিক আইনে কারো অধীন কেউ নয়, কারো অন্ন কেড়ে খায় না কেউ। কেউ কারোকে কর্মক্ষমতা থাকতে বাতিল করে দেয় না। মুখের গ্রাস বন্ধ করে অন্নজল বন্ধ করে দেয় না। গলা টিপে মেরে ফেলে না।

ক্ষুধা পিপাসা বোধ নেই আর তার।

বোতলের মদ বোধ হয় ঘাটতি পড়া জীবনের মদের পরিপূরক। যারা খায় জীবনের মদ ফুরিয়ে গেছে বলেই খায়। তারও জীবনের মদ ফুরিয়ে গেছে। অনেকদিনই—

অনেকটা খাবে এই আশায় বারে বারেই মুখে তুলেছে বোতল। কোন বারই অধঃকরণ হয় না বেশী। গলার ভেতরটা জ্বলতে জ্বলতে নেমে পাকস্থলীতে আগুন পেঁ ৗছে দেয়। পেটের ক্ষুধার আগুন তেষ্টার আগুন বেড়ে যায় মাত্র।

সামনে আবার রক্তচক্ষু। সামাজিক বাধা—এটা কোরো না, ওটা কোরো না-র নিষেধ। কেন এই নিষেধ?

কেন এই রেড সিগনাল? সামনে পথ তো অবাধ! কোনো বাধা কোনো বন্ধ নেই কোথাও। রাত সাড়ে চারটে পর্যন্ত ট্রাফিকও নেই আপ লাইনে। তবে কেন রেড সিগনাল? মানুষের স্বভাবই অন্যের ওপর সরফরাজি করা মোড়লি করা। অহেতুক হাম বড়া কর্তৃত্ব প্রদর্শন। কেন এখন রেড সিগনাল? স্রেফ এই মোড়লির চিহ্ন!

সমস্ত বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে এগিয়ে চলল প্ল্যানেট ইঞ্জিন। এককালে প্ল্যানেট, গ্রহ। এখন উল্কা। আকাশের কক্ষপথ থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া, আকাশের সমাজচ্যুত গ্রহ। সমাজচ্যুত বলেই গ্রহ জ্বলছে।

গ্রহ যখন জ্বলে তখন সে উল্কা, নিঃশব্দ নিবে যাওয়া উল্কা। এই গ্রহ এগোচ্ছে উল্কাবেগে নয়—ধীরে। ধীরে। অতি ধীরে।

সারারাত চলবার রসদ আছে কি? আস্তে আস্তে চললে হয়তো আছে। অত্যন্ত আস্তে চলা দুই কারণে দরকার। লোক জানাজানি না হয়। আর যাতে সারারাত চলা যায়। জীবনটা হ্রস্ব হয়, কেই বা চায়!

ভিতরে কন্ট্রোল প্যানেলে বাতি জ্বলছে। বাইরের হেডলাইট নেই বাল্‌ব নেই হয়তো। অন্ধ! চোখের বাতিদানে মোম ফুরিয়েছে। যেমন ফুরোয়, মৃত্যুর আগে সব কিছু যেমন অন্ধকার হয়ে আসে—

অন্ধকারে ভূতের মতো এগিয়ে চলেছে প্ল্যানেট। গ্রহের নিরুদ্দেশ যাত্রার সওয়ারী নিখিলেশ দাস। জন্মান্তর হয়ে ডস নিকোলাস।

পার হলো মধ্যডাঙা স্টেশন। আলো ঝলমল। আলোর দরকার নেই তার— তবু কতো আলো। দরকার নেই বলেই আলো আজ এতো। দুপাশে প্লাটফরমে ইটের গাঁথনিতে চাকার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো। কিন্তু আস্তে—। যেন বলছে—ফিরে আয়, ফিরে আয়—

আর একবার আধলা সাইজের কয়লা মারল বয়লাবে। পাঁচ ছয় আধ বেলচা। জলের লেভেল ঠিক আছে গেজ গ্লাসে। প্রেশার একশো পাউণ্ড। বাঁশার দড়িতে হাত দিল। বাজল না। গলায় ছোরা মারলে যেমন ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরোয় তেমনি শব্দ হল। কিসে হাত দিল সে—বাঁশীর দড়ি না ফাঁসীর! হাসল নিখিলেশ।

রেগুলেটার হ্যাণ্ডলে কতো আলতো ছোঁয়ায় এতো বড়ো বিরাট দৈত্যটা চলে—জন সাধারণ জানে না। ভাবল নিখিলেশ। মেন ভাল্‌ভের সঙ্গে হ্যাণ্ডলের সরাসরি যোগ নেই যে। পাইলট ভালভের সঙ্গে মেন ভালভেরও নয়। স্টিম প্রেশার যদি হয় দেড়শো—এই দেড়শো পাউণ্ড চাপের সঙ্গে হাতের সম্পর্ক তো পাইলট ভালভে। তার আয়তন তো এক ইঞ্চি ব্যাসের বেশী নয়।

আর একবার বোতলে মুখ দিল নিখিলেশ।

মাথা ঝিমঝিম করছে।

বৃষ্টি ধরে গেছে অনেকক্ষণ। জমাট বাঁধা ঠাণ্ডা, কালো বরফের দেয়াল বাইরে ঝুলছে। আকাশে নক্ষত্র নেই।

স্পীড কতো মাইল হবে? চলতি টেলিগ্রাফ পোস্ট হিসেব করে দেখল নিখিলেশ, আট থেকে দশ।

মনোরম স্টেশনের আগে পরে কতো লাল সিগনাল! কতো নিষেধ! স্টেশনে কতো আলো। জীবনে কতো অকারণ ঝলমলানি। কারো কারো জীবনে। সবার জীবনে নয়। তার নয়। কতো মানা। তাই তো! প্লাটফর্মের ইটের গাঁথনি পার হবার সময় মানার না- না পরিষ্কার শুনতে পেলো নিখিলেশ। সবাই যেন দুহাত তুলে না না বলছে। না না যেও না।

মাথাটা ঘুরে উঠল যেন। না, মনের ভুল বোধ হয়—

এগিয়ে চলল প্ল্যানেট।

তালপুরিয়া স্টেশনে উভয় প্লাটফরমে লাল আলো দেখাচ্ছে তাকে। ডিসটাণ্ট সিগনালেব আগেই দেখতে পেল নিখিলেশ। এই সেরেছে। টের পেয়ে গেছে সবাই। জানাজানি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। উপায়—?

না, মাথাটা ঘুরছে সন্দেহ নেই। বেজায় ঘুরছে। শেলফ থেকে বোতলটা পেড়ে নিয়ে অনেকটা টেনে নিল নিখিলেশ। বিষে বিষক্ষয় হোক। মাথা ঘোরার ওষুধ—

স্পীড বাড়িয়ে দিল। আন্দাজ পনেরো।

সব সিগনাল লাল। সর্বত্র নিষেধ সর্বত্র মানা।

পরের স্টেশনের আগেই কেবিন থেকে, আর সিগনাল ম্যান, লাল আলো দোলাচ্ছে। প্লাটফরমেও তাই। দুদিক থেকেই লাল আলোর ছড়াছড়ি। বাধা বাধা আর বাধা—

সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরগাছি ঈয়ার্ড, বৃষ্টি, শীত, বাতিল, নো-মীল, প্ল্যানেট, ছুটি, কোলিং প্ল্যাণ্টের ছোকরার অভিনয়—তাল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথায়। সেই গ্যাঙোর-গ্যাঙ ব্যাঙটা কি এখনও ডেকে চলেছে?

সবাই লাল আলো নাড়ছে কেন ? মানা করছে কেন? সে কি অন্যায় করেছে কিছু ? সে কি বিদ্রোহী ? না তো ! বাতিল বলে ফেলে দেয়া জিনিসকে কাজে লাগাচ্ছে। তন্ত্র সাধনা শব সাধনা করছে—ভাওয়াল সন্ন্যাসীকে বাঁচিয়ে তুলছে। এ কি পাপ ? একি খারাপ কাজ ? সেও বাতিল। বাতিলকে সাহায্য করবে না ? ভিখিরীকে ভিক্ষে দেয় ভিখিরীরা—বাবুরা নয়।

তার পরের স্টেশনে প্লাটফরমে সবাই না না বলল। ফিরে আয় ফিরে আয় বলল। ঠিক শুনেছে নিখিলেশ। প্লাটফরমের গাঁথনির প্রতিটি ইঁট চাকার প্রতিধ্বনি করে বলেছে—ফিবে আয় ফিরে আয়।

আচ্ছা ফিবে যেতে যে বলছ, ফিরব কেন ? ফিরব কোথায় ? কার জন্য ফিরব ? সব দরজা তো বন্ধ। জেলের দরজাটা অনেক বড়ো—ঐটে খোলা আছে মনে হয়। আর—আর তো কোন দরজা খোলা নেই।

না। আছে তো। কে যেন বলেছিল দরজা খোলা রইল। যখন ইচ্ছে এসো যবে ইচ্ছে। কে যেন ? ও'ব্রায়েন ? না, মজিদ। না, ধানক্ষেতেব সেই জমাট বাঁধা অন্ধকার ! আচ্ছা, একটা দরজার কাছে কে যে কোথায় নেমে গেল ! হারিয়ে গেল। হারিয়ে যাবাব আগে, অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার আগে ভদ্রতা করে গেল। আসবেন আবার বললে ভদ্রলোক। বলেই কিন্তু, আশ্চর্য, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। ভদ্রলোক নয়—মেয়েছেলে। আরও আশ্চর্য ! কাঠের কপাট স্বচ্ছ হয়ে গেল কেমন কবে। এপাশ থেকে নিখিলেশ দেখলে, স্পষ্ট দেখলে, মেয়েছেলেটা তাকে ডেকে দরজা বন্ধ করার সঙ্গেই নিজেই ঝাঁপ খেয়ে একটা লোকের বুকে গিয়ে পড়ল।

না। কুন্তলা তাকে ডেকেছিল। আজও ডাকছে। ডাকছে না ? গ্যাঙোর গ্যাঙ ব্যাঙ ডাকতে পারে আর ব্যাঙের মতো দেখতে কুন্তলা ডাকতে পারে না তাকে ? আচ্ছা কুন্তলার এক চোখ কানা হয়ে গেল কবে ? ও, হয়েছে ! পান্তুয়া চপ, আর উকুন তোলা কাটলেট ভাজতে গিয়ে তেল ছিটে গিয়েছিল। বাঁ চোখটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাঁ

চোখটা ? না, মোটরগাড়ার বাঁ হেডলাইটটা। আচ্ছা, কে যেন বলেছিল প্রেম কানা—একচোখো—

একটা স্টেশন দূর আছে এখনও। এইখানে গাড়ী থামিয়ে নেমে চম্পট দিতে হবে। নইলে ধরা পড়লে পুলিশ এমন ধোলাই দেবে! ঐ তো ধানক্ষেত বাঁ পাশে। ঐখানে মোটরগাড়ী আছে। আলো নিভিয়ে বসে আছে। আর উর্বশী বসে আছে তার মধ্যে।

ভ্যাকুঅম কতো ? এ কি গেজই তো নেই! গেজ না থাক, ইজেকটার স্টীম ভালভ কই, এয়ার ভালভ কই ? এই তো! ব্রেক কষে ইনজিন থামিয়ে নেমে পালাই। ধানক্ষেত ভেঙে। শালারা বড্ডো পিছু লেগেছে।

ইজেকটার ভুল করে রেগুলেটার হ্যাণ্ডলে চাপ দিল নিখিলেশ।

একটা দমকা মেরে স্পীড নিল ইনজিন।

আর এই হেঁচকা টানে জীবনসঙ্গিনী টেণ্ডারের স্ক্রু আলগা হয়ে কি করে ছিঁড়ে ছেড়ে গেল। ফুটপ্লেটের ওপর হ্যাণ্ডল ধরে বিপজ্জনক ভাবে ঝুলতে লাগল নিখিলেশ। পড়তে পড়তে রয়ে গেল।

জ্ঞান যতোই লোপ পাক, বিপদের আগমনটা লুপ্তজ্ঞান মস্তিষ্কও কি করে আগে থেকে টের পায় যেন!

নিখিলেশও বুঝল।

ইজেকটার খুঁজল। তার কণ্ট্রোলগুলো নেই। ব্রেকের ব্যবস্থা নেই। ব্রেক কষা চলবে না। তবে ? স্টীম বন্ধ করে দাঁড় করাবে গাড়ী ? তারপর ? নেমে যাবে ? পালিয়ে যাবে ?

পালিয়ে যাবে! কেন ? কার কাছ থেকে পালাবে ? মৃত্যুর হাত থেকে লোকে পালায়, অপমান অপযশের হাত থেকে পালায়। সে পালাবে কোন্ মৃত্যুকে এড়িয়ে ? কোন্ অনাহারকে ফাঁকি দিয়ে ?

না, সে পালাবে না। যা হবার হোক। যা হবে তা তো সে বুঝতেই পারছে। ব্রেকহীন ইঞ্জিন। সমস্ত বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে পলাতক ইঞ্জিন। চালাচ্ছে নিখিলেশ। কাল যার ফাঁসীর হুকুম বেরুবে। সেও পলাতক।

তার সংলগ্ন অসংলগ্ন চিন্তার দুই চাকায় ভর করে স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে চলল বাতিল প্ল্যানেট। স্টেশনের আগে পরে, প্রত্যেক সিগনালে কেবিনে, লাইনের দুধারে লাল সিগনালের নিষেধের মিছিল। এখন এমন ঘন ঘন পয়েন্টসম্যান লাইনম্যান সিগনালার, নিখিলেশের মনে হতে লাগল কম্পানীর নিজস্ব লোকজনে কুলোয় নি। ধার করে ভাড়া করে এনেছে ফালতু লোক। তাদের হাতে লালবাতি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে লাইনের দুধারে।

ইঞ্জিন দাঁড় করিয়ে পালানোও অসম্ভব। এতো ঘন ঘন শত্রু সন্নিবেশ। লোকজন দাঁড়িয়ে। ভাগ্যের পথে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল ইঞ্জিন।

পাশে পাশে আলো ছায়ার আড়ালে ইটের বাড়ী ধানক্ষেত। খেলার মাঠের ওধারে চলেছে রাজপথ। মাঝে মাঝেই দেখা যায়। আবার আড়াল পড়ে যায় কিছুর—দেখা যায় না। পিচের রাস্তা—রেললাইনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সমান্তরাল। মাঝে মাঝে গাড়ী চলে যাচ্ছে এক একখানা। ক্বচিৎ। শীতের রাত। তার ওপর বৃষ্টি হয়েছে। যারা এখন পথে, নেহাৎ তাদের প্রাণের দায়ে। লরী আর ট্রাকই যাচ্ছে। মাল বয়ে নিয়ে কলকাতায় যাবার বা কলকাতার দিক থেকে ফেরত যাবার সময় রাত্রি। দিনে নয়। ট্রাফিক থাকে না রাত্রে।

আর একটা স্টেশন খোদপুর পার হবার সময় এক কাণ্ড হ'ল। আপ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কে যেন গুলী ছুঁড়ল। তার গায়ে লাগল না বটে। কণ্ট্রোল প্যানেলের বাতি জলের গেজ গ্লাস আরো সব—ঈশ্বর জানেন কি কি—ভেঙে ঝনঝন করে ফুটপ্লেটে পড়ল। তার আত্মরক্ষার সহজ বৃত্তি ফায়ার ডোর বন্ধ করে তাকে এই কোণ চেপে বসিয়ে দিল। আরো দুটো গুলীর আওয়াজ হোলো।

টেণ্ডার ছিঁড়ে গেছে, জলের সাপ্লাই বন্ধ। কয়লা নেই। ব্রেকও নেই। কি সব ভেঙে চুরে গেল। স্টেশনে এলেই গুলী ছুঁড়ছে। ক'গজ অন্তর লোক দাঁড় করানো। উপায়?

পরের স্টেশনের আগে এ কোণ চেপে রইল নিখিলেশ। তাকে দেখতে না পাওয়া যায়। পেলও না কেউ। কতোগুলো টর্চের য়্যালসেশিয়ান আর হাউণ্ড তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল ড্রাইভার আছে কি না। এবং নেই দেখে নিশ্চয় আশ্বস্ত হল। ভাবল খোদপুরের তিনটে গুলীর একটায় বাছাধন ঘায়েল হয়ে পড়ে গেছে লাইনে।

এই সুযোগ। বা এই দুর্যোগ। পালাতে হবে এইবার।

বছরের পর বছর রোগে ভুগে বা অনাহারে থেকে দিনরাত যে মৃত্যুকামনা করছে, তার চাক্ষুষ এসে যম যখন দাঁড়ায়, সে বলে আমি যাবো না। আমায় নিয়ে যেও না, ছেড়ে দাও। মানুষেব জিজীবিষা এমনই। নিখিলেশেরও বাঁচবার ইচ্ছা প্রবল হতে লাগল।

বাঁ পাশে মাঠ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মোটরের রাস্তা।

হঠাৎ দেখতে পেল নিখিলেশ—এক চক্ষু মোটব। পাশে পাশে চলেছে। একই দিকে। খোলা আকাশে আলোর আভা যেটুকু থাকে তাতে পরিষ্কার দেখা যায় লরী নয়, ট্রাক নয়, প্রাইভেট।

চমকে গেল নিখিলেশ। হুডওয়ালা গাড়ী, গাড়ীর ঢপ ও সে-ই তার ওপর একচক্ষু—এ গাড়ী কুন্তলার না হয়েই যায় না। হুড ফেলা। হুড মানে তো ঘোমটা! ঘোমটা নেই মাথায়! কার ? গাড়ীর, না কুন্তলার ?

চোখের ভুল হতেই পারে না। বিপদের পর বিপদের ঘা খেয়ে খেয়ে মদের নেশা ঘুচে গেছে অনেকক্ষণ। ক্ষুধা বোধ নেই, তৃষ্ণা বোধও গেছে। ঝড়ের মুখে নিবু নিবু প্রদীপ হাত আবডাল করে নিবতে না দেওয়া। পাঁজরার পিঞ্জরে প্রাণ পাখীকে বাঁচিয়ে রাখা—

রেলের লাইন, মোটরের রাস্তার সমান দূর। কুন্তলা আর নিখিলেশ যেমন সমান দূর। আজ এই মুহূর্তে কুন্তলার গাড়ী আর নিখিলেশের কুগ্রহও তাই। ঠিক তাই।

নিখিলেশ ভুলে গেল লেভেল ক্রসিং বলে একটা জায়গা আছে। পায়ে চলা পথ বা মোটরের রাস্তা যেখানে রেলপথকে কেটে পার হয়ে যায়।

রেলের লোকেরা সমস্ত লেভেল ক্রসিং বন্ধ করে দিয়েছে। দুর্ঘটনা বাঁচাবার জন্য।

এক চক্ষু গাড়াটা প্রায় সমকোণে এসে বন্ধ লেভেল ক্রশিং-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গেল। এক চক্ষুর আলোটা ইঞ্জিনের ভিতর এসে পড়ল, ক্রসিং পার হবার সময়।

কুন্তলা তাকে ডাকছে। কোন ভুল নেই। প্লাটফরম পার হবার সময় ঐ যে ফিবে আয় ফিরে আয়, কুন্তলাই বলছে।

নিখিলেশ ফুটপ্লেট থেকে নিচে লাফ মারল।

রেগুলেটার হ্যাণ্ডল টানা রইল।

ইঞ্জিনের স্পীড তখন পাঁচ সাত মাইলের বেশী নয়।

দুর্গতির পথে চলতে লাগল ইঞ্জিন। কাণ্ডারীহীন নৌকোর মতো—

তাব্র ওষুধ আর বীজাণুনাশক আরকের গন্ধের মধ্যে আস্তে আস্তে চেতনা ফিবে আসতে লাগল নিখিলেশের।

এ কোথায় সে, কি করে এলো? কে আনলে তাকে?

অতি ধীরে—অর্ধচেতনা, চেতনাহীনতার মধ্যে দিয়ে বার কয়েক করে ডুব সাঁতার কেটে, হাবুডুবু খেয়ে আস্তে আস্তে চেতনার কুল যেন দেখতে পেতে লাগল নিখিলেশ। ঐ যে দূরে—ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ওপারে—একটু একটু দেখা যাচ্ছে মাথা উঁচু স্থির অচঞ্চল একটা কিছু—মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে মাঝে মাঝে ঢেউয়ের আড়ালে পড়ে যাচ্ছে—ঐটে বোধ হয় ডাঙা। দিগন্ত আর সমুদ্রের মাঝখানে চিঁড়ে চেপ্টা চুল-সরু আশ্বাস।

যন্ত্রণা বেদনার ঢেউয়ে আছাড় খেতে খেতে মুহুর্মুহু মৃত্যুর সাগরে ডুবে যাচ্ছিল সে। চারদিকে থৈ থৈ জল—কালো, অন্ধ করা অন্ধকার। নিশ্চিন্ত মৃত্যু।

বাহাত্তর ঘণ্টারও বেশী একটানা অজ্ঞান থাকবার পর আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরতে লাগল নিখিলেশের।

তীব্র ওষুধের গন্ধ,—অথচ হাঁসপাতাল তো নয়! অচেনা একটা ঘর—সে শুয়ে আছে!

বুক থেকে পা পার-হওয়া সাদা চাদর। মরে গেলে যেমন ঢেকে দেয়। কিন্তু অতোটা ঢেকে দিয়েছে কেন? কোমরের তলা থেকে তো তার কিছু নেই। আর, এই চাদরটা তো সাদা। সে তো ডুবে যাচ্ছিল, ঢেকে যাচ্ছিল মাথা জাগাচ্ছিল আর একটা চাদরের তলা থেকে—সেটা তো কালো।

নিচের অঙ্গটা তার নেই। অর্ধমানব। আধখানা মানুষ। চিরকালই আধখানা মানুষ সে, কবেই বা পুরো মানুষ, গোটা মানুষ হল! মাথা-মগজের অংশটা আছে, যে অংশটা ভাবে ভাবায়, বুদ্ধির দেওয়া-নেওয়া করে। ওটা তার বরাবরই আছে। পেটটা আছে, যার ক্ষিদে পায়। হাত দুটো আছে বলেই মনে হচ্ছে। বড্ড রোগা। সরু কাটি কাটি কি যেন পড়ে আছে দু'খানা, চাদরের তলায়। কিন্তু আছে। আর যে কিছু নেই-ই। সব চেয়ে বড়ো জিনিস যা তার নেই, সেটা তার চলার ক্ষমতা। পা দুটোই নেই তার—

মাথাটা না নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের আশপাশ চেয়ে চেয়ে দেখছিল নিখিলেশ। এটা সে কোথায় আছে? ঘরখানা পাকা কোঠাবাড়ির। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওটা কি, জানালা চেপে রয়েছে একেবারে! নারকোল গাছের পাতা নয়। ডানা, সবুজ ডানা। নিখিলেশকে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কোথায় নিয়ে যাবে? কোথায় যেন নিয়ে যায়, সেই যে ওপর দিকে—সেই যে আকাশে কোথাও কোন জায়গা টায়গা আছে। কিন্তু ওটা তো স্বর্গ। সেখানে তার ঠাঁই নেই তো। তার ঠাঁই—কিন্তু কেনই বা স্বর্গে যাবে না সে? তার মাথায় পাগড়ি বাঁধা—রাজমুকুট—

ঘর, পরিবেশ, আবহাওয়া—সব কিছুর অস্পষ্ট একটা ছাপ, ছোট ছেলের তোলা জলছবির ছাপের মতো ঝাপসা আবছা হয়ে ব্রেণে ধরা পড়ছিল। যে জলছবির ছাপে মানুষের প্রতিকৃতিকে মনে হয় প্রকৃতির

দৃশ্য, ধেবড়ে গিয়ে দৃশ্য যে-ছাপে অদৃশ্য হয়ে যায়। তেমনি।

সময়টা বোধ হয় সকাল।

মুখের মধ্যে কেমন বিশ্রী স্বাদ। বাসি মুখের গন্ধ তো আছেই তারও ওপর কেমন ওষুধ ওষুধ মিষ্টি মিষ্টি। একটা হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতির মতো একটু একটু মনে পড়ছে তার। একটা চেপ্টা বোতল থেকে তৃষ্ণার জল খাবার চেষ্টা করেছিল সে। তৃষ্ণা মেটেনি বিতৃষ্ণা বেড়েছিল মাত্র।··· মুখের মধ্যে সেই স্বাদ সেই গন্ধ এখনো লেগে।···মৃত্যুর পরও গন্ধবোধ থাকে না কি, নবজন্মের পর—?

ওটা কে আসছে? মেয়েমূর্তি। স্নান করে চুল এলিয়ে দিয়েছে। মুখখানা থমথমে, ভাবী ভাবী—না ঘুমুলে যেমন হয়, কাঁদলে যেমন হয়। অবসাদে বিষণ্ণ দীর্ঘস্থায়ী বিষাদে অবসন্ন। জল ঝরা আকাশের কান্না ভেজা চোখের পাতার মতো—

কিন্তু ও কে? যে মেয়েটা তাকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, ধাক্কা মেরে শূন্যে ঠেলে দিয়েছিল, তার মতন মুখের আদলটা নয় অনেকটা! তারি কেউ হবে, বোন-টোন নয়তো। সে রাক্ষুসী নিজেই নয় তো! ওরে বাপস—! আবার কি মতলবে এসেছে?

ভয়ে চোখই বন্ধ হ'ল না শুধু নিখিলেশের, চৈতন্য হারাল নতুন করে—

কুন্তলা বলে যাচ্ছিল—

—ভাড়া করা রেলের লোকেরা সবাই চিনত না তোমায়! চিনলে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারতুম না নিশ্চয়। তারা যতো বলে—এই লোকটাই লাফ মেরেছে ইঞ্জিন থেকে—পাকড়াও ওকে। আমি ততো বলি, মোটেই নয়। পষ্ট দেখেছি লাইন পার হচ্ছিল—ধাক্কা লেগেছে ইঞ্জিনটার। তারা জেরা করে—এতো রাত্রে লাইনের ওপর কি করছিল? আমি বলি—কি জানি, তোমাদের তামাশা দেখছিল হয়তো। যাই হোক, জানটা বাঁচাও তো আগে। গাড়ী আছে আমার।

তুলে দাও। হাসপাতালে নিয়ে যাই।...সন্দেহ যায় না তাদের। বলে—পাগলা নিকলস সাহেব পাগলা ইঞ্জিন নিয়ে বেরিয়েছে। ধরতে হবে তাকে। আমি বলি—আর যাই হোক, এ লোকটা তো সাহেব নয়।

কুন্তলার মুখের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকছিল নিখিলেশের চোখ। বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায়। ভয়ে আনন্দে। গভীর কিছু চিন্তা করবার মতো মাথার অবস্থা ছিল না তার। সব ভাসা ভাসা, লঘু-পাখনা জল-হারানো অন্তঃসারশূন্য মেঘের মতো! মাথায় যদিও এখন আর রাজমুকুটের ঢঙে ব্যাণ্ডেজের পাগড়িটা বাঁধা নেই।

কুন্তলা বলে যায়—একটা লোককে আলাদা ডেকে বললুম—গাড়ীতে ওঠো। টাকা গুঁজে দিলুম হাতে।...ধরে বসল তোমাকে। তুমি তো পিছনের সিটে শুয়ে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ! মাথা, পা, হাঁটু, পাঁজরা।.. রাত কাটতে চলল, দুর্যোগ কমে এসেছে। আকাশের দুর্যোগ কমে কমে আসছে মনের দুর্যোগ দুর্ভাবনা তেমনি বাড়ছে। আস্তে আস্তে গাড়ী চালাচ্ছি। ডাক্তারখানা ডাক্তারের সাইনবোর্ড দেখলে দাঁড়াচ্ছি। কোথায়? যেখানেই যাই পালাতে হবে। লোকালয় না হলেই ভালো হত, কিন্তু ডাক্তারও তো চাই।...জানো তো, লোক থেকে লোকালয় থেকে আমি সেদিন পালাবো বলেই বেরিয়েছিলাম।...দ্যাখো, খুঁজে খুঁজে নতুন জায়গা বের করেছি কেমন!

জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল নিখিলেশের চোখে। মুখে সে আজকাল বিশেষ কিছু বলে না, বোবাই হয়ে গেছে একরকম। এ বোবামি দুর্বলতার না অনিচ্ছার বোঝে না কুন্তলা। তার মনে হয় দুটোরই।

কুন্তলা বলছিল—ভারী বিরক্ত শুরু করেছিল সতীনাথ। টাকা তো যাচ্ছিলই, আবার আর এক রকমের দিক করছিল। সে তুমি বুঝবে না, সে রকমের পুরুষ তুমি নও। সে বিরক্তি অসহ্য। সেই রাত্রে স্থির করেই রেখেছিলাম বেরিয়ে পড়ব গাড়ী নিয়ে। দুর্যোগ হওয়ায় সুযোগ হ'ল আমারই। টাকা যা কিছু ছিল নিয়ে, গ্যারাজ থেকে গাড়ী বের করে—ব্যস, হাওয়া।...সতীনাথ উত্তর পাড়ায় পড়ে। ঝড়ে জলে কিছুই

টের পেলে না।···সটান গেলাম ঠাকুরগাছি ঈয়ার্ডে। না, পাগলাকে দেখে নি কেউ। ও ব্রায়েনের ওখানে তারপর। খানসামা বললে—সাহেব তো থাকে না আজকাল। ঈয়ার্ডের ইহাঁ-উহাঁ দেখা যায় তাকে। আবার ঈয়ার্ড। গাড়ী তো থাকলো রাস্তায়। কী বিষ্টি! কী বিষ্টি! সেই বিষ্টির মধ্যে ঈয়ার্ডে খোঁজা-খুঁজি। ছাতায় কি মানায়?···ঈয়ার্ডে গিয়ে তো আসল ঘটনা শুনলাম। ···সব ভিজেছিল, মাথা কাপড় গা হাত পা। চোখ ভিজেছিল না।···ঈয়ার্ডের ঘটনা শুনে চোখেও বিষ্টি নামল এবার।···এর পরের ঘটনা তুমি জানো।····রেলের রাস্তা মোটরের রাস্তা প্যারালাল। প্যারালাল লাইন নাকি 'মিট' করে না?

কুন্তলার মুখে নিবন্ত হাসি।

নিখিলেশও হাসল, রোগ পাণ্ডুর হাসি। ম্লান, অল্প, প্রাগপ্রত্যূষের চাঁদের। যে হাসি, সকলেই জানে, এখুনি নিবে যাবে!

নিখিলেশ বলল—মিট করবে, মেশে তো—! ইনফিনিটিতে।

কুন্তলা বললে—ইনফিনিটিটা কোথায় লেশ? এ জন্মে, এ পৃথিবীতে, না—অন্য কোনখানে? মিট করার আরো জায়গা আছে এ জন্মে-ই। লেভেল ক্রসিং—

নিখিলেশ বলে—সেটা মিট নয়, কাটাকাটির জায়গা। দুই লড়িয়ের হাতের তলোয়ারের মতো। বিশেষ একটি বিন্দুতে এসে ঠোকর লাগা এক অনুপল সময়ের জন্য।

কুন্তলাব গলার স্বরে যেন চ্যালেঞ্জ, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে' ভাব। বলে—ও, তাই নাকি?

নিখিলেশ শুধোয়—তা তো হোলো। ইঞ্জিনটার কি হোলো, বললে না তো!

কুন্তলা বলে—চলতে—চলতে—চলতে—চলতে থেমে যাওয়াই যদি মৃত্যু হয়, মারা গেছে তা হলে তোমার প্ল্যানেট। আরে বাপু, সমাজ যাকে ফেলে দিয়েছে আবর্জনায়, সে বর্জনীয় বলেই তো? তুমি জোর করে চালু করবার চেষ্টা করলে কি হবে। জানো, কোথায় গিয়ে মৃত্যু ঘটেছে তার?

পোনাহাট সাইডিংয়ে। বাফারে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেছে। তার জোর ছিলও না। আধমরা নয়, মরাই সে তখন। বডিটাও খানিক বেঁকে তুবড়ে গেছে। খানিকটা স্টীম—সাদা সাদা রংয়ের, খানিকটা নীল রংয়ের ধোঁয়া, আকাশে উড়ে উড়ে গেছে—পঞ্চভূতে মিশে গেছে। আর কোন উপায় না পেয়ে রেলের লোকেরা সাইডিংয়ে দিয়েছিল তাকে।

আনমনা হয়ে পড়ল নিখিলেশ! আর এক বাতিল মারা গেছে তা হ'লে। নিখিলেশকেও যেতে হবে। ঐ পথেই যেতে হবে নিখিলেশকেও। ম্যাঞ্চেস্টারের প্যাট্রিক্রফটে জন্ম, ন্যাস্মিথ উইলসনের কম্পানীর ঔরসে। জন্ম সন আঠারো শো পঁয়তাল্লিশ। মারা গেল সত্তর বছর বয়সে! একশো পাউণ্ডের বয়লার—সেফটি দেড়শোতে। মারা গেল। যাক, সবাই যাবে। —সেও বাঁচবে না।···দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল নিখিলেশের।

নিখিলেশ বলে—আমার ডান পা-টা! ডাক্তাররা কি বলেছেন? ফিরে পাবো তো?

কুন্তলা হাসে—তোমার তো ধারণা ছিল নিচের অঙ্গ গোটাটাই নেই তোমার। পা-ও নেই—

পায়ের চিন্তায় আনমনা হয়ে পড়েছিল নিখিলেশ। কবে প্লাস্টার খুলবে? খুলে কি দেখা যাবে?··সমাজ যাকে বর্জন করে আবর্জনা বলেই করে। ঘরে তোলা যায় না তাকে আর।···তার শেষ নিঃশ্বাস পঞ্চভূতে মিশে যায়, নীল রং সাদা রংয়ের নিঃশ্বাস।

আনমনা কানে ভুল শুনল নিখিলেশ। শুনল 'পাওনি'! বলল—না, তা তো পেলাম না। তাই তো যেতে চাই। আমায় বাঁধবার বাঁধনও নেই লোকও নেই। রাস্তার স্পীড দেখেছি, ট্রেনের স্পীড দেখেছি, জলের স্পীডটা দেখতে হবে। খিদিরপুরে যাবো আমি জাহাজের কাজ নিয়ে। কিন্তু আমার পা! পা ভালো না হলে—

কুন্তলা বলল—বাঁধন আছে কি নেই, বদ্ধ জীব কি টের পায়? সব বাঁধন কি চোখে দেখা যায়? পা ভালো হবে না নেকলেস, পা ভালো

হতে দেব না আমি যদি আবার যাবার চেষ্টা করো। আমি সব পারি, পেরে এসেছি সারাজীবন।

ডাক্তারকে বলে অ্যাম্পুটেট করাতেও পারবো।

উদভ্রান্তের মতো নিখিলেশ বলল—পা না পেলে, খাবো কি করে? খাবো কি?

কুন্তলা বলল—আমি যা খাবো, তাই—